

আহমদীয়া ইতিহাসের স্মরণীয় দিন



আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

আহমদীয়া ইতিহাসের স্মরণীয় দিন

আহমদীয়া ইতিহাসের
স্মরণীয় দিন



আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

প্রকাশনায়
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

আহমদীয়া ইতিহাসের স্মরণীয় দিন

গ্রন্থস্বত্ব	ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্স লি., ইউ. কে.
প্রকাশনায়	আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১
সার্বিক তত্ত্বাবধানে	ইশায়াত বিভাগ, বাংলাদেশ
প্রকাশকাল	১ম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০২৩
সংখ্যা	২০০০ কপি
প্রচ্ছদ	মুহাম্মাদ আরিফ মুধা
মুদ্রণে	বাড-উ-লিভস্ বাংলাদেশ পাবলিকেশন্স লি. ভবন, ৮৯-৮৯/১ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

Memorable Days in Ahmadiyya History

আহমদীয়া ইতিহাসের
স্মরণীয় দিন

Presented by

Isha'at Department, Bangladesh

1st Published in Bangladesh in February 2023

Published by

Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211

© Islam International Publications Ltd., UK

ISBN 978-984-991-118-0

মুখবন্ধ

নবীদের স্বপক্ষে ঐশী নিদর্শন প্রকাশ করা আল্লাহ তা'লার চিরাচরিত বিধান। আর আল্লাহ তা'লা সেই নিদর্শন প্রকাশের দিনগুলিকে স্মরণ করার নির্দেশ দিয়ে পবিত্র কুরআনে বলেন,

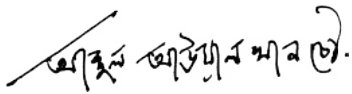
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝

অর্থাৎ, আর নিশ্চয় আমরা মূসাকেও নিদর্শনাবলীসহ (এ আদেশ দিয়ে) পাঠিয়েছিলাম, ‘তুমি তোমার জাতিকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে আন। আর আল্লাহর দিনগুলো এদের স্মরণ করাও।’ নিশ্চয় এতে একান্ত ধৈর্যশীল, পরম কৃতজ্ঞ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রয়েছে। (সূরা ইবরাহীম: ৬)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ইতিহাসেও এমন তিনটি ঐশী নিদর্শন প্রকাশের দিন রয়েছে। এগুলো কারো জন্মদিন কিংবা মৃত্যুদিন নয়। কেবল আল্লাহ তা'লার মহিমাকীর্তনের উদ্দেশ্যেই এগুলো পালন করা হয়। যথা- ১) ২৩ মার্চ: মসীহ মাওউদ দিবস ২) ২০ ফেব্রুয়ারি: মুসলেহ মাওউদ দিবস এবং ৩) ২৭ মে: খিলাফত দিবস। প্রথমত, মার্চ মাস, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে যেমন একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে, তেমনি আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের ইতিহাসে এ মাস এক অবিস্মরণীয় অবস্থান রাখে। ১৮৮৯ সনের মার্চ মাসের ২৩ তারিখে ঐশী-প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ‘বাবে লুদ’ তথা লুধিয়ানা শহরে উম্মতে মুহাম্মদীয়ায় আবির্ভূত মসীহ মাওউদ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর হাতে ৪০ জন বয়আত গ্রহণ করেন। এই ৪০ জনকে নিয়েই শুরু হয়েছিল আহমদীয়াতের অগ্রযাত্রা। এজন্য আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতি বছর ২৩ মার্চ তারিখে এই বয়আত দিবস পালন করে থাকে। দ্বিতীয়ত, আল্লাহর পক্ষ থেকে আগমনকারী মহামানব তথা হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহে মাওউদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) মহানবী (সা.)-এর কল্যাণে অজস্র নিদর্শন লাভ করেছেন। এসব নিদর্শনের মাঝে প্রতিশ্রুত পুত্র সন্তান সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। পণ্ডিত লেখরাম ও ইন্দ্রমোহনসহ বিভিন্ন

বিরুদ্ধবাদীরা যখন তাঁর কাছে নিদর্শন দাবি করে তখন তিনি দোয়া করে এর উত্তর দিবেন বলে জানান। এরপর ঐশী নির্দেশনায় চল্লিশ দিনের জন্য তিনি হুশিয়ারপুরে এক নিভৃত কক্ষে ধ্যানমগ্ন হন। তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে এক মহান পুত্র সন্তান লাভের সুসংবাদপ্রাপ্ত হন যা তিনি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিদর্শন প্রত্যাশীদেরকে জানিয়ে দেন। প্রকৃত বিষয় হলো, এরূপ মহান পুত্রসন্তানের ভবিষ্যদ্বাণী ও এর পূর্ণতার মাধ্যমে একদিকে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর দাবির সত্যতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়, অপরদিকে মহানবী (সা.)-এর সেই মহান ভবিষ্যদ্বাণীরও পূর্ণতা লাভ করে যাতে বলা হয়েছে, ‘আগমনকারী ঈসা বিবাহ করবেন এবং তাঁর সন্তানও হবে’ (মিশকাতুল মাসাবীহ)। তৃতীয়ত, আমাদের এ যুগে আল্লাহ তা’লা ইসলাম ধর্মের পুনর্জীবন ও ইসলামী শরীয়ত প্রতিষ্ঠাকল্পে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেন এবং তাঁর (আ.) মৃত্যুর পর দ্বিতীয় কুদরত বা কুদরতে সানীয়ার বিকাশস্বরূপ খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। আহমদীয়া জামা’তে সর্বপ্রথম ২৭ মে, ১৯০৮ সনে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এজন্য প্রত্যেক বছর ২৭ মে তারিখে খিলাফত দিবস উদ্‌যাপন করা হয় যাতে করে জামা’তের সদস্যদের মধ্যে খিলাফতের গুরুত্ব ও খলীফার পদমর্যাদার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়।

গত বছর বাংলাদেশ জামা’তের জাতীয় শূরাতে ‘আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের তিনটি দিবস’ বিষয়ক একটি পুস্তক প্রকাশের পরামর্শ প্রদান করা হলে হুযূর (আই.) তা অনুমোদন দান করেন। এরই বাস্তবায়নকল্পে বর্তমানে এই মূল্যবান পুস্তকটি প্রকাশিত হচ্ছে। এ পুস্তকটি বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ইশায়াত বিভাগের তত্ত্বাবধানে মাওলানা মামুন-উর-রশীদ সংকলন ও সম্পাদনার কাজ করেছেন। এছাড়াও পুস্তকটির প্রুফ দেখার কাজে যারা অনবদ্য পরিশ্রম করেছেন তারা হলেন সর্বজনাব মাওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমিন, মাওলানা রাসেল সরকার, মাওলানা মসীহ উর রহমান তপু এবং মাওলানা আবু সালেহ আহমদ মণ্ডল। পাশাপাশি এই গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকটি বাংলা ভাষাভাষীদের হাতে পৌঁছে দিতে বিভিন্ন সময়ে যারা যেভাবে অবদান রেখেছেন তাদের সকলকে আল্লাহ তা’লা উত্তমভাবে পুরস্কৃত করুন।



আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী

ন্যাশনাল আমীর

আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত, বাংলাদেশ

ঢাকা

ফেব্রুয়ারি ২০২৩

সূচীপত্র

বিষয়

পৃষ্ঠা

২৩ মার্চ: মসীহ মাওউদ (আ.) দিবস

প্রারম্ভ	০৩
হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের পটভূমি	০৪
কুরআনের আলোকে ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী	০৬
হাদীসের আলোকে ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী	০৮
কুরআনের আলোকে ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের সময়	০৯
হাদীসের আলোকে ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের সময়	১৪
বিভিন্ন ধর্মের আলোকে ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের সময়	১৫
হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব	২২
পবিত্র কুরআনের মাপকাঠিতে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা	২৪
মিথ্যা নবী দাবিকারকের পরিণামে ধ্বংস অনিবার্য	২৪
দাবিকারকের দাবির পূর্বের জীবন	২৬
সত্য নবীর জামা'তকে উন্নতি দান	২৮
আলেমেদের চরম বিরোধিতা (ইমাম মাহদীর বিরুদ্ধাচরণ)	২৯
যুগ ইমাম ও অন্যান্য সংস্কারক বনাম সমসাময়িক ওলামা	৩০
হাদীসের আলোকে ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতা	৩৪
প্রতিশ্রুত চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ	৩৪
‘ইয়ানযিলু’ শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য	৩৮
হাকামান আদালান	৩৯
“ইয়াকসিরাস সালীব” অর্থাৎ তিনি ত্রুশ ধ্বংস করবেন	৪০
‘ইয়াকতুলুল খিজির’ অর্থাৎ তিনি শূকর হত্যা করবেন	৪১
জিযিয়া কর উঠিয়ে দিবেন	৪২
বহু সম্পদ দান করবেন কিন্তু কেউই তা গ্রহণ করবে না	৪২
পৃথিবীর সকল বস্তুর চেয়ে একটি সিজদা উৎকৃষ্ট হবে	৪৪
প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী	৪৫
বাঙালিদের মনস্তপ্তি করা হবে	৪৫
বয়আতের দশটি শর্ত	৪৬
উদাত্ত আহ্বান	৪৮

২০ ফেব্রুয়ারি: মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস

মুসলেহ মাওউদ (রা.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পটভূমি	৫৩
মুসলেহ মাওউদ কে?	৫৫
হাদীসসমূহে ‘মুসলেহ মাওউদ’-এর সংবাদ	৫৭
হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কর্তৃক ঘোষিত ‘মুসলেহ মাওউদ’ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী	৫৯
হুশিয়ারপুরের অবস্থা	৬২
ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্য	৬৩
‘মুসলেহ মাওউদ’-এর জন্মগ্রহণের নির্ধারিত সময়সীমা নয় বছর	৬৪
প্রথম বশীরের জন্মগ্রহণ	৬৫
প্রথম বশীরের মৃত্যুতে লোকজনের আপত্তিসমূহ	৬৬
২০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৬ সনের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বিশদ ইলহামী ব্যাখ্যা	৬৬
দ্বিতীয় বশীর এবং মাহমুদ একই ব্যক্তি	৬৮
আগমনকারী ‘মাওউদ’-এর বায়ান্নটি লক্ষণ	৬৯
‘মুসলেহ মাওউদ’-কে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে	৭১
কুরআনী জ্ঞানের বিকাশ ও তফসীর সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে চ্যালেঞ্জ	৭৪
আহমদীদের মোকাবিলায় লাহোরী গ্রুপের ব্যর্থতার সংবাদ	৭৬
আহরারী জামা’তের পরাজয়	৭৮
পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ‘মুসলেহ মাওউদ’-এর প্রসিদ্ধি ও ইসলামের প্রসার লাভ	৮০
‘সে বন্দিদের মুক্তির কারণ হবে’	৮৩
‘খোদার ছায়া তার শিরে থাকবে’	৮৪
‘সে মহিমান্বিত, মাহাত্ম্য ও সম্পদের অধিকারী হবে’	৮৬
‘আমরা তার মাঝে আমাদের রূহ ফুৎকার করব’	৮৬
‘সে তিনকে চারে পরিণত করবে’	৮৮
‘ঐশী গৌরব ও প্রতাপ প্রকাশের কারণ হবে’	৮৯
কসম খেয়ে ‘মুসলেহ মাওউদ’ দাবির ঘোষণা ও বিরুদ্ধবাদীদেরকে মোবাহেলার আমন্ত্রণ	৯০
একনজরে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর অসামান্য অবদান	৯২

২৭ মে: খিলাফত দিবস

কুদরতে সানীয়া	৯৮
খিলাফত কী এবং কেন?	১০৪
খিলাফতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য	১০৬
খিলাফত প্রতিষ্ঠা কোনো মানবের কাজ নয়	১০৮
খিলাফতের ধারাক্রম	১০৯
আহমদীয়া খিলাফত	১১০
খিলাফতে রাশেদার কল্যাণরাজি	১১৩
অআহমদীদের দৃষ্টিতে খিলাফতের আধ্যাত্মিক কল্যাণরাজি	১১৪
খিলাফত এক ঐশী রাজত্ব	১১৭
খিলাফতে মাধ্যমে পৃথিবীতে তওহীদ প্রতিষ্ঠিত হয়	১১৯
আধ্যাত্মিক উন্নতি খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত	১২৫
‘খিলাফতে আহমদীয়ার’ অফুরন্ত কল্যাণরাজির একবালক	১২৬
ইসলামের প্রচার ও প্রসারে বৈপ্লবিক কাজ সম্পাদন	১২৮
বিশ্বব্যাপী মসজিদ নির্মাণ	১২৯
কুরআনের অতুলনীয় সেবা	১৩০
মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মর্যাদাকে সমুন্নত রাখা	১৩১
তথ্যপ্রযুক্তিকে ইসলামের কাজে ব্যবহার	১৩২
অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি	১৩৩
খিলাফতে আহমদীয়া আমাদের জন্য এক নিরাপদ ও সুরক্ষিত দুর্গ	১৩৫
খলীফা দোয়ার এক জীবন্ত ভাণ্ডার	১৩৫
আমাদের খলীফা সমগ্র জগতের আস্থাবান নেতা	১৩৭
খিলাফতের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করা উচিত নয়	১৪১
খিলাফত- বিশ্বব্যাপী ঐক্য প্রতিষ্ঠার বার্তা	১৪৩
ইমামের প্রতি আনুগত্যের মাঝেই সকল কল্যাণ নিহিত	১৪৫
খোদা তা’লার নৈকট্য লাভে খলীফা সহায়কস্বরূপ	১৪৫
আহমদীয়া জামা’তের খলীফাগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	১৪৬
কিছু ঐতিহাসিক ছবি	১৭৩

২৩ মার্চ: মসীহ মাওউদ (আ.) দিবস



প্রতিষ্ঠিত মসীহ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ১৮৩৫ সনে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আজীবন পবিত্র কুরআন-এর গবেষণা ও মাহাত্ম্য অনুসন্ধান, দোয়া ও একান্ত ধর্মপরায়ণ জীবনযাপন করেন। চারদিক হতে ইসলামের বিরুদ্ধে নোংরা অপবাদ, আক্রমণ, মুসলমানদের চরম অবনতি, নিজ ধর্মবিশ্বাসে সন্দেহ, সংশয় ও নামমাত্র ধর্মপালন ইত্যাদি অবলোকন করে তিনি ইসলামের যথার্থ ও

পরিপূর্ণরূপ প্রকাশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর বিশাল রচনাসমগ্র (প্রায় ৮৮টি পুস্তক), বক্তৃতা, আলোচনা, ধর্মীয় বিতর্ক (বাহাস) প্রভৃতিতে তিনি অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করে সাব্যস্ত করেন, ইসলাম-ই একমাত্র জীবন্ত ধর্ম এবং একমাত্র এরই বিশ্বাসসমূহ ধারণ ও পালন করার মাধ্যমে মানবকুল তার পরম স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও ইসলাম ধর্মের বিধিবিধানই কেবল মানবজাতিকে নৈতিকতা, উন্নততর বুদ্ধিবৃত্তি এবং আধ্যাত্মিকতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছাতে পারে। তিনি ঘোষণা করেন— কুরআন, বাইবেল ও হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মহান আল্লাহ তা'লা তাঁকে মসীহ ও মাহদী হিসাবে নিযুক্ত করেছেন। ঐশী আদেশে ১৮৮৯ সন হতে তিনি তাঁর হাতে সকলকে একত্র করার জন্য বয়আত গ্রহণ করা শুরু করেন, যা এখন বিশ্বের ২২০টি দেশজুড়ে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। ১৯০৮ সনে প্রতিশ্রুত হযরত মসীহ (আ.)-এর মৃত্যুর পর হযরত মাওলানা হেকীম নুরুদ্দীন (রা.) খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) প্রথম খলীফা নির্বাচিত হয়ে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

১৯১৪ সনে খলীফাতুল মসীহ আউয়াল-এর মৃত্যুর পর হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর প্রতিশ্রুত পুত্র হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) প্রায় ৫২ বছর খলীফাতুল মসীহ হিসাবে তাঁর কার্যক্রম চালিয়ে যান। ১৯৬৫ সনে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বড়ো পুত্র ও ইমাম মাহদীর প্রতিশ্রুত পৌত্র হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) খলীফা নির্বাচিত হন। প্রায় ১৭ বছর জামা'তের অভূতপূর্ব সেবা করার পর ১৯৮২ সনে তাঁর তিরোধান হয়। এরপর তাঁর ছোটো ভাই হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) খলীফা নির্বাচিত হন। ১৯ এপ্রিল ২০০৩ সনে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত খলীফাতুল মসীহ রাবে হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) জামা'তকে বিশ্বমব্য ব্যাপক পরিচিতি ও বর্তমানের শক্তিশালী অবস্থায় আনার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদান করেন। হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলীফা, আধ্যাত্মিক পিতা ও প্রধান হিসাবে বর্তমানে নেতৃত্ব দান করে চলেছেন এবং তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর আধ্যাত্মিক আশিস লাভকারী এক সৌভাগ্যবান প্রপৌত্র।

প্রারম্ভ

মার্চ মাস, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে যেমন একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে, তেমনি আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের ইতিহাসে এ মাস এক অবিস্মরণীয় অবস্থান রাখে। ১৮৮৯ সনের মার্চ মাসের ২৩ তারিখে ঐশীপ্রতিশ্রুতি মোতাবেক ‘বাবে লুদ’ তথা লুখিয়ানা শহরে উম্মতে মুহাম্মদীয়ায় আবির্ভূত মসীহ মাওউদ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর হাতে ৪০ জন বয়আত গ্রহণ করেন। এই ৪০ জনকে নিয়েই শুরু হয়েছিল আহমদীয়াতের অগ্রযাত্রা।

তিনি (আ.) বয়আতে ইচ্ছুক সকলকে, জামা’তের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি আলোকপাত করে পূর্বেই ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ৪ মার্চ প্রকাশিত এক ইশতেহারযোগে (প্রচারপত্র) জানিয়ে দেন—

“মুত্তাকীদের জামা’ত গঠন অর্থাৎ খোদাভীরুতায় অলংকৃত ব্যক্তিদের এক জামা’তে সংঘবদ্ধ করা হলো বয়’আতের এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য, যাতে খোদাভীরুদের এমন বড়ো এক দল গঠিত হয়ে জগতে নিজেদের পবিত্র প্রভাবের বিস্তার ঘটাতে পারে এবং তাদের একতা, ইসলামের জন্য কল্যাণ, মাহাত্ম্য ও শুভ পরিণাম বয়ে আনে। ... খোদা তা’লা এই দলকে নিজ প্রতাপ প্রকাশ করতে ও স্বীয় শক্তি, ক্ষমতা ও মহিমা প্রদর্শনের জন্য সৃষ্টি করতে আর উন্নতি দিতে, এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যাতে পৃথিবীতে খোদাপ্রেম, সত্যিকার অনুতাপ, পবিত্রতা, প্রকৃত ও সঠিক পুণ্যকর্ম, শান্তি ও কল্যাণ এবং মানবসন্তানদের পরস্পরের মাঝে মায়ামমতা ও সহমর্মিতা ছড়িয়ে দিতে পারেন। অতএব এই দল, তাঁর বিশেষ এক দলের মর্যাদা পাবে। তিনি তাদেরকে তাঁর নিজস্ব বিশেষ প্রেরণায় শক্তি যোগাবেন। তাদেরকে কলুষিত জীবন থেকে মুক্তি দিবেন। অতঃপর তাদের জীবনে এক পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করবেন। তিনি যেমনটি তাঁর নিজ ভবিষ্যদবাণীতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এই দলকে তিনি বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন এবং হাজার হাজার বিশ্বস্ত ও সত্যবাদীদের এতে প্রবিষ্ট করবেন। তিনি স্বয়ং এতে পানি সিঞ্চন করবেন এবং একে উন্নতি দান করবেন এতটা যে, এদের আধিক্য ও কল্যাণসমূহ মানবীয় দৃষ্টিতে আশ্চর্যজনক মনে হবে। তারা উঁচু স্থানে স্থাপিত প্রদীপ্ত মশালের মতো দুনিয়ার চতুর্দিকে স্বীয় আলোকময় দ্যুতি ছড়িয়ে দিবে আর ইসলামের কল্যাণরাজির জন্য তারা অনুকরণীয় আদর্শ হিসাবে স্বীকৃত হবে।

তিনি এ জামা'তের পূর্ণ অনুসারীদেরকে সকল প্রকার কল্যাণের ক্ষেত্রে অন্য সকলের ওপর পূর্ণ বিজয় দান করবেন। কিয়ামতকাল পর্যন্ত স্থায়ীভাবে তাদের মধ্য থেকে এমন লোক সৃষ্টি হতে থাকবে, যাদেরকে গ্রহণযোগ্যতা ও সহায়তা প্রদান করা হবে। সেই মহাপ্রতাপান্বিত প্রতিপালক এটাই চেয়েছেন, তিনি সর্বশক্তিমান, যা-ই চান করে থাকেন। প্রত্যেক শক্তি ও মহিমা তাঁরই।” (তবলীগে রিসালত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫০-১৫৫)

আজ সারা বিশ্বের প্রায় ২২০টি দেশে কোটি কোটি মানুষ তাঁকে প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) ও ইমাম মাহদী হিসাবে গ্রহণ করে নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধনে তৎপর রয়েছে। নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.)-এর গতিশীল নেতৃত্বে মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা ও আদর্শ প্রতিষ্ঠায় নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ তা'লা আমাদের দেশের সত্যান্বেষীদেরকেও সত্য মসীহ ও মাহদীকে চেনার এবং তাঁকে গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের পটভূমি

ব্রিটিশ ভারতে মুসলমানদের ইতিহাস একদিকে যেমন দুঃখ ও গ্লানির ইতিহাস, ব্যর্থতা ও বিজিতের ইতিহাস, অন্যদিকে তেমনি সংগ্রামেরও ইতিহাস, হুতরাজ্য ও গৌরব পুনরুদ্ধারের ইতিহাস। ভারতবর্ষের ভূখণ্ড দখলের সাথে সাথে ব্রিটিশরা চেয়েছিল এদেশের সকল ধর্ম ও সংস্কৃতিকে জয় করতে এবং সে লক্ষ্যেই সংগ্রাম করে চলেছিল তাদের পাদ্রীরা ও পণ্ডিতরা। এই সংগ্রামে তারা সফলতা অর্জন করে অগ্রসরও হচ্ছিল ক্রমাগত। পাদ্রীদের লক্ষ্যস্থল ছিল প্রধানত মুসলমান ও ম্যাক্সমুলারের মতো পণ্ডিতের লক্ষ্যস্থল ছিল হিন্দু ও অন্যান্য। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক এই আক্রমণের মুখে নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার্থে হিন্দুদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন ধর্মান্দোলন। যেমন- সনাতন ধর্ম, আর্যসমাজী, ব্রাহ্মসমাজী প্রভৃতি কিন্তু তখনও মুসলমানদের মধ্যে অনুরূপ কোনো ধর্মান্দোলন গড়ে ওঠে নি। বরং পাদ্রীদের কাছে পরাভূত হয়ে মুসলমানদের বড়ো বড়ো আলেমও খ্রিষ্টান হয়ে যাচ্ছিল এবং অন্যান্য আলেমরা তাদের বিরুদ্ধে কুফরী ফতোয়া দিয়েই ক্ষান্ত থাকতেন। তারা তাদেরকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থাও করতেন না আবার খ্রিষ্টানী আক্রমণ প্রতিহত করারও কোনো চেষ্টা করতেন না।

বস্তুত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় সমগ্র সময়ই ছিল মুসলমানদের জন্য এক মহাদুর্যোগকাল। তখন একদিকে তারা রাজ্যহারা হয়েছে অন্যদিকে ধর্মহারা হচ্ছিল। এই শোচনীয় অবস্থায় তাদেরকে সহায়তা করার জন্য পুরো ভারতবর্ষে এবং সমগ্র মুসলিম জাহানে কেউ ছিল না। কারণ সর্বত্রই চলছিল খ্রিষ্টান রাজত্বের ও প্রতাপের জয় জয়কার। মুসলমানদের এই হতাশাগ্রস্ত ও বিপর্যস্ত পরিস্থিতিতে ১৮৮৯ সালে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব ঐশী নির্দেশে ইসলামিয়া আহমদীয়া আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেন।

সাধারণভাবে মুসলমানরা নৈরাজ্যে নিপতিত ছিল। তারা পরাজিত মনোভাবের শিকারে পরিণত হয়েছিল। তারা এ ব্যাপারে হতবাক হয়ে পড়েছিল যে, সহজ বা কোনো সাধারণ উপায়ে আর কোনো পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন সম্ভব নয়। তাই বহু লোক অপেক্ষা করছিল কোনো ঐশী মনোনীত ইমামের আবির্ভাবের। নিম্নে এ সম্পর্কে তৎকালীন কতক মান্যবরের উদ্ধৃতি উপস্থাপিত হলো:

এই প্রসঙ্গে এ. এইচ. নদবী বলেন—

“এই সেই সময়, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে, মির্যা গোলাম আহমদ তাঁর অনন্য বাণী ও আন্দোলন নিয়ে দৃশ্যপটে আবির্ভূত হন।” (কাদিয়ানিজম এ ক্রিটিকাল স্টাডি, পৃ. ৩-৬, ২৫-২৬)

মাওলানা মুহাম্মদ শরীফ লিখেছেন—

“চতুর্দিক হতে ইসলামের ওপর আক্রমণ চলছিল। নাস্তিকতা প্রসার লাভ করছিল। এককথায় সকল ধর্মের অনুসারীরা ইসলামের প্রদীপ নির্বাপিত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। আমরা বহুদিন যাবত অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলাম যে, মুসলিম আলেমদের মধ্য হতে কেউ একজন আল্লাহ কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে তার ধর্মের সমর্থনে ও রক্ষাকল্পে দণ্ডায়মান হবেন। তিনি এমন এক পুস্তক রচনা করেছেন যা সময়ের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম। তিনি যুক্তিতর্ক দ্বারা, দলীলপ্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করেছেন যে, পবিত্র কুরআন আল্লাহর কалаম এবং হযরত রসূল করীম (সা.) আল্লাহর সত্য নবী।

‘আমরা আল্লাহর কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ যে, আমাদের সে প্রত্যাশা অবশেষে পূর্ণ হয়েছে। এইতো সেই পুস্তক যার প্রণয়নের প্রতীক্ষায় ছিলাম আমরা এতকাল। এর শিরোনাম ‘বারাহীনে আহমদীয়া’। এতে গ্রন্থাকার

পবিত্র কুরআন ও হযূর (সা.)-এর নবুয়তের সত্যতার স্বপক্ষে তিনশ অবিসংবাদিত দলীলপ্রমাণ পেশ করেছেন। এই গ্রন্থের প্রণেতা আলেমকূলের শিরোমণি, সিদ্ধ ও সার্থক বিশেষজ্ঞ। তিনি ভারতবর্ষের মুসলমানদের গৌরব, সর্বশক্তিমান আল্লাহর এক পছন্দকৃত ও মনোনীত বান্দা। তিনি চিফ অব কাদিয়ান মৌলবি মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব।” [‘মনশূর মোহাম্মদী’ (ব্যাঙ্গালোর)]

ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী নেতা ও আলেম মাওলানা আবুল কালাম আজাদ লিখেছেন— “ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবিলায় তিনি যে-রূপ বিজয়ী জেনারেলের কর্তব্য সম্পাদন করেছেন, তাতে আমরা এই কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছি, যে মহান আন্দোলন আমাদের শত্রুদেরকে দীর্ঘকাল যাবত বিপর্যস্ত করে রেখেছিল তা যেন ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকে।” (উকিল পত্রিকা, ২০ জুন ১৯০৮)

এককথায়, এ যুগে আল্লাহর আদেশের অনুবর্তিতায় উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্য হতে যে মহাপুরুষ ইসলামের শত্রু ও সমালোচকদের মুখ চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছেন, তিনি হলেন আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.), প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)।

কুরআনের আলোকে ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন সম্পর্কে কুরআন করীমের বিভিন্ন স্থানে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। যেভাবে কুরআন করীমে বলা হয়েছে—

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَتَّبِعِ إِسْرَءِيلَ إِنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ۝

অর্থ: আর (স্মরণ করো) মরিয়মের পুত্র ঈসা যখন বলেছিল, ‘হে বনী ইসরাঈল! নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর রসূল, তওরাতের যা আমার সামনে রয়েছে এর সত্যায়নকারীরূপে এবং আমার পরে আগমনকারী এক

মহান রসূলের সুসংবাদদাতারূপে (এসেছি)। তার নাম হবে আহমদ। এরপর সে যখন সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ তাদের কাছে এলো তারা বলল, ‘এত এক সুস্পষ্ট যাদু।’ (সূরা আস-সাফফ: ৭)

উক্ত আয়াতে প্রথমে “আহমদ” বলতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে বুঝানো হয়েছে। তারপর “আহমদ” হিসাবে হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে, কেননা আল্লাহ তা’লা হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-কে ওহীর মাধ্যমে আহমদ নামে অবহিত করেছেন। (বারাহীনে আহমদীয়া) এবং তার আগমনের মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর দ্বিতীয় আগমনের বাস্তবায়ন ঘটেছে।

আবার সূরা আস-সাফফ-এর ১০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা’লা বলেন—

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ○

অর্থ: “তিনিই তাঁর রসূলকে হিদায়াত ও সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছেন যেন তিনি তাকে সব ধর্মের ওপর বিজয় দান করেন। আর মুশরিকরা যত অপছন্দই করুকনা কেন (তিনি তা দান করবেন)।”

তফসীরকারকগণ সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেন যে, এ আয়াতটি প্রতিশ্রুত মসীহ সম্পর্কে প্রযোজ্য, কারণ তাঁর সময়েই সকল ধর্ম নিজ নিজ প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য আন্দোলন শুরু করবে এবং প্রতিশ্রুত মসীহের যুক্তির বলে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হবে।

আবার সূরা আল-জুমুআ-এর ৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে—

وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

অর্থ: “আর তাদেরই মধ্য হতে অন্যদের প্রতিও (তিনি তাকে আবির্ভূত করবেন), যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয় নি। আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।”

এ আয়াতে শেষ যুগে প্রতিশ্রুত মসীহরূপে মহানবী (সা.)-এর আধ্যাত্মিক আবির্ভাব ঘটবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। মহানবী (সা) স্বয়ং এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বিষয়টির ওপর একটি প্রসিদ্ধ হাদীস রয়েছে। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, একদা যখন আমরা রসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম, ঠিক

সে সময় সূরা আল-জুমুআ অবতীর্ণ হলো। আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে জানতে চাইলাম, এ সূরাতে উল্লিখিত তাদেরই মাঝে হতে অন্যদের প্রতিও (তিনি তাকে আবির্ভূত করবেন), যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয় নি, সেই অন্যরা কারা? হযরত সালমান ফার্সি (রা.)-ও আমাদের মাঝে উপবিষ্ট ছিলেন। আমি বার বার এই একই প্রশ্ন করায় রসূলুল্লাহ (সা.) সালমান ফার্সির কাধের ওপর হাত রেখে বললেন, “ঈমান যদি সুরাইয়্যা নক্ষত্রেও উঠে যায় তথাপি এদের (পারস্য বংশীয়দের) এক বা একাধিক ব্যক্তি নিশ্চয় তা ফিরিয়ে আনবে। (বুখারী, কিতাবুত তফসীর)

হাদীসের আলোকে ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী

১. হযরত নুমান বিন বশীর হুযায়ফা হতে বর্ণিত, হযরত রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে নবুয়ত ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'লা চাইবেন অতঃপর আল্লাহ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। তাঁর পর নবুয়ত-এর পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ চাইবেন, অতঃপর আল্লাহ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন যুলুম, অত্যাচার ও উৎপীড়নের রাজত্ব কয়েম হবে। তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'লা চাইবেন, অতঃপর আল্লাহ তা উঠিয়ে নিবেন। তখন তা অহংকার ও জ্বরদস্তিমূলক সাম্রাজ্যে পরিণত হবে, এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ চাইবেন, অতঃপর আল্লাহ তা উঠিয়ে নিবেন। অতঃপর নবুয়তের পদ্ধতিতে (অর্থাৎ মাহদী মা'হুদ ও মসীহ মাওউদ-এর আগমনের পর) পুনরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর হুযর (সা.) নীরব হয়ে গেলেন। (আহমদ-বায়হাকী)

২. হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, “তোমরা যখন তাঁকে দেখতে পাবে তার হাতে বয়আত করো, যদি বরফের পাহাড়ের ওপর হামাগুড়ি দিয়েও যেতে হয়, নিশ্চয় তিনি আল্লাহর খলীফা আল-মাহদী”। (সুনানে ইবনে মাজা, বাব খুরুজুদ দাজ্জাল)

৩. হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, “তোমাদের (মুসলমানদের) মধ্যে যারা জীবিত থাকবে তারা ঈসা ইবনে মরিয়মকে ন্যায়বিচারক ইমাম মাহদী

রূপে দেখতে পাবে। তিনি ত্রুশ (মতবাদ) ধ্বংস করবেন এবং শূকর নিধন করবেন ও ধর্মযুদ্ধ রহিত করবেন”। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)

৪. হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, “তোমাদের অবস্থা তখন কেমন হবে, যখন ইবনে মরিয়ম তোমাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়ে তোমাদের ইমামতি করবেন”। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান)

কুরআনের আলোকে ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের সময়

সূরা আল-কিয়ামাহ-এর আয়াত ৯ ও ১০ এ আল্লাহ তা’লা বলেছেন—

وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۝ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝

অর্থ: এবং চন্দ্রে গ্রহণ লাগবে, এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্র করা হবে।

সূর্য ও চন্দ্রকে একত্র করা হবে এই বাক্যটি দ্বারা সৌরজগতের মহাবিপর্ষয় ঘটবে বুঝাতে পারে।

আয়াতটির অন্য অর্থ এই যে, মহানবী (সা.)-এর হাদীসে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে, প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী আগমনের সময় তাঁর সত্যতার চিহ্নস্বরূপ একই রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হবে।

সূরা আস-সাফফাত-এর ৭২-৭৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে—

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ۝ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ۝

অর্থ: আর তাদের আগে (তাদের) পূর্ববর্তীদের অধিকাংশ নিশ্চয় বিপথগামী হয়েছিল, অথচ আমরা তাদের মাঝে সতর্ককারী পাঠিয়েছিলাম।

সূরা আর-রুম-এর ৪২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে—

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا ۖ أَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

অর্থ: মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে ও স্থলে বিশৃঙ্খলা ছেয়ে গেছে। এর পরিণামে তিনি তাদের কোনো কোনো কর্মের (শাস্তির) স্বাদ তাদের ভোগ করাবেন যাতে তারা (আল্লাহর দিকে) ফিরে আসে।

সূরা আত-তাকভীর এমন একটি সূরা, যে সূরা পুরোটাই হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীতে ভরপুর। হযরত নবী করীম (সা.) নিজ জনগণের মাঝে যে বিপ্লব এনেছিলেন তা পৃথিবীতে দুবার হবার কথা। প্রথমে হুযূর (সা.)-এর স্বয়ং আগমনের মাধ্যমে, অতঃপর তাঁর (সা.) প্রতিনিধি প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আ.)-এর মাধ্যমে, যার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে কুরআনের ৬২:৪ আয়াতে। নিম্নে এ সূরার আয়াতসমূহ আলোচনা করা হলো।

২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে—

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

অর্থ: সূর্যকে যখন ঢেকে দেয়া হবে,

আলোচ্য আয়াতে দুটি বিষয় আলোচিত হয়েছে। প্রথমতঃ আধ্যাত্মিক অন্ধকার ছেয়ে যাবার কথা বলা হয়েছে যখন তা বিশ্বকে গ্রাস করে ফেলবে। আধ্যাত্মিক সূর্য মহানবী (সা.)-এর আলো যখন মানুষের দৃষ্টিতে স্নান হয়ে যাবে অথবা প্রায় তিরোহিত হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়তঃ হুযূর (সা.)-এর একটি সুপ্রসিদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের নিদর্শন স্বরূপ চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের বিষয়।

৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে—

وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ

অর্থ: এবং তারকারা যখন স্নান হয়ে যাবে,

এই আয়াতে তারকা বলতে ধর্মীয় আলেম-ওলামাদের বুঝানো হয়েছে। এ অর্থ মহানবী (সা.)-এর হাদীস দ্বারা সমর্থিত। মহানবী (সা.) বলেছেন, আমার সাহাবীরা তারকাসদৃশ, তাদের মধ্যে যাকে-ই তোমরা অনুসরণ করবে সৎপথ পাবে। (বায়হাকী)

অতএব, আয়াতটির অর্থ, যখন ধর্মীয় নেতাদের পদস্থলন ঘটবে এবং তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি একেবারে কমে যাবে। আয়াতটিতে ধর্মীয় সংস্কারের আগমনকালে ব্যতিক্রমী সংখ্যায় উদ্ধাপাতের যে ঘটনা ঘটে থাকে সে কথার প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে—

وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ

অর্থ: এবং পাহাড় পর্বতকে যখন স্থানচ্যুত করা হবে।

যখন পাহাড়গুলো ডিনামাইট দিয়ে বিধ্বস্ত করে সেগুলোর মধ্য দিয়ে রাস্তা তৈরি করা হবে। রূপকভাবে অর্থ নিলে দাঁড়াবে, শাসকবর্গের কর্তৃত্ব খর্ব হয়ে যাবে। ‘জাবাল’ শব্দের এক অর্থ জাতির প্রধান, বড়ো জামা’ত বা সংঘবদ্ধ দল। (মুফরাদাত, মুনজিদ ও লেইন)

৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে—

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ

অর্থ: এবং দশমাসের গর্ভবতী উটনীগুলোকে যখন অযত্নে পরিত্যাগ করা হবে।

আয়াতটির ব্যাখ্যা হলো, যখন আরবের মতো মরু দেশে উটনীর কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। এটা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করে, যানবাহনরূপে উটের ব্যবহার উঠে যাবে এবং উন্নত ও দ্রুতগতিসম্পন্ন যানবাহন, যেমন মোটরগাড়ি, রেলগাড়ি, জাহাজ, উড়োজাহাজ ইত্যাদি এর স্থান দখল করে নিবে। যেভাবে হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর এক হাদীসে আছে, “উট পরিত্যক্ত হবে এবং একস্থান হতে অন্য স্থানে যাবার জন্য ব্যবহৃত হবে না।” (মুসলিম)

৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে—

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ

অর্থ: এবং বন্য জীবজন্তুদের একত্র করা হবে।

এখানে এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, যখন বন্য জন্তুজানোয়ার ও পশুপাখিকে চিড়িয়াখানায় একত্র করা হবে অথবা আদিবাসী লোকদেরকে ছত্রভঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন অবস্থা হতে এনে নাগরিক সম্প্রদায়রূপে সংগঠিত করা হবে অথবা তাদেরকে নিজেদের মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য করা হবে।

৭ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে—

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ

অর্থ: এবং নদী ও সাগরগুলোকে (নিয়ন্ত্রিত করে একটিকে অন্যটির মধ্যে) যখন প্রবাহিত করা হবে।

এ আয়াতে বলা হয়েছে, যখন সেচকাজ বা বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদির জন্য নদী বা সমুদ্র হতে পানি অন্যদিকে প্রবাহিত করা হবে অথবা খাল কেটে বিশাল সমুদ্রগুলোকে সংযুক্ত করা হবে।

৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে—

وَإِذَا التُّفُوسُ زُوِّجَتْ

অর্থ: এবং (বিভিন্ন জাতির) লোকদের যখন একত্র করে দেয়া হবে।

যখন যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা এত উন্নত হবে যে, অতি দূরদূরান্তের ভিন্ন জাতির লোক পরস্পরের মধ্যে সহজে ও স্বল্প সময়ে যোগাযোগ ও আদান-প্রদানের সুযোগ লাভ করবে এবং এ সুবাদে আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপনের মাধ্যমে একই জাতির লোকের মতো একত্র হবে। এ আয়াতের অন্য তাৎপর্য হলো, সমমনা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লোকেরা নিজেদের মধ্যে দল গঠন করবে।

৯ ও ১০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে—

وَإِذَا الْمَوْدَّةُ سُيِّلَتْ ۝ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

অর্থ: এবং জীবন্ত পুঁতে ফেলা কন্যা(সন্তানদের) সম্পর্কে যখন জিজ্ঞেস করা হবে, কোন অপরাধে (তাদের) হত্যা করা হয়েছে?

আয়াতদ্বয়ে ভবিষ্যতের সভ্যসমাজ ও রাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যারা অনেক ক্ষেত্রে নিজ সন্তানদের ওপর পিতামাতার অধিকার দিতে অস্বীকার করবে এবং যখন বালিকাদের পুড়িয়ে মারা বা জীবন্ত কবরে পুঁতে রাখা ইত্যাদি অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডের আইন প্রণীত হবে। এ আয়াতে বর্ণিত বিষয়টি এ যুগে এত নিখুঁতভাবে পূর্ণ হয়েছে যে, নিজ সন্তানদের হত্যা করা তো দূরে থাক, পিতামাতার পক্ষ হতে কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি হয়েছে বলে প্রমাণিত হলেও এসব সরকার সন্তানসন্ততিদেরকে নিজ তত্ত্বাবধানে নিয়ে নেয়।

১১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে—

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝

অর্থ: এবং পুস্তক-পুস্তিকা যখন ব্যাপকভাবে প্রকাশ করা হবে।

এ আয়াতে বিশ্বব্যাপী সংবাদপত্র, সাময়িকী ও পুস্তক-পুস্তিকার প্রকাশনা ও প্রচারের বিরাট আয়োজন, লাইব্রেরী-পাঠাগার প্রতিষ্ঠা এবং সর্বত্র জ্ঞানবিজ্ঞানের বিস্তার সাধনের ব্যবস্থা ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। এটা শেষ যুগের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিত্র।

১২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে—

وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝

অর্থ: এবং আকাশের আবরণ যখন খুলে ফেলা হবে।

শেষ যুগে মহাকাশ বিজ্ঞানের ব্যাপক অগ্রগতি লাভ করার বিষয়টি আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে। বিজ্ঞানের এ শাখা গত এক শতাব্দীতে যে উন্নতি লাভ করেছে তা মানুষকে হতবাক করে দেয়।

১৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে—

وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ۝

অর্থ: এবং জাহান্নামকে যখন উত্তপ্ত করা হবে।

এ আয়াতে বলা হয়েছে, মানুষের পাপাচার ও অন্যায় এত ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করবে যে, আল্লাহর ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে যার ফলে মহাবিপ্লবংসী যুদ্ধসমূহ মানুষের ওপর দোষখের আঘাবের মতো নেমে আসবে।

১৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে—

وَإِذَا الْجَنَّةُ أُرْلِفَتْ ۝

অর্থ: এবং জান্নাতকে যখন নিকটবর্তী করে দেয়া হবে।

যেহেতু শেষযুগে মানুষ সাধারণভাবে পাপের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিবে এবং ধনসম্পদে ও ভোগবিলাসিতায় মত্ত হয়ে উঠবে, তখন যে অল্প সংখ্যক লোক সৎপথে সরল প্রাণে ধর্মকর্ম করতে থাকবে তারা পুরস্কৃত হবে এবং বেহেশত লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

হাদীসের আলোকে ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের সময়

আল্লাহ তা'লা কুরআন করীমে বলেন-

يُدَبِّرُ الْأُمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ
أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ○

অর্থ: তিনি পরিকল্পিতভাবে (নিজ) সিদ্ধান্ত আকাশ হতে পৃথিবীতে প্রবর্তন করবেন। এরপর তা এরূপ এক দিনে তাঁর দিকে উঠে যাবে যা তোমাদের গণনায় এক হাজার বছরের সমান। (সূরা আস-সিজদা: ৬)

এখন আসুন হাদীস হতে মহানবী (সা.)-এর বাণী দেখা যাক।

১. মহানবী (সা.) বলেন, “আমার শতাব্দী সর্বোৎকৃষ্ট, তারপর তাঁর সন্নিহিতগণ, তারপর তার সন্নিহিতগণ, অতঃপর মিথ্যার প্রাদুর্ভাব ঘটবে। (নিসাই, মিশকাত, বাব মুনাক্কেব সাহাবা)

২. হযরত রসূলে করীম (সা.) আরো বলেন, হযরত আবি কাতাদাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, ইমাম মাহদী (আ.) সম্পর্কিত লক্ষণসমূহ সেই ২০০ বছর পরে দেখা দিবে যা হাজার বছর পরে আসবে। (মিশকাত)

৩. এর সমর্থনে মোল্লা আলী কুরী বলেন, “সেই দু-শো বছর পর, যা হাজার বছর পর আসবে, সেটিই ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হবার সময়।” (মিরকাত, শরেহ মিশকাত)

উপরোক্ত আয়াত ও উল্লিখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের প্রথম তিনশ বছর তাঁর (সা.) শ্রেষ্ঠতম যুগ। অতঃপর যদিও প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে মুজাদ্দিদ আবির্ভূত হবেন তথাপি পরবর্তী এক হাজার বছরে শরীয়ত আল্লাহর দিকে উঠে যাবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর তিনশ বছরের পর চতুর্থ শতাব্দী হতে ক্রমাগত ধারায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ইসলাম আল্লাহর দিকে উঠে যাবে অর্থাৎ ইসলামের চরম অধঃপতন ঘটবে। অতঃপর ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কোনো মহাপুরুষের আবির্ভাব হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় এবং এটিই ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের মূল সময়। অর্থাৎ হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর

শেষে অথবা চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব হবার কথা।

তিনি যখন আবির্ভূত হবেন তখন আলেমরা তাঁর সম্পর্কে কুফরী ফতোয়া দিবে এমনকি তাকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হয়ে পড়বে। যেমন মৌলবি সিদ্দীক হাসান সাহেবও এ কথা স্বীকার করে উল্লেখ করেছেন যে, “তাঁর যুগের আলেমরা যারা ফিকাহবিদ ও পীরদের অন্ধঅনুসরণ করায় অভ্যস্ত হবে, সেই ইমাম মাহদীর শিক্ষা শুনে বলবে, সে তো দীন ইসলামের মূলোৎপাটন করছে; এভাবে তাঁর বিরুদ্ধাচরণের জন্য উঠেপড়ে লাগবে এবং তারা তাদের গোঁড়ামির ওপর বদ্ধপরিকর হয়ে পুরাতন অভ্যাস অনুযায়ী তাকে কাফির ও পথভ্রষ্ট আখ্যা দিবে। অর্থাৎ কাফির, দাজ্জাল, পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্তকারী ইত্যাদি তাঁর নাম রাখবে; কিন্তু তরবারীর আতঙ্কে ভয় করবে। মৌলবিদের চেয়ে বড়ো শত্রু তাঁর আর কেউ হবে না; কারণ তাঁর আগমনের ফলে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি, প্রাধান্য ও ক্ষমতায় হ্রাস সৃষ্টি হবে। যদি তরবারি না হতো তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে হত্যা করার ফতোয়া দিয়ে দিত। যদি তারা তাঁকে গ্রহণও করে তবুও অন্তরে তাঁর জন্য হিংসা বিদ্বেষ রাখবে। সাধারণ লোক যতটুকু তার অনুসরণ করবে বিশেষ লোক ততটুকু করবে না। আরেফ (আধ্যাত্মিক-দৃষ্টিসম্পন্ন পুণ্যবান) লোক, যারা আল্লাহর মহিমা ও প্রতাপের উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ্যকারী ও দিব্যদর্শন লাভকারী, তাঁরা বয়আত করে তাঁর জামাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।”

(হুজাজুল কিরামা, পৃ. ৩৬৩ এবং ৩৮২)

হুজাজুল কিরামার ৩৮৭ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে যে, হাফেয ইবনুল কাইয়েম তার “মিনার” পুস্তকে বলেছেন যে, মাহদীর সম্বন্ধে চারটি উদ্ধৃতি আছে, তার মধ্যে একটি হলো, “মাহদী-ই মসীহ ইবনে মরিয়ম”।

বিভিন্ন ধর্মের আলোকে ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের সময়

হিন্দু ধর্ম

গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের ৭ ও ৮ নং শ্লোকে আছে—

“যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানম অধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম।

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।

ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ।”

অর্থ: “হে ভারত! যখনই ধর্মের গ্লানী এবং অভ্যুত্থান হয়, আমি সেই সময়ই আবির্ভূত হই। সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।”

শেষ যুগের বর্ণনা দিতে গিয়ে ব্যাস মুনি বলেন, “হে রাজন! তখন কোনো ব্রাহ্মণ তার ধর্ম পালন করবে না। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণও আপন আপন কর্ম ছেড়ে দিয়ে অধর্ম কাজে লিপ্ত হবে। (ব্রাহ্মণদের জন্য ধর্মচর্চা, ক্ষত্রিয়দের জন্য রাজ্যশাসন এবং বৈশ্যদের জন্য কৃষিকার্য করা শাস্ত্রের বিধান, কিন্তু শেষ যুগে এই বিধান কেউ মেনে চলবে না)।” লোকের শরীর ও আয়ু, শক্তি ও বীর্য ক্ষয় পাবে। লোকেরা সত্য কথা অল্লই বলবে। জনপদসমূহ উজাড় হবে। ঐগুলি সর্প ও পশুর আবাসে পরিণত হবে। শূদ্রেরা ব্রাহ্মণকে তুমি এবং ব্রাহ্মণগণ শূদ্রকে আপনি বলবে। সন্তান সংখ্যা বৃদ্ধি কিন্তু দৈহিক শক্তি হ্রাস পাবে। গাভির দুধ ও বৃক্ষের ফল কম হবে। চৌরাস্তায় বৈশ্য ও বদমায়েশের ভিড় হবে। ধর্মস্থানে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশু বাস করবে। সময়মত বৃষ্টি হবে না। ... এরপর ব্যাস বলেন, সংসারে যখন এরূপ ঘটতে দেখবে তখন মনে করবে যে, কল্কি অবতারের আবির্ভাবের সময় হয়েছে। (মহাভারত, বন পর্ব ১৯৯ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

* বলা হয়েছে, কলি যুগের অবতার জগতপতি হবেন। অর্থাৎ সমস্ত জগতের জন্য তিনি আবির্ভূত হবেন। কল্কি পুরাণেও তার আগমন সমগ্র বিশ্বের জন্য বলা হয়েছে (৩/৮/৪৫)।

* ইতঃপূর্বে যত অবতার এসেছিলেন তারা সবাই ছিলেন শুধু ভারতের জন্য। কল্কি অবতার হবেন সমগ্র বিশ্বের জন্য। তার মাধ্যমে সমগ্র জগত একত্রিত হবে (গীতা, ১১/১৩)।

* কলিযুগ বলতে, ‘কলি শায়ানো ভবতি সংজীহানন্ত দ্বাপরঃ। উত্তীর্ণন ত্রেতা ভবতি কৃতং সম্পদ্যতে চরণ’। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ) অর্থাৎ ঘুমিয়ে থাকাই হলো কলিকাল আর এসীয়ে চলার নামই সত্য যুগ। এই কলিযুগ হাজার বৎসর পর আবির্ভূত হয়। যথা- ‘সহস্রমেকং বর্ষার্ণাং ততঃ কলিযুগং স্মৃতম্’। (মহাভারত, বনপর্ব ১৮৮/২৫)

* ভগবতে কলিকাল ১২০০ বৎসর বলা হয়েছে (১২:২/৩২) অর্থাৎ অবতারের আবির্ভাবে মানুষ যখন প্রগতির পথে অগ্রসর হয় তখনই সত্যযুগের সূচনা। হাজার বছরের অজ্ঞান অন্ধকারের ঘুমন্ত জাতিকে জাগ্রত করে। সমাগত অবতার মিথ্যার অবসান ঘটিয়ে সত্যের জয় সূচিত করেন।

* তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে- ‘লিঙ্গচ্ছেদী, শিখাহীনঃ, শূশ্র্ণধারী স দূষকঃ’ (ভবিষ্য পুরাণ, ২৫-২৮)। অর্থাৎ তিনি খৎনা করবেন, তার টিকি থাকবে না, দাড়ি থাকবে। কঙ্কির আধ্যাত্মিক পিতার বাসস্থানকে ‘পুরিকায়্যাং পুরিপুর্না’ অর্থাৎ নগরীসমূহের নগরী বলা হয়েছে (কঙ্কি পুরাণ, ৪র্থ অধ্যায়)।

* তার মহিমার কথা আজও গীতায় লিখিত রয়েছে (১১/৪৭)।

* তিনি ‘কঙ্কি কঙ্কহরঃ’ বা পাপহানী হবেন (কঙ্কী পুরাণ, ৩/৬/২৩)।

* ‘কলকি পরম তেজস্বী ধর্মানাং পরিরক্ষকঃ’ অর্থাৎ তেজস্বী ধর্মরক্ষক হবেন (ঐ, ৩/২/২)।

* তিনি তারকা সদৃশ লোকদের মধ্যে পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় অবস্থান করবেন (ঐ, ৩/১০/৩৩)।

* তার অবস্থানকাল এক হাজার বছর স্থায়ী হবে (ঐ, ৩/১৮/২)। অর্থাৎ শিক্ষার কাল হাজার বছর বলে নির্ধারিত হয়েছে। মৃত্যুকালে তিনি চার জন জীবিত পুত্র রেখে যাবেন (ঐ, ৩/১৯/১৪)।

* তার শিক্ষার আশ্রয় নিয়ে তার গ্রামে, তার চরণপার্শ্বে মৃত্যুর পর সমাহিত হলে সকল পাপ ক্ষয় ও মোক্ষলাভ হয় (ঐ, ৩/৮/৪)। অর্থাৎ তার শিক্ষা অনুযায়ী যদি কেউ ধর্মের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে একটি বিশেষ স্থানে সমাহিত হবার যোগ্যতা লাভ করে তাহলে স্বর্গ প্রাপ্তি সুনিশ্চিত। এখানে এ-ও উল্লেখ্য, কলিকালে শ্রীকৃষ্ণের অনেক নিন্দা হবে (ঐ, ১/৩৭)। অর্থাৎ তখন মিথ্যা অপবাদ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করা হবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী যে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে তার প্রমাণ ননী মাখন চোর, পরস্ত্রীদের সঙ্গে ব্যভিচারকারী শ্রীকৃষ্ণের লীলার মধ্যে রয়েছে।

বৌদ্ধ ধর্ম

গৌতম বুদ্ধ বলেন, “আমিই এখন সেই মহাবুদ্ধ, কিন্তু আমার পর ‘মণ্ডেয়’

আসবেন। যখন এই সুখময় কালাবর্ত সমাপ্ত হবে। এর পূর্বে যুগের কথা প্রবাহিত হবে (অনাগত ভবিষ্য)। তখন ‘লোভ, শৃঙ্খলা, জ্ঞান, নিদর্শন স্মৃতিচিহ্ন বিলুপ্ত হবে (অনাগত ভবিষ্যত)।’ তাঁর লক্ষণ হলো, তিনি মানবের মধ্যে পুরুষ, সাধু, সৎ গুরুপ্রাপ্ত, সন্যাসী জীবন, পুণ্য প্রিয়, অত্যধিক নম্র অথবা অধিক অগ্নি স্বভাব ও নয়ন (জাতক)। জাতকের অন্যত্র আছে, সকল পুণ্যে তিনি অভিজ্ঞ হবেন, অন্যত্র এক পদে আছে, ‘তিনি যখন মানবের মধ্যে আগমন করবেন তখন তিনি বোবা, কালা, অন্ধ হবেন না।’ অন্যত্র আছে, ‘তিনি নারী নন অথবা নারীত্ব ও পুং স্বভাবের সমাবেশও নন। তিনি নপুংশক শ্রেণিরও নন। এইসব লক্ষণ বুদ্ধের জন্য নির্ধারিত।’

ঐ অনাগত কালের বর্ণনা করতে গিয়ে শাস্ত্র বলেছেন, তখন রাজাগণ অধার্মিক হবে, মানুষ অসৎ পথে বিচরণ করবে, জগতের অধোগতি হবে, অনাবৃষ্টি দেখা দিবে, ফলে দুর্ভিক্ষ হবে, লোকেরা স্বপ্নায়ু হবে, বিচারকগণ লোভী ও অধার্মিক হবে, তারা উভয় পক্ষ হতে উৎকোচ গ্রহণ করবে, রাজ্যে সুখের লেশমাত্র থাকবে না, কুলীনদেরকে তুচ্ছজ্ঞান করা হবে, অকুলীনদেরকে সম্মান দেখানো হবে, পুরুষেরা রিপূর তাড়নায় তরুণী ভাষ্যাদিগের বশীভূত হবে, ভিক্ষুকগণ চীবর লাভ ও অর্থ লালসাবশত ধর্মোপদেশ দান করবে, অধার্মিক ভিক্ষুকদের প্রাধান্য হবে ইত্যাদি (মহাসুপিন জাতক)।

‘জৈনঠাপকান্তনি’ নামক গ্রন্থে আছে যে, শেষ যুগে আগমনকারী বুদ্ধের নাম ‘এমদ’ হবে (সেয়রে ব্রাহ্ম, লক্ষ্মী হতে প্রকাশিত, ২ ও ৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

পার্শ্ব ধর্ম

পার্শ্ব ধর্মগ্রন্থ ‘গাঁথা’-তে আছে, শেষ যুগে এক ত্রাণকর্তার আবির্ভাব হবে। যেন্দাবেস্তা এই ত্রাণকর্তার নাম ‘আহমদ’ বলে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, ‘নইদতি’ ‘আহমদ’ দ্রাগোয়্যাতিম ফ্রাম রায়ামী, স্পীতময়ুরাথাস্ত্রা’ ইত্যাদি। অর্থাৎ, আমি ঘোষণা করছি, হে স্পীতম যুরথাস্ত্র! পবিত্র আহমদ নিশ্চয় আগমন করবেন, যার নিকট হতে তোমরা সৎ চিন্তা, সৎ বাক্য, সৎ কার্য এবং বিশুদ্ধ ধর্ম লাভ করবে। (যেন্দাবেস্তা, ম্যাক্স মূলার কর্তৃক অনুদিত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬০)

সুস্তনামা সাসান পুনজম ৩১ হতে ৩৩ নম্বর শ্লোকে আছে, ‘আরবীয় ধর্মের যখন এক হাজার বছর পূর্ণ হয়ে যাবে তখন মতভেদের তলে এই ধর্ম (অর্থাৎ

ইসলাম) এমনই বিকৃত হয়ে যাবে যে, যদি এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাকে এই ধর্ম দেখানো হয় তাহলে তিনি এটা তাঁর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম বলে চিনতে পারবেন না। আর তোমরা পার্শ্বদের এরূপ অবস্থা দেখবে যে, তাদের নিকট হতে কোনো জ্ঞানমূলক কথা শ্রবণ করবে না। আর যদি কেউ জ্ঞানের কথা বলে তাহলে অন্যেরা তার সঙ্গে ঝগড়া বাঁধিয়ে দিবে। লোকদের এরূপ মন্দকর্মের ফলে কিশাহ অর্থাৎ শাহে বহরম তুল্য এক পবিত্র পুরুষের পারস্যবাসীর মধ্যে আবির্ভাব হবে। যুরথাস্ত্রকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, শাহে বহরমের আগমনের কিছু লক্ষণ বর্ণনা করুন। তখন তিনি বললেন, যখন তোমরা লোককে আকাশে উড়তে দেখবে (অর্থাৎ এরোপ্লেন আবিষ্কৃত হবে) বিনা তেলে প্রদীপ জ্বলতে দেখবে (অর্থাৎ বৈদ্যুতিক শক্তির ফলে বিনা তেলে প্রদীপ জ্বলবে), ঘোড়া ব্যতীত গাড়িসমূহ চলতে দেখবে (যন্ত্রচালিত যানের আবিষ্কারের ফলে এরূপ হবে) তখন জানবে বহরমের আবির্ভাব হয়ে গেছে। তোমরা পাগলের ন্যায় তাকে তালাশ করবে, নিশ্চয় পাবে। (দেখুন, উর্দু ডাইজেস্ট, ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৪ সংখ্যা)

গাঁথা-তে আছে, যুগান্তের চির অন্ধকার হতে, অখাদ্য ও মহাপাপ হতে একমাত্র পুণ্য আত্মাগণই রক্ষা পাবে (য়েছনা)।

খ্রিষ্ট ধর্ম

* মনুষ্যপুত্র মসীহের আগমনকাল সম্বন্ধে যীশু বলেন, “তোমরা যুদ্ধের কথা ও যুদ্ধের জনরব শুনেবে ... জাতির বিপক্ষে জাতি ও রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য দণ্ডায়মান হবে, স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্প হবে। ... হায়! এ সময় গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রীদের সন্তাপ হবে। ... কেননা তৎকালে এরূপ মহাক্রেশ উপস্থিত হবে যে-রূপ জগত সৃষ্টি অবধি এ পর্যন্ত এখনও হয় নাই, কখনও হবেও না” (মথি ২৪:৬-৮ ও ১৯, ২১ পদ)।

* প্রকাশিত বাক্য ১৬:২১ পদে আছে, ‘তখন আকাশ হতে মনুষ্যদের ওপর বৃহৎ বৃহৎ শিলা (অর্থাৎ শিলাসদৃশ বোমা) বর্ষণ হলো’। প্রেরিত ২:১৭, ১৯ পদে আছে, “শেষ কালে এরূপ হবে, এটা ঈশ্বর বলেছেন, আমি ওপরে আকাশে নানা অদ্ভুত লক্ষণ এবং নিচে পৃথিবীতে নানা চিহ্ন, রক্ত, অগ্নি ও ধূমবাস্প দেখাবো (এখানে রক্ত, অগ্নি বলতে যুদ্ধের লক্ষণ এবং ধূম ও বাস্প দ্বারা কলকারখানার কথা বলা হয়েছে)”।

* আরেক স্থানে যীশু বলেন, “আর তিনি মহাধ্বনিসহ আপন দূতগণকে প্রেরণ করবেন, তারা আকাশের এক সীমা হতে অন্য সীমা পর্যন্ত, চারি বায়ু হতে তার মনোনীতদেরকে একত্র করবেন” (মথি ২৪, ৩১)। এই বাক্যে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যীশু বা ঈসা (আ.) নিজের আগমনের কথা বলেন নি বরং তিনি অন্য এক ব্যক্তি যিনি তার অনুরূপ হবেন, তার আগমন সংবাদ দিয়েছেন, কেননা এখানে তিনি ‘আমি প্রেরণ করব’ না বলে ‘তিনি প্রেরণ করবেন’ বলেছেন। অন্য এক স্থানে যীশু বলেছেন “যে দণ্ড তোমরা মনে করবে না, সেই দণ্ডে মনুষ্যপুত্র আসবেন।” (মথি ২৪: ৪৪ ও লুক ১২:৪০)

* খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীরা বর্তমান যুগেই যে প্রতিশ্রুত মসীহ আবির্ভূত হবেন তা বিভিন্ন বইপুস্তকে প্রচার করেছেন। একটি পুস্তকে বলা হয়েছে, যীশু ১৮৭৩ সাল হতে ১৯১৪ সালের মধ্যে অবশ্যই আবির্ভূত হবেন এবং তার মনোনীতদেরকে সংগঠিত করবেন। (Millennial Dwan, ১৮৮৯ সংস্করণ)

* অন্যত্র বলা হয়েছে, Jesus Christ would return during year from March 21, 1843 to March 21, 1844 (Religion in the United States, by Benson Y. Landis)

শিখ ধর্ম

“পাপসমূহ বিনাশনকো কক্ষি অবতার কারবেংগে তরকশ তুরঙ্গ সুপদ কহকর কার করপান খপাবেংগে” (গ্ৰন্থ সাহেব: ১০)

অর্থাৎ, বহু পাপ বিনাশ করতে আসবেন বলেই তাঁর নাম কক্ষি। তাঁর সঙ্গে জ্ঞানরূপী তরকশ, মনোযোগী অশ্ব, বহু জ্ঞান বুঝাই হাতি এবং সত্যরূপী ক্রাপন থাকবে। গুরু নানক তার এক শিষ্যকে বলেছেন, “হে লালু! শ্রবণ করো সেই বাক্য যা মহান প্রভুর নিকট হতে আমার নিকট অবতীর্ণ হয়েছে, এবং তুমি তা তোমার স্মৃতিতে সযত্নে সংরক্ষণ করো। ভারতবাসীর পাপ এবং মন্দ কর্ম মোঘল নামক এক জাতিকে কাবুলের দিক হতে এখানে আনয়ন করবে। তারা শক্তি প্রয়োগে লোকের নিকট হতে যাকাত আদায় করবে। ধর্ম এবং ধার্মিকতায় তখন বিকার উপস্থিত হবে এবং মিথ্যা ও দুর্নীতির প্রাধান্য লাভ করবে। ব্রাহ্মণ এবং কাজীদেরকে গ্রাহ্য করা হবে না এবং শয়তান বিবাহ

বন্ধনে ভাঙন সৃষ্টি করবে। মানুষ তখন এহেন অবস্থায় পতিত হবে তখন আবার শেষ পর্যন্ত মানুষ খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে এবং মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলি আবার পাঠ করবে। হিন্দুরা বিশেষ করে অস্পৃশ্য শ্রেণির লোকেরা তখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে। নানক এসব ঘটনা মসপুরে (আমিনাবাদ) বর্ণনা করলেন এবং মহান খোদার কীর্তন করে বললেন, অতঃপর এক মহাযুদ্ধ সংঘটিত হবে। যার ফলে বহু রক্তক্ষয় হবে। ভারত ঐ সময় আমার কথা স্মরণ করবে। মোঘলদের শাসন ১৫৭৮ হতে ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হবে। তখন এক ব্যক্তি তাদের (মোঘল) মধ্য হতে আবির্ভূত হবেন, তিনি প্রকৃত সিদ্ধগুরু (মহানবীর) শিষ্য হবেন। সত্য সেই বাক্য যা নানক ঘোষণা করেছেন এবং যা যথাসময়ে পূর্ণতা লাভ করবে”। (গুরু গ্রন্থ সাহেব, রাগ তালংগ, মোহল্লা, ১)

ভাই বালা জনম সখির ২৭২ পৃষ্ঠায় আছে, “প্রহলাদ বলেছেন, (এই মহাপুরুষ) পাঞ্জাব প্রদেশের বাটীলা অঞ্চলে এক জমিদার পরিবারে আবির্ভূত হবেন”।

গুরু গোবিন্দ সিং দশম গ্রন্থে, চব্বিশ অবতার অধ্যায়ে লিখেছেন, “এমন এক সময় উপস্থিত হবে যখন মানুষ খোদাকে ভুলে যাবে। অজ্ঞতা প্রসার লাভ করবে এবং শ্রদ্ধা বিলুপ্ত হবে। পরম প্রভু খোদাকে মানুষ স্মরণ করবে না। যখনই এরূপ সংঘটিত হবে তখন পরম করুণাময় খোদা তাঁর সৃষ্টির প্রতি করুণাবশত এক অবতারকে প্রেরণ করবেন। অর্থাৎ তিনি মাহদী মীরকে প্রেরণ করবেন। তিনি শান্ত প্রকৃতিবিশিষ্ট, পবিত্র ও বিশুদ্ধ আত্মপ্রাপ্ত এবং সৎ ও বলিষ্ঠ মনের অধিকারী হবেন। তিনি সমস্ত রাক্ষস বধ করবেন এবং সকলকে তার ধর্মে দীক্ষিত করবেন। তিনি সমগ্র বিশ্বে খ্যাতি লাভ করবেন এবং পরিণামে সকলেই তার আদর্শকে গ্রহণ করবে। একইভাবে তার সংস্কারকার্য সফলতা লাভ করবে। এরূপে চব্বিশ অবতারের সংখ্যা পূর্ণ হবে”।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা হতে বুঝা যায়, বর্তমান যুগই প্রতিশ্রুত ব্যক্তির আগমনের যুগ। আর হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) ছাড়া অন্য কোনো দাবিকারকও প্রতিশ্রুত ব্যক্তি হবার দাবি করেন নি। বিভিন্ন ধর্মে প্রতিশ্রুত ব্যক্তির যে-সকল লক্ষণাবলি বর্ণনা করা হয়েছে তা হতে

সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কাদিয়ানের মির্যা গোলাম আহমদ-ই প্রতিশ্রুত মসীহ, ইমাম মাহদী এবং কব্বি অবতার।

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব

মুসলমান মাত্রই জানা থাকার কথা, হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহ তা’লা প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এ উম্মতের জন্য এমন মহাপুরুষকে আবির্ভূত করবেন, যিনি তাদের জন্য ধর্মকে সঞ্জীবিত করবেন।” (আবু দাউদ, মিশকাত)

সহীহ হাদীসে আরো বলা হয়েছে, “যে ব্যক্তি যুগ ইমামের হাতে বয়আত না করেই মৃত্যুবরণ করেছে সে জাহালতের বা অজ্ঞতার মৃত্যুবরণ করেছে।” (মুসলিম)

এই একটি মাত্র হাদীসই যে-কোনো ধর্মভীরু ব্যক্তির হৃদয়কে যুগ ইমামের অনুসন্ধানে ধাবিত করতে যথেষ্ট, কেননা জাহালতের মৃত্যু এমন এক দুর্ভাগ্যের সমষ্টি যে, কোনো প্রকারের অকল্যাণ ও অমঙ্গলই এর বাইরে নয়। অতএব, নবী করীম (সা.)-এর এই বাণী অনুযায়ী প্রত্যেক সত্যান্বেষীর প্রকৃত ইমামের অনুসন্ধানে তৎপর থাকা আবশ্যিক।

আসুন এবার জেনে নেয়া যাক, মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী কারা উম্মতে মুসলেমার সংশোধনকল্পে যুগে যুগে এসেছিলেন।

উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মুজাদ্দিদগণের নাম:

নং.	নাম	আবির্ভাবের হিজরী শতাব্দী
১.	হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয (রহ.)	২য়
২.	হযরত ইমাম শাফেয়ী ও হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)	৩য়
৩.	হযরত ইমাম আবু শরাহ ও হযরত আবুল হাসান আশআরী (রহ.)	৪র্থ

নং.	নাম	আবিভাবের হিজরী শতাব্দী
৪.	হযরত আবু ওবায়দুল্লাহ নিশাপুরী ও হযরত কাযী আবু বকর বাকলানী (রহ.)	৫ম
৫.	হযরত ইমাম আবু হামেদ আল-গাযযালী ও হযরত সৈয়্যদ আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.)	৬ষ্ঠ
৬.	হযরত ইমাম ইবনে তাইমিয়া ও হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি আজমীরী (রহ.)	৭ম
৭.	হযরত হাফিজ ইবনে হাযর আসকালানী ও হযরত সালেহ বিন ওমর (রহ.)	৮ম
৮.	হযরত ইমাম সুইউতি (রহ.)	৯ম
৯.	হযরত ইমাম মুহাম্মদ তাহির গুজরাটি (রহ.)	১০ম
১০.	হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী শেখ আহমদ সারহিন্দী (রহ.)	১১তম
১১.	হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহ.)	১২তম
১২.	হযরত সৈয়্যদ আহমদ বেরেলবী (রহ.)	১৩তম

* নবাব সিদ্দীক হাসান খাঁ কর্তৃক ১২৯১ হিজরী সনে রচিত ‘হুজাজুল কিরামা ফী আসারিল কিয়ামাহ’ পুস্তকে বলা হয়েছে, “হিজরী চৌদ্দ শতাব্দী গুরু হতে আর দশ দিন বাকি আছে, যদি এর মাঝে মাহদী ও ঈসা আবির্ভূত হন তবে তিনিই চৌদ্দ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হবেন।” (হুজাজুল কিরামা, পৃ. ১৩৯, প্রকাশনা ১২৯১ হিজরী)

* ‘আঞ্জুমানে তাইদুল ইসলাম’ পত্রিকার এপ্রিল, ১৯২০ সংখ্যায় লিখেছে, “হাদীসগুলোতে মরিয়ম ও ইবনে মরিয়ম সম্বন্ধে এসেছে যে, তিনি শতাব্দীর শিরোভাগে আসবেন এবং চৌদ্দ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হবেন।”

* ‘আহলে হাদীস’ পত্রিকা ২৬ জানুয়ারি ১৯১২ সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় লিখেছে, “খাজা সাহেব (হাসান নিজামী) লিখেছেন, ইসলামী দুনিয়া ভ্রমণে যত নেতা এবং আলেমগণের সঙ্গে সাক্ষাত হয়েছে আমি তাদেরকে ইমাম মাহদীর অপেক্ষায় রত দেখেছি। শেখ সান্নোরী (রহ.) সাহেবের এক নায়েবের সঙ্গে

সাক্ষাত হয়েছে, তিনি এতটুকু পর্যন্ত বলেছেন যে, ১৩৩০ হিজরীতে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী আবির্ভূত হয়ে যাবেন।”

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে একমাত্র হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) মুজাদ্দিদ হবার দাবি করেন। উক্ত শতাব্দীতে অন্য কেউ মুজাদ্দিদ হবার দাবি করেন নি। হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর যিনি মুজাদ্দিদ তিনিই প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)। বস্তুত তাঁর মাধ্যমেই সূরা আন-নূরের ৫৬ নম্বর আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ইসলামে পুনরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের মাপকাঠিতে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা

কোন ব্যক্তি যদি নিজেকে নবী দাবি করে কিংবা আল্লাহ তা'লার পক্ষ হতে প্রত্যাদিষ্ট দাবি করে তবে তার সত্যতা প্রমাণের জন্য সর্বপ্রথম আমাদেরকে পবিত্র কুরআন যে মানদণ্ড নির্ধারণ করে দিয়েছেন তার নিরিখে যাচাই করতে হবে। কুরআনের যে-সব মানদণ্ড রয়েছে তা এখন আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

মিথ্যা নবী দাবিকারকের পরিণামে ধ্বংস অনিবার্য

আল্লাহ তা'লা কুরআন করীমে বলেন—

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ۝ لَا خَظْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۝
ثُمَّ لَنَقْطَعَنَّ مِنْهُ الْوَتِينَ ۝

অর্থ: আর সে যদি কোনো মামুলি কথাকেও মিথ্যা বানিয়ে আমাদের প্রতি আরোপ করত, তাহলে নিশ্চয় আমরা তাকে ডান হাতে ধরতাম এবং আমরা অবশ্যই তার জীবনশিরা কেটে দিতাম। (সূরা আল-হাক্বা: ৪৫-৪৭)

কুরআন করীমের উপরোক্ত আয়াতের আলোকে আমাদের দাবি হচ্ছে—

(১) দুনিয়া সৃষ্টি হতে আজ পর্যন্ত কোনো মিথ্যা নবী দাবিকারক বা মিথ্যা ইলহাম দাবিকারক দাবির পর ২৩ বছর বেঁচে থাকার সুযোগ পায় নি, কেননা যদি কোনো ব্যক্তি ইলহাম বানিয়ে খোদার প্রতি আরোপ করে তবে তাকে

ধ্বংস করা হয়। আর যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (সা.) সত্যতার মাপকাঠি, তিনি তাঁর ওহী প্রাপ্তির দাবির পর ২৩ বছর জীবিত ছিলেন। সুতরাং কোনো মিথ্যা নবী দাবিকারক তত বছর জীবিত থাকতে পারে না যত বছর হুযূর (সা.) জীবিত ছিলেন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) তাঁর লিখিত পুস্তক ‘আরবাইন’-এ কোনো মিথ্যা নবী দাবিকারকের এত বছর বেঁচে থাকার প্রমাণদানকারীকে ৫০০ রুপি পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা করেন। তওরাতের মাঝেও বলা হয়েছে যে, মিথ্যা নবী দাবিকারককে ধ্বংস করা হয়েছে।

(২) ‘শরহে আকায়েদে নাফসি’-এর মাঝে আরো বলা হয়েছে যে, ২৩ বছরের মেয়াদ এজন্য বলা হয়েছে যে, হুযূর (সা.) চল্লিশ বছর বয়সে নবী হবার পর ২৩ বছর জীবিত ছিলেন এবং ৬৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। (মিনহাজুন নবুয়ত, পৃ. ৪৪৪)

(৩) মিথ্যা নবী দাবিকারকদের নাম ও তাদের অবস্থা :

- (ক) ইয়ামেনের আসওয়াদ
- (খ) ইয়ামামার মুসায়লামা
- (গ) বনী আসাদে তোলায়হা বিন খোয়াইলেদ
- (ঘ) বনী আকফানের সাজাহ বিনতে হারেস
- (ঙ) বনী তাগলবের হুজাইল বিন ইমরান
- (চ) নামেরের আকাবা বিন হেলাল
- (ছ) শিবানের সলীল বিন কায়েস
- (জ) জেয়াদ ইবনে বেলাল প্রমুখ।

এদের সবাই ধ্বংস হয়েছে এবং এদের নাম ও নিশানা পৃথিবী হতে মিটে গেছে। (ইবনে খলদুন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫)

হযরত আকদাস মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ১৮৮২ সালে মামুরিয়াত লাভ করেন। তাঁর ওপর যে ইলহাম নাযিল হয় তা হচ্ছে, “ইন্নি উমিরতু ওয়া আনা আউয়ালুল মু‘মিনীন”। এর পর হতে তার ওপর ক্রমাগত ওহী-ইলহাম, কাশফ নাযিল হতে থাকে। যার আলোকে তিনি অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করেন। যার অনেকগুলো তাঁর জীবদ্দশায় পূর্ণতা লাভ করে এবং বাকিগুলো তাঁর মৃত্যুর

পর হতে আজ অবধি বিভিন্ন সময় পূর্ণতা পাচ্ছে। তার ইলহাম পাবার দাবির ২৬ বছর পর ১৯০৮ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সুতরাং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাপকাঠি অনুযায়ী সুস্পষ্টভাবে হযরত মির্যা সাহেবের এবং তাঁর দাবির সত্যতা প্রমাণিত হয়।

দাবিকারকের দাবির পূর্বের জীবন

কুরআন করীমের সূরা ইউনুসে বর্ণিত আছে—

فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

অর্থ: “নিশ্চয় আমি তোমাদের মাঝে ইতিপূর্বে এক সুদীর্ঘ জীবনযাপন করেছি, তবুও কি তোমরা বিবেক বুদ্ধি খাটাবে না?” (সূরা ইউনুস: ১৭)

উক্ত আয়াতে হযরত রসূলে করীম (সা.) তাঁর বিরুদ্ধবাদীদেরকে স্বীয় সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ তাঁর দাবির পূর্বকার পবিত্র জীবনকে পেশ করেছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) উক্ত আয়াতের মাধ্যমে ঘোষণা করেছেন, “আমি যদি পূর্বে মিথ্যা বলতাম তবে আজও মিথ্যা বলছি। কিন্তু যদি আমার ৪০ বছরের জীবন পবিত্র এবং সত্যের ওপর হয়ে থাকে তবে নিশ্চয় আমার ইলহাম ও নবুয়তের দাবি সত্য।”

হযরত কুতুবুল আওলিয়া আবু ইসহাক ইবরাহীম বিন শহরয়ের (রহ.) বলেন, “যে ব্যক্তি যৌবনে আল্লাহ তা’লার অনুগত হয়, বৃদ্ধ বয়সেও সে আল্লাহ তা’লার অনুগত হয়।” (তায়কেরাতুল আওলিয়া)

হযরত দাতা গনজ বখশ (রহ.) বলেন, রসূলে করীম (সা.)-এর ওপর যতদিন পর্যন্ত খোদার অস্তিত্ব প্রকাশ করা হয় নি এবং রিসালাতের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় নি এবং ওহী নাযিল হয় নি, ততদিন পর্যন্ত লোকেরা তাকে সং সত্যবাদী বলেই জানত। কিন্তু যখনই খোদাপ্রদত্ত দায়িত্ব পালনে অগ্রগামী হতে লাগলেন তখনই লোকেরা তার পবিত্র চরিত্রের ওপর কালিমা লাগাতে লাগল। কেউ কেউ তাকে গনক কবি বলতে লাগল। কেউ কেউ তাকে পাগল আবার কেউ কেউ মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করল। এরকম আপবাদ হুযূর (সা.)-কে দিতে থাকল। (কাশফ আল হজুজ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৫-৬৬)

হাদীস শরীফে এসেছে, কুরাইশদের পক্ষ হতে আবু লাহাব রসূলে করীম

(সা.)-কে সম্বোধন করে তাঁর দাবির পূর্ববর্তী জীবন সম্বন্ধে সাক্ষ্যদান করে বলেছিল: “মা জাররাবনা আলাইকা ইল্লা সিদকান”।

অর্থ: “আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, আপনি সর্বদা সত্য কথা বলেছেন।”
(বুখারী, মুসলিম)

কিন্তু যখন মহানবী (সা.) নিজের দাবি উপস্থাপন করলেন তখন ঐ সত্যায়নকারীরাই মানতে অস্বীকার করল এবং বলতে লাগল, “তিনি (সা.) শুধু জাদুকরই নন বরং (নাউযুবিল্লাহ) মিথ্যাবাদীও। (সূরা আস-সাদ: ৭)

সুতরাং প্রমাণিত হলো, নবীদের দাবির পূর্বের জীবন বন্ধু ও শত্রুদের দৃষ্টিতে পবিত্র হয়ে থাকে যদিও দাবির পরও তাদের জীবন পবিত্র হয়ে থাকে। নবুয়তের দাবির কারণে লোকেরা তাঁর শত্রুতে পরিণত হয় এবং তার ওপর বিভিন্ন প্রকার অপবাদ দিতে থাকে।

ইমাম মাহদী (আ.) যেহেতু হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর প্রতিনিধি এবং আল্লাহ তা’লার প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ, তাই তাঁর দাবির পূর্বকার জীবন পবিত্র হওয়া দরকার এবং আবু লাহাব প্রমুখের ন্যায় তাঁর শত্রুদের রায়ও তাঁর পক্ষে থাকা দরকার। নতুবা কুরআন করীমের মাপকাঠিতে তাঁর দাবি টিকে থাকতে পারে না। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) সম্বন্ধে তাঁর ঘোরতর বিরুদ্ধবাদী আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের নেতা মৌলবি মুহাম্মদ হোসেন বাটালবী সাহেবের মন্তব্য হতে পাঠক সহজেই বুঝতে পারবেন যে, হযরত আহমদ (আ.)-এর জীবন কত পবিত্র ছিল! তিনি বলেন,

(১) “বারাহীনে আহমদীয়া” গ্রন্থের প্রণেতা মির্যা সাহেবের জীবন ও অবস্থা সম্বন্ধে আমি যতদূর জানি, সমসাময়িক লোকের মধ্যে খুব অল্প লোকই তা জানেন। মির্যা সাহেব ও আমি একই এলাকার অধিবাসী।... এখন আমি বারাহীনে আহমদীয়া সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে ও আড়ম্বরহীন ভাষায় মন্তব্য প্রকাশ করছি। আমার মতে, এই গ্রন্থ বর্তমান যুগের অবস্থা অনুসারে এমন এক গ্রন্থ যে, এটির সমতুল্য গ্রন্থ ইসলামে আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি। এর প্রণেতা ইসলামের সেবায় ব্যক্তিগত ও আর্থিক ত্যাগের এবং শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের দিক দিয়ে লেখনী ও বক্তৃতায় এমন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত যে, এর তুলনা পূর্ববর্তী মুসলমানদের মধ্যে অতি বিরল। (ইশা’আতুস সুন্নাহ, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা)

(২) বারাহীনে আহমদীয়ার প্রণেতা বিরুদ্ধবাদী এবং সমর্থনকারী উভয় পক্ষের অভিজ্ঞতা এবং জানামতে মুহাম্মদীয়া শরীয়তে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা, পরহেযগার এবং মুভাক্কী ”। (ইশা’আতুস সুন্নাহ, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা)

এছাড়া হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) স্বয়ং বিরুদ্ধবাদীদেরকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছেন, “এখন দেখো! খোদা স্বীয় হুজ্জত তোমাদের ওপর এভাবে পূর্ণ করে দিয়েছেন যে, আমার দাবির অনুকূলে হাজার হাজার দলিলপ্রমাণ সৃষ্টি করে তোমাদের এই সুযোগ দেয়া হয়েছে যাতে তোমরা চিন্তা করো, যে ব্যক্তি তোমাদের এই জামা’তের দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন, তিনি কোন পর্যায়ের তত্ত্বজ্ঞানী এবং কি পরিমাণ যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করছেন? তোমরা আমার পূর্বের জীবনের ওপর কোনো দোষারোপ করতে কিংবা মিথ্যা বা প্রতারণার অভিযোগ আনতে পারবে না, যাতে তোমরা এ ধারণা করতে পারো, যে ব্যক্তি পূর্ব হতেই মিথ্যা ও প্রতারণায় অভ্যস্ত, এটিও সে মিথ্যা বলছে। তোমাদের মধ্যে কে আছে যে আমার জীবনীতে কোনো দোষ বের করতে পারে?” (তায়কেরাতুশ শাহাদাতাইন, পৃ. ৭৬-৭৭)

আজ পর্যন্ত কেউ এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারে নি। এটি অপ্রতিহতভাবে বিদ্যমান।

সত্য নবীর জামা’তকে উন্নতি দান

আল্লাহ তা’লা তাঁর সত্য নবীগণকে এবং তাদের জামা’তগুলোকে যেভাবে উন্নতি দান করেন এবং সকল প্রকার সফলতা দান করেন সেভাবে কোনো মিথ্যা নবী দাবিকারককে উন্নতি দান করতে পারেন না বরং তাকে সমূলে ধ্বংস করে দেন এবং সকল প্রকার বিপদাপদ ও পরাজয় তাদের গলার মালা হয়ে বুলতে থাকে। কুরআন করীমের বিভিন্ন জায়গায় নবীদের সত্যতার এরূপ দলিল বিদ্যমান রয়েছে। সূরা আল-মায়েদায় বলা হয়েছে—

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

অর্থ: আর যে আল্লাহকে, তাঁর রসূলকে ও মু’মিনদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে (সে জেনে রাখুক) নিশ্চয় আল্লাহর দলই বিজয়ী হবে। (সূরা আল-মায়েদা: ৫৭)

উক্ত আয়াতের বিপরীতে মিথ্যাবাদীদের জামা'ত সম্পর্কে বলা হয়েছে—

كَتَبَ اللَّهُ لَا غَلِبَ لَنَا وَأَوْسُلَىٰ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

অর্থ: আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন, ‘আমি ও আমার রসূলরা অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয় আল্লাহ মহাশক্তিধর ও মহাপরাক্রমশালী। (সূরা আল-মুজাদেলা: ২২)

সুতরাং সত্য নবীর নিশানী এটি হয় যে, তার জামা'ত দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর তার বিপরীতে বিরুদ্ধবাদীদের জামা'ত দিন দিন কমতে থাকে। দাবিকারকের জামা'তের বৃদ্ধি ও উন্নতি এবং বিরুদ্ধবাদীদের জামা'তের অবনতি দাবিকারকের সত্যতার জোরালো প্রমাণ।

আলেমদের চরম বিরোধিতা (ইমাম মাহদীর বিরুদ্ধাচরণ)

সূরা ইয়াসীনে আল্লাহ তা'লা বলেন—

يُخَسِّرُ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝

অর্থ: হায়, আক্ষেপ মানবজাতির জন্য! তাদের কাছে যখনই কোনো রসূল আসে তারা তাকে নিয়ে হাসিবিদ্রূপ করে। (সূরা ইয়াসীন: ৩১)

(ক) আহলে হাদীস ফিরকার বিশিষ্ট নেতা নবাব সিদ্দিক হাসান আলী খাঁ (রহ.) প্রণীত ‘হুজাজুল কিরামা’ গ্রন্থে লিখিত আছে, “যখন ইমাম মাহদী সুন্নত কায়েম করার জন্য ও বিদআত মিটানোর জন্য সংগ্রাম করবেন তখন সমসাময়িক আলেমগণ যারা পূর্বপুরুষ ও পীর-পুরোহিতদের অন্ধ অনুকরণে অভ্যস্ত তারা বলবে, এই ব্যক্তি আমাদের ধর্ম নষ্ট করে ফেলেছে, এই বলে তারা বিরোধিতা করবে এবং চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে কুফর ও গোমরাহীর ফতোয়া দিবে। (হুজাজুল কিরামা ফি আসারিল কিয়ামাহ, পৃ. ২৬২)

(খ) মুজাদ্দিদ আলফে সানী হযরত আহমদ সারহিন্দ (রহ.) তাঁর গ্রন্থ ‘মকতুবা’-এ লিখেন, “মাহদী (আ.) বর্ণিত আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলী বুঝতে না পেরে বাহ্যদর্শী আলেমগণ সেগুলোকে কিতাব ও সুন্নতের বিরুদ্ধে মনে করবে এবং অস্বীকার করবে।” (মকতুবাতে ইমাম রব্বানী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৫)

(গ) হযরত মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবী (রহ.) লিখেন, “যখন ইমাম মাহদী (আ.) আবির্ভূত হবেন, কথিত মোল্লা-মৌলভীরাই তাঁর প্রধান শত্রু হবে, কেননা তারা মনে করবে যে, তাঁকে মানলে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি থাকবে না এবং জনসাধারণ ও তাদের মাঝে কোনো পার্থক্য থাকবে না”। (ফতুহাতে মক্কিয়া, পৃ. ৩৭৩)

(ঘ) মৌলভী মওদুদী সাহেবও ইমাম মাহদী (আ.)-এর বিরোধিতা সম্বন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, “তাঁর নতুনত্বের বিরুদ্ধে মৌলভী ও সূফী সাহেবান হৈ-চৈ শুরু করবেন।” (সীরাতে সারওয়ারে আলম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৭)

(ঙ) এই উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম এবং দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা মোহাম্মদ কাশেম সাহেব নানতুভী (রহ.) লিখে গেছেন, “মাহদী (আ.) যেহেতু সম্পূর্ণ কালামুল্লাহর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন সে কারণে কোটি কোটি লোক মাহদী (আ.)-কে অবজ্ঞার চোখে অমান্য করবে।” (কাসেমুল উলুম, পৃ. ১১৫-১১৬)

(চ) ‘কুতুবে আলম’ আখ্যায়িত আলহাজ্জ মাওলানা শাহ এমদাদুল্লাহ সাহেব মোহাজের মক্কী (রহ.) লিখেছেন, “আমরা সকলেই আখেরী যামানার মাহদীর আগমনের প্রতীক্ষায় আছি। কিন্তু সে যুগ হবে বড়োই পরীক্ষার যুগ। আহলে বাতেনদের এবং শ্যামদেশের আবদালদের মধ্যে প্রথমে প্রায় ৩১৩ জন তার পবিত্র হস্তে বয়আত করবেন আর অধিকাংশ লোক তার অমান্যকারী হয়ে যাবে।” (শামায়েলে এমদাদিয়াত, পৃ. ১০২)

এদিক দিয়ে দেখলেও হযরত আহমদ (আ.) সত্যবাদী বলে প্রমাণিত হন। কারণ তাঁর দাবির সঙ্গে সঙ্গেই আলেমগণ তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ান, কুফরের ফতোয়া দেন, জনগণকে উত্তেজিত করেন এবং আজ সুদীর্ঘ ১৩০ বছরের বেশি সময় পরও বিভিন্ন আকারে তাঁর জামা’তের বিরোধিতা অব্যাহত আছে।

যুগ ইমাম ও অন্যান্য সংস্কারক বনাম সমসাময়িক ওলামা

আমরা বিগত চৌদ্দশ’ বছরের ইসলামের ইতিহাসের দিকে এক ঝলক

তাকালে দেখতে পাই, তাদের সাথে কীরূপ ব্যবহার করা হয়েছে! নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো:

(১) হিজরী প্রথম শতাব্দীতে—

হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.) এবং হযরত হোসেন (রা.)-কে ধর্মদ্রোহী বলা হয়, ধর্মচ্যুত বলা হয়, রাষ্ট্রদ্রোহী ও মুরতাদ বলা হয় এবং তাঁদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

(২) হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে—

* হযরত ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, জুনায়েদ বোগদাদী (রহ.)-কে কাফির ও মুরতাদ আখ্যা দেয়া হয়। তাঁদের ওপরে অকথ্য অত্যাচার করা হয়।

* হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-কে কাফির ও মুরতাদ বলা হয়, তাঁকে জেলে দেয়া হয়, বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়, তাঁর পবিত্র লাশ কবর হতে তুলে ফেলা হয়, তাঁর কবরে একটা কুকুরকে দাফন করা হয় আর সে কবরের ওপরে গণপায়খানা তৈরি করা হয়। নাউযুবিল্লাহ।

(৩) হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে—

* হযরত ইমাম বুখারী (রহ.)-কে তিন হাজার আলেম ও মুফতীর সমবেত সিদ্ধান্ত বা ইজমা অনুযায়ী কাফির ফতোয়া দেওয়া হয়, বুখারা হতে বহিষ্কার করা হয়। তিনি খারতাৎ-এ শোকেদুঃখে অবশেষে আল্লাহর করুণার আশ্রয়ে চলে যান।

* হযরত আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-কে জেলে দেয়া হয়। চারটি ভারী শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয় এবং ঐ সব লোহার শিকলসহ বাগদাদ পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যেতে বাধ্য করা হয়। তাঁকে রমযানের রোযার দিনে প্রচণ্ড রোদের মধ্যে বেদম বেত্রাঘাত করা হয়।

(৪) হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে—

হযরত মনসুর হাল্লাজ (রহ.)-কে কুফরীর ফতোয়া দেয়া হয়, জেলে দেয়া হয় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে কেটে হত্যা করা হয়।

(৫) হিজরী পঞ্চম শতাব্দীতে—

* হযরত ইমাম গাযযালীকে (রহ.) কাফির ও নাস্তিক আখ্যা দেয়া হয়, তাঁর লিখিত গ্রন্থাদি পুড়িয়ে ফেলার হুকুম দেয়া হয়। তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে মৃত্যুর আদেশ জারি করা হয়।

* হযরত ইবনে হাজম (রহ.)-কে স্পেনের গভীর অরণ্যে বনবাসে পাঠিয়ে হত্যা করা হয়।

(৬) হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীতে—

* পীরানে পীর দস্তগীর হযরত আব্দুল কাদের জীলানী (রহ.)-কে আল্লামা আবুল ফারহা আব্দুর রহমান জাওসী-এর নেতৃত্বে সমসাময়িক আলেম ও মুফতীরা ইজমা বা সমবেত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কাফির ও মুরতাদ আখ্যা দেয়।

* বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক ইবনে রুশদকে কাফির ও মুরতাদ আখ্যা দেয়া হয় এবং তাঁর অমূল্য গ্রন্থাদি পুড়িয়ে ফেলা হয়।

* হযরত শায়খুল আকবর মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী (রহ.)-কে সমসাময়িক আলেম ও মুফতীরা ইজমার মাধ্যমে কাফির ও মুরতাদ আখ্যা দেয়।

(৭) হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে—

* হযরত নিযাম উদ্দিন আউলিয়া (রহ.)-কে ধর্মত্যাগী আখ্যা দেয়া হয়।

* ইমাম ইবনে তাইমিয়াকে জেলে দেয়া হয় এবং জেলেই হত্যা করা হয়।

* হযরত শামস-ই-তাবরীজ (রহ.)-কে জীবন্ত অবস্থায় গায়ের চামড়া তুলে ফেলা হয়।

* প্রখ্যাত সুফি কবি মাওলানা জালালুদ্দিন রুমীকে মুরতাদ আখ্যা দেয়া হয়।

(৮) হিজরী অষ্টম শতাব্দীতে—

ইমাম ইবনে কাইয়ুমকে জেলে দেয়া হয়, অত্যাচার-নিপীড়ন করা হয়।

(৯) হিজরী নবম শতাব্দীতে—

মাওলানা আব্দুর রহমান জামী-কে কাফির আখ্যা দেয়া হয়।

(১০) হিজরী দশম শতাব্দীতে—

* মাওলানা আহমদ বিহারী-কে দিল্লীতে হত্যা করা হয়।

* সুফী সাধক বায়েজীদ সারহাদী-কে মুরতাদ বলা হয়, জুলুম করা হয়।

(১১) হিজরী একাদশ শতাব্দীতে—

মুজাদ্দিদ আলফে সানী হযরত সৈয়দ আহমদ সারহিন্দ (রহ.)-কে কুফরী ফতোয়া দেয়া হয়, জেলে দেয়া হয়।

(১২) হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীতে—

* মুজাদ্দিদ শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী (রহ.)-কে ফার্সী ভাষায় কুরআন শরীফের অনুবাদ করার অপরাধে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়। উল্লেখ্য, তিনিই প্রথম কুরআন করীমের অনুবাদ করেন।

* মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাবকে কুফরী ফতোয়া দেয়া হয়। এখনো আলেমদের অনেকেই ওয়াহাবীদেরকে কাফির মনে করেন, যদিও এখন সৌদি ওয়াহাবীদের টাকার বদৌলতে আহমদীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও অত্যাচার-নিপীড়ন করে থাকে।

(১৩) হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীতে—

বিখ্যাত দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানতুভী (রহ.)-কে এই কারণে কাফির আখ্যা দেয়া হয়, তিনি অভিমত দান করেন, হযরত রসূলে আকরাম (সা.)-এর পর তাঁর শরীয়তের পূর্ণ আনুগত্য ও আওতায় কোনো নবীর আগমন হলে হুযূর (সা.)-এর খতমে নবুয়তের কোনো তারতম্য হয় না।

(১৪) হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে—

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-কে তাঁর ‘মসীহ মাহদী’ হবার দাবি ঘোষণার পর কাফির, মুরতাদ, দাজ্জাল ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হয় এবং তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া জামা’তের বিরুদ্ধে নানা প্রকার ফতোয়া দান, জুলুম-নির্যাতন চলে আসছে এবং এখনও চলছে।

হাদীসের আলোকে ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতা

“হযরত সু’বান (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযূর (সা.) বলেছেন, তোমরা যখন কালো পতাকাগুলি খোরাসানের দিক হতে আসতে দেখবে তখন তোমরা তাদের নিকট উপস্থিত হবে, কেননা তাদের মাঝে আল্লাহর খলীফা মাহদী থাকবেন। (আহমদ ও বায়হাকী)

এই হাদীস দ্বারা আহমদীয়া জামা’তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতাই প্রমাণিত হয়। তাঁর উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ হযরত মির্যা হাদী বেগ স্বীয় অনুচরসহ ১৫৩০ সালে খোরাসানের দিক হতে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং পাঞ্জাবে বসতি স্থাপন করেন। তাঁদের বাসস্থানই পরবর্তীতে কাদিয়ান নামে অভিহিত হয়েছে। তার পতাকা কোন বর্ণের ছিল তা সঠিক বলার উপায় নাই কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ নাই যে, তিনি একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন এবং তার সঙ্গে বহু অনুচরও এসেছিল আর দুঃখকষ্ট মাথায় করে তারা নিজ রাজ্য হতে এই ভারতবর্ষে এসেছিলেন। সুতরাং তাদের সঙ্গে কৃষ্ণবর্ণের পতাকা থাকা আদৌ অসম্ভব নয়। কালো পতাকা দ্বারা পরাজিত ও বিপন্ন হবার লক্ষণও বুঝা যেতে পারে। মির্যা হাদী বেগও এই অবস্থায় ভারতে আগমন করেছিলেন।

হাদীসে বর্ণিত আছে, “তোমরা ঐ পতাকার নিকট যাবে এবং তার মধ্যে আল্লাহর খলীফা মাহদীকে পাবে।” আজ আমরা স্বচক্ষে দেখছি যারা ঐ পতাকার নিকট গিয়ে বসতি স্থাপন করেছেন তারাই আল্লাহর খলীফা মাহদীকে পাবার সৌভাগ্য অধিক পরিমাণে লাভ করেছেন। আজ কাদিয়ানই যে প্রকৃত ইসলামের জ্ঞান আহরণ ও বিকিরণের এক প্রবল প্রবাহ সৃষ্টি করেছে তা কারো অবিদিত নাই।

প্রতিশ্রুত চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ

বিভিন্ন ধর্মের গ্রন্থগুলোতে আখেরি যামানায় একজন মহান সংস্কারকের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা বলা হয়েছে। আমাদের নেতা ও প্রভু মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর এক অসাধারণ ভবিষ্যদ্বাণীর কথা বলব যা তাঁর সত্যতা অনুধাবনে একজন সত্যান্বেষীর কাজে আসবে। এ ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ‘তাঁর আবির্ভাবের নিদর্শন হিসাবে রমযান মাসের নির্দিষ্ট দিনে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হবে’।

পবিত্র কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'লা বলেন,

وَحَسَفَ الْقَمَرُ ۖ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ

“এবং চন্দ্রে গ্রহণ লাগবে এবং সূর্য ও চন্দ্র উভয়কে একত্রিত করা হবে।”
(সূরা আল-কিয়ামাহ: ৯-১০)

কুরআনের এই আয়াতগুলোকে ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি বিস্তারিত বর্ণনা দিচ্ছে নিম্নোক্ত হাদীসটি। বরং এভাবে বলা যায়, মহানবী (সা.)-এর নিম্নোক্ত হাদীসের ভিত্তি হচ্ছে আল-কুরআন।

সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস (হাদীস শাস্ত্রবিদ) হযরত আলী বিন উমর আল বাগদাদী আদ দারকুতনি (৯১৮-৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দ বা ৩০৬-৩৮৫ হিজরী) হযরত ইমাম বাকির মুহাম্মদ বিন আলী, পিতা: হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রহ.)-এর বরাতে নিম্নোক্ত হাদীসটি অন্তর্ভুক্ত করেন:

إِنَّ لِمَهْدِيَنَا آيَتَيْنِ لَمْ تَكُونَا مُنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تَنْكَسِفُ الْقَمَرُ
لَأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَتَنْكَسِفُ الشَّمْسُ فِي الْبَصْفِ مِنْهُ وَلَمْ تَكُونَا مُنْذُ
خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

“নিশ্চয় আমাদের মাহদীর সত্যতার এমন দুটি লক্ষণ আছে যা আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি অবধি অন্য কারো সত্যতার নিদর্শনস্বরূপ প্রদর্শিত হয় নি। একই রমযান মাসে (চন্দ্রগ্রহণের) প্রথম রাত্রিতে চন্দ্রগ্রহণ হবে এবং (সূর্যগ্রহণের) মধ্যম তারিখে সূর্যগ্রহণ হবে।” (সুনানে দারকুতনি, কিতাবুল ঈদায়েন, বাব সালাতুল কসুফুল খুসুফ ওয়া হাইতাছমা, পৃ. ১৮৮)

* বাইবেলের নতুন নিয়মে হযরত ঈসা (আ.) তাঁর ২য় আগমনের চিহ্ন হিসাবে বর্ণনা করেন, “সেই সময়কার কষ্টের ঠিক পরেই সূর্য অন্ধকার হবে, চাঁদ আর আলো দিবে না।” (মথি ২৪: ২৯)

* মহাত্মা সুরদাসজী এই ভবিষ্যদ্বাণীটি উল্লেখ করেছেন যে, যখন কল্কি অবতারের আগমন হবে তখন চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হবে। তিনি লিখেন: “চন্দ্রে-সূর্যে গ্রহণ লাগবে এবং ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ও রক্তপাত হবে।”

* শিখদের ধর্মীয় কিতাব শ্রী গুরু গ্রন্থসাহেব-এ আছে, “যখন মহারাজ নিরুল্লহ হিসাবে আগমন করবেন তখন সূর্য ও চন্দ্র তাঁর সাহায্য করবে।”

সংক্ষেপে, অন্যান্য ধর্মের কিতাবগুলোতেও চন্দ্র ও সূর্যের নিদর্শনের কথা বলা হয়েছে।

হাদীসটিতে চাঁদকে ‘কমর’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, ‘হেলাল’ নয়। চান্দমাসের প্রথম, ২য় এবং তৃতীয় রাতের চাঁদকে ‘হেলাল’ বলা হয়। পক্ষান্তরে, চতুর্থ রাত হতে চাঁদকে ‘কমর’ বলে উল্লেখ করা হয়। (আকরাবুল মাওয়ারিদ, ২য় খণ্ড)

এভাবে, হাদীসে ‘কমর’ শব্দের ব্যবহারও এ ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে যে, রমযান মাসের প্রথম রাত বলতে ১৩ রমযান বোঝানো হচ্ছে, ১লা রমযান নয়। ফলে এতে আর কোনো দ্ব্যর্থকতার সুযোগ থাকে না। সৌরজগতের স্বাভাবিক রীতিগুলির মধ্যে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ অন্যতম। প্রাকৃতিক নিয়মধারায় প্রতি বছর চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হয়ে থাকে।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন বলে,

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۝ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا آئِيلُ سَابِقِ الثَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝

(সূরা ইয়াসীন: ৩৯-৪১)

সূর্য এক নির্ধারিত গণ্ডিতে চলছে। এটি মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়-খোদার নির্ধারিত আইন। চাঁদের জন্যও নির্ধারিত গন্তব্যস্থল স্থির করা হয়েছে— যে পথে চলতে চলতে (চন্দ্র) একটি পুরাতন গুরু শাখার ন্যায় হয়ে যায় এবং আবার পূর্বাবস্থায় চন্দ্রের নিকটে ফিরে আসে। সূর্যের সাধ্য নাই যে, সে বৎসর পরিক্রমায় কোনো এক সময় চন্দ্রের নিকট যায়; আর না রাতের (অর্থাৎ চন্দ্রের) সাধ্য আছে দিনকে (অর্থাৎ সূর্যকে) অতিক্রম করার। এরা সবাই নিজ নিজ নির্ধারিত কক্ষপথে সহজভাবে বিচরণ করছে। অতএব চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণও এই নির্ধারিত গণ্ডিতে আবর্তিত হচ্ছে। চাঁদ যখন পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে করতে পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যখানে এসে দাঁড়ায় তখন সূর্যগ্রহণ হয়। পৃথিবী যখন চন্দ্র ও সূর্যের মাঝখানে অবস্থান করে তখন চন্দ্রগ্রহণের কালকে Full Moon এবং সূর্যগ্রহণের কালকে New Moon বলে। গ্রহণের জন্য পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্য এক সমান্তরাল রেখায় আসা জরুরি। চন্দ্র ও পৃথিবী একে অপরকে এবং চন্দ্র ও পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করাকালে প্রায় পাঁচ ডিগ্রি পার্থক্য বজায়

থাকে। তা না হলে প্রতি মাসেই গ্রহণ লাগত। একটি সৌরবছরে সর্বোচ্চ সাতটি গ্রহণ হতে পারে। এর মধ্যে চার অথবা পাঁচটি সূর্যগ্রহণ এবং তিন অথবা দুটি চন্দ্রগ্রহণ হয়ে থাকে। আর কমপক্ষে বছরে দুটি গ্রহণ হতে পারে। চন্দ্রগ্রহণ বহু স্থান থেকে দৃশ্যমান হয়। অপরদিকে সূর্যগ্রহণ অল্পস্থানেই দেখা যায়। বিশেষকরে, সমুদ্র থেকেই সূর্যগ্রহণ সহজে নজরে আসে।

চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ এবং ১৫ তারিখের মধ্যে কোনো এক তারিখে চন্দ্রগ্রহণ এবং ২৭, ২৮, ২৯ তারিখের মধ্যে কোনো এক তারিখে সূর্যগ্রহণ হয়ে থাকে। ‘হুজাজুল কিরামা ফিল আসারিল কিয়ামাহ’ পুস্তকে বলা হয়েছে যে, “জ্যোতিষ শাস্ত্রানুযায়ী ১৩, ১৪, ১৫ এবং ২৭, ২৮, ২৯ চান্দ্র তারিখে যথাক্রমে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়ে থাকে (পৃ. ৩৪৪)। গ্রহণের মধ্যে প্রকারভেদ আছে। কোনো কোনোটি দৃশ্যমান আবার কোনো কোনোটি প্রচ্ছন্ন। প্রফেসর J.A Mitchell তার Eclipses of the Sun পুস্তকে Columbia University Press, New York, 5th Edition 1951, Page 53, সূর্যগ্রহণের চারটি প্রকার বর্ণনা করেছেন। যথা- (১) Partial (২) Annular (৩) Annular Total (৪) Total। পার্শ্বালাে বা আংশিক গ্রহণে সূর্যের কিছু অংশ আবৃত হয়। এনোলার টোটালে ২ ও ৪ বর্ণিত গ্রহণের মিলিত রূপ প্রকাশ পায়। এহেন গ্রহণ খুব কমই হয়ে থাকে। ১৩১১ হিজরীর ২৮ রমযানের গ্রহণ এই প্রকার ছিল।

১৮৯৪ সালের এই গ্রহণদ্বয় কাদিয়ান এবং ভারতের বিভিন্ন অংশে দৃশ্যমান ছিল। দাবিকারক যে অঞ্চলে অবস্থান করছিলেন সে অঞ্চলে এই গ্রহণ সবাই দেখেছে। Prof. Oppolor তার Canon of Eclipses গ্রন্থে নকশার মাধ্যমে এই গ্রহণ দেখা যাবার স্থানগুলি দেখিয়েছেন (Chart No. 148)। ১৮৯৪ সালের নটিকেল আলমানাক (লগুন)-ও ম্যাপ সহযোগে ঐসব স্থান যেখান থেকে এই গ্রহণ দেখা গেছে তা প্রদর্শন করেছে।

ভবিষ্যদ্বাণীতে ছিল- এহেন নিদর্শন আর কোনো প্রেরিত পুরুষের জন্য দেখানো হয় নি। এই নিদর্শন একমাত্র সত্য মাহদীর (আ.) জন্য। মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, “আমাকে এমন নিদর্শন দেয়া হয়েছে যা আদম হতে শুরু করে আজ পর্যন্ত কাউকে দেয়া হয় নি”। (তোহফায়ে গুলড়াভীয়া, পৃ: ৫৪)

এই স্পষ্ট ঐশীনিদর্শন দেখার পর মৌলভী-মাওলানা সাহেবরা তাদের রূপ পরিবর্তন করে নতুন আপত্তি উত্থাপন করলেন। “মির্য়া সাহেব রসূলে করীম

(সা.)-এর অপমান করেছে, কারণ রসূলে করীম (সা.)-এর জন্য চন্দ্র সাক্ষী দিয়েছে। যাকে শাকবুল কমর বলে। আর মির্যা সাহেব বলেন, তার জন্য চন্দ্র ও সূর্য সাক্ষী দিয়েছে”। ধর্মান্ধতা যে মানুষকে অন্ধ করে দেয় তার প্রমাণ হলো এই কথা। বলুন! এই ভবিষ্যদ্বাণী কি মির্যা সাহেবের তৈরি? নাকি এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার জন্য ইংরেজ বৈজ্ঞানিকরা দায়ী? এটি তো সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, খাতামান নাবীয়িন, ইমামুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী।

মহানবী (সা.)-এর গোলাম হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন, “যা কিছু আমার সমর্থনে প্রকাশিত হয়, প্রকৃতপক্ষে তার সবই মহানবী (সা.)-এর মোজেরা” (তাতিম্মা, হকীকাতুল ওহী, পৃ. ৩৫)। এই প্রতিশ্রুত গ্রহণ দ্বারা একদিকে যেমন আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় তেমনি মহানবী (সা.)-এর সত্যতাও এই ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা দিবালাকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই স্পষ্ট এবং দেদীপ্যমান ঐশী চিহ্নটিকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কোনো নাস্তিকও না, কোনো আস্তিক তো নয়ই। তবে মৌলবি সাহেবদের কথা ভিন্ন।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান প্রাক্তন ভি.সি. প্রফেসর শামসুল এক সাক্ষাতকারে বলেছিলেন, “মনে হয় মাদ্রাসা হতে যারা পাশ করে তারা যেন অন্য কোনো গ্রহের জীব।” (সাপ্তাহিক বন্ধু, ১৪ নভেম্বর ১৯৯১)

আমরা এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করতে চাই না। তবে আমাদের গ্রহের বিবেকবান মানুষদের কাছে আমাদের সবিনয় নিবেদন, এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা কি ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতার জন্য যথেষ্ট নয়?

“সাফ দিল কো কাসরাতে এজায কি হাজত নেহী,
এক নিশাঁ কাফি হ্যায় গার দিল মে হো খওফে কিরদিগার”

অর্থ: “অন্তর পরিচ্ছন্ন হলে অধিক নিদর্শনের প্রয়োজন হয় না। খোদাভীতি থাকলে একটিই যথেষ্ট।” (দুররে সামীন)

‘ইয়ানযিলু’ শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য

হাদীসের একটি শব্দ “ইয়ানযিলু” অর্থাৎ তিনি (আ.) অবতীর্ণ হবেন। এই শব্দ দ্বারা মাওলানা সাহেবরা ‘আসমান হতে নেমে আসা’ বুঝাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এটা একটা মারাত্মক ভুল। ‘নায়িল’ শব্দ দ্বারা সবসময়ই ওপর

হতে স্বশরীরে নীচে নামা বুঝায় না। কুরআন মজীদে হযরত রসূলে করীম (সা.) সম্বন্ধে এই ‘নাযিল’ শব্দই ব্যবহার হয়েছে,

قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۝ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ

অর্থ: “নিশ্চয় আল্লাহ তা’লা তোমাদের প্রতি যিকরকারী রসূল পাঠিয়েছেন যিনি তোমাদের কাছে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করেন। (সূরা আত-তালাক: ১১-১২)

কুরআন শরীফে লোহা ও পোশাক সম্বন্ধেও ‘নাযিল’ শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে।

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ

অর্থ: আমি লোহা অবতীর্ণ করেছি। (সূরা আল-হাদীদ: ২৬)

قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا

অর্থ: নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট পোশাক অবতীর্ণ করেছি। (সূরা আল-আ’রাফ: ২৭)

অতএব, ‘নাযিল’ শব্দ দ্বারা আসমান হতে স্বশরীরে নেমে আসা বুঝার কোনো কারণ নাই। উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে অতি পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা’লা হযরত রসূলে করীম (সা.)-কে যেভাবে নাযিল করেছেন তদ্রূপ লোহা এবং পোশাক ইত্যাদি বস্তুসমূহকেও আল্লাহ তা’লা নাযিল করেছেন। কিন্তু সকলেই জানেন এই সকল বস্তু এবং মহানবী (সা.) নিজে আকাশ হতে নেমে আসে নি।

অতএব হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) সম্বন্ধে নাযিল শব্দ দেখলেই আসমান হতে স্বশরীরে নেমে আসা বুঝা মন্তবড়ো ভুল।

হাকামান আদালান

হাদীসের আরেকটি শব্দ “হাকাম”। কুরআন করীমের সূরা আন-নিসা: ৩৬ নম্বর আয়াতের অর্থ মুফরাদাতে রাগেব নামক কুরআন শরীফের আরবী অভিধানে লিখিত আছে,

“কুরআন শরীফের উক্ত আয়াতে যেখানে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া দুই পক্ষ হতে দুই জন সালিশ নিযুক্ত করার আদেশ আছে সেখানে হাকাম-ই যেন স্বামী-

জীকে বিস্তৃত কৈফিয়ত জিজ্ঞাসা না করেই তাঁর নিজেদের জ্ঞানমত স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার মীমাংসা করতে পারেন।”

কুরআন শরীফের এই আয়াতের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া মিটিবার জন্য উভয় পক্ষ হতে যে দুইজন মীমাংসাকারী নিযুক্ত হবার কথা আছে এটা দ্বারা এবং মুফরাদাতে রাগেবের গবেষণা দ্বারা অতি পরিস্কারভাবে প্রতিপন্ন হচ্ছে যে, হাকাম শব্দের অর্থ বাদশাহ নয়, বরং পরস্পরের ঝগড়া মিটিবার মীমাংসাকারী সালিশ। সুতরাং আলোচ্য হাদীসে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) সম্বন্ধে যে হাকাম শব্দ ব্যবহার হয়েছে তা দ্বারা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বাদশাহ হবেন বুঝায় না বরং এটি বুঝাচ্ছে যে, তিনি মুসলমানদের মতানৈক্য দূর করবেন বা মীমাংসা করবেন।

অতএব, তাঁর আগমনের একটি লক্ষণ হলো, যখন মুসলমানদের মধ্যে এবং বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ঘোর মতানৈক্য উপস্থিত হবে। মুসলমানদের মধ্যে মতানৈক্য আমাদের এই বর্তমান যামানায় যে জঘন্য মূর্তি ধারণ করেছে তা দেখে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই বুঝতে পারেন, এই জঘন্য প্রকৃতির ঝগড়ার মীমাংসা করার জন্য আল্লাহর তরফ হতে মীমাংসাকারী মসীহ মাওউদ আসার এটিই নির্ধারিত সময়।

‘হাকাম’ শব্দের অর্থ বাদশাহ মনে করা অজ্ঞতার পরিচায়ক। আর প্রত্যেক নবীই আল্লাহর তরফ হতে ধর্ম সম্বন্ধীয় ঝগড়ার মীমাংসা করতেই এসে থাকেন। মানুষের মধ্যে যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয় তার মীমাংসার জন্যই আল্লাহ তা’লা নবী পাঠিয়ে থাকেন। প্রত্যেক নবী তো আর বাদশাহ হন নি, তাই মসীহ মাওউদ সম্বন্ধে ‘হাকাম’ শব্দ দেখেই বাদশাহ মনে করা মস্তবড়ো অন্যায়।

“ইয়াকসিরুস সালীব” অর্থাৎ তিনি ক্রুশ ধ্বংস করবেন

মসীহ মাওউদ (আ.) ক্রুশ ধ্বংস করবেন এই কথার অর্থ সাধারণ লোকজন মনে করে থাকেন, তিনি ক্রুশগুলো বাহ্যত ভেঙে ফেলবেন। ক্রুশ ভাঙার প্রকৃত অর্থ সাধারণ লোকের মাথায় ঢুকে নি। আল্লামা আইনী, বুখারী শরীফের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, তিনি বলেছেন, মহানবী (সা.) ক্রুশ ধ্বংস করা, খ্রিষ্টান ধর্মকে মিথ্যা বলে প্রচার করা এবং ইসলামী আদেশ জারি করা অর্থে ব্যবহার করেছেন। আমি বলছি, আল্লাহর অনুগ্রহে হাদীসের এই অর্থ উদ্ঘাটিত হয়েছে যে, ক্রুশ ধ্বংস অর্থ খ্রিষ্টান ধর্মের অসত্যতা প্রকাশ করা।

কিন্তু সাধারণ লোক ক্রুশ ভাঙার এই অর্থ গ্রহণ না করে জবরদস্তি করে

পাদ্রীদের গলা হতে আর গীর্জা হতে ধাতব ত্রুশ ভাঙার যে অর্থ করেছেন তা কুরআন করীমের শিক্ষাবিরোধী।

‘ইয়াকতুলুল খিজির’ অর্থাৎ তিনি শূকর হত্যা করবেন

মসীহ মাওউদ (আ.) ‘শূকরগুলি হত্যা করবেন’ এই কথার অর্থ সাধারণ লোকজন মনে করে থাকেন, হযরত ঈসা (আ.) আসমান হতে নেমে এসে জঙ্গলে জঙ্গলে শূকর মারার কাজে লিপ্ত হবেন।

এখন বিবেচনার বিষয় হলো, যে মহান কাজের জন্য আল্লাহর এক প্রিয় নবী আসমান হতে নেমে আসবেন বলে সাধারণ জনগণ আশায় আছেন, এত বড়ো নেকীর কাজ যদি মাওলানা সাহেবরা এখন থেকেই আরম্ভ করে দেন এবং ঈসা (আ.) আসতে আসতে এই কাজের অনেকটা এগিয়ে রাখতে পারেন তাহলে তাঁরা হযরত ঈসা (আ.)-এর বেশি প্রিয় ও সাহায্যকারী হবেন। মাওলানা সাহেবগণ মহানবী (সা.)-এর বাক্যের যে কীরূপ অবমাননা করছেন তা দেখে স্তম্ভিত হতে হয়!

ডোম ও মেথরের শূকর বধ আর একজন আল্লাহর নবীর শূকর বধ এক অর্থে ব্যবহার হয় নি। অন্তত এই মোটা কথাটা মাওলানা সাহেবদের বুঝা উচিত।

আল্লাহ তা’লা তাঁর পবিত্র কালাম কুরআন মজীদে বলেছেন,

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَ مُنْجِبَةً عِنْدَ اللَّهِ ۚ مَنْ لَّعَنَهُ اللَّهُ وَعَظِبَ عَلَيْهِ
وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ

অর্থ: “তুমি বলো আমি এদের চেয়েও নিকৃষ্টতর লোকের কথা তোমাদের কাছে বলব যার ওপর আল্লাহর অভিশাপ ও গজব পড়েছে এবং আল্লাহ তাদেরকে শূকর ও বানর করে দিয়েছেন।” (সূরা আল-মায়দা: ৬১)

ঐশীভাষায় শূকর বধ অর্থ দুষ্ট লোকই হয়ে থাকে। “কিতাবুল ইসারাত” পুস্তকের ২য় খণ্ডের ৩০৩ নম্বর পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, কেউ যদি শূকর বধ করছে স্বপ্নে দেখে তাহলে বুঝায়, সে ব্যক্তি এরকম কোনো দুষ্ট প্রকৃতি বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে বাগড়া করবে যার মধ্যে কোনো মঙ্গল নাই।

“মুস্তাখাবুল কালাম” কিতাবের ১ম খণ্ডের ১৫১ নম্বর পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, “শূকর অর্থ মোটা, অবস্থাসম্পন্ন, বিধর্মী ও দুষ্ট ব্যাবসায়ী, অপবিত্র শক্তিশালী কাফির অথবা প্রতাপশালী খ্রিষ্টান।”

অতএব আলোচ্য হাদীসে বুঝানো হয়েছে, মসীহ মাওউদ (আ.) আবির্ভূত হয়ে শূকর প্রকৃতিবিশিষ্ট কতিপয় দুষ্ট লোকদেরকে নিদর্শনমূলকভাবে হত্যা করবেন।

বস্তুত কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কর্তৃক আল্লাহ তা'লা এরূপ অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন। পাঞ্জাবের আর্যসমাজের পণ্ডিত লেখরাম, পাদ্রী আব্দুল্লাহ আখম, আমেরিকার ডক্টর আলেকজান্ডার ডুই প্রভৃতি দুষ্ট লোকদের হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) মোবাহালা, অর্থাৎ প্রার্থনা যুদ্ধে আহ্বান করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে হত্যা করেছেন। মহানবী (সা.) হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) সম্বন্ধে এরূপ অলৌকিক নিদর্শন সম্বন্ধেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, তিনি শূকর বধ করবেন।

জিযিয়া কর উঠিয়ে দিবেন

হাদীসের আরেকটি বাক্য, ‘তিনি জিযিয়া কর উঠিয়ে দিবেন’। যুদ্ধের জন্য প্রজাদের ওপর যে কর বসানো হয় তাকে জিযিয়া কর বলা হয়। আখেরি যামানায় যখন হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এসে ইসলাম প্রচার করবেন তখন কোনো যুদ্ধ বিগ্রহের দরকার হবে না। যুদ্ধকর, অর্থাৎ জিযিয়া করেরও দরকার হবে না, তাই হাদীসে এসেছে তিনি জিযিয়া কর উঠিয়ে দিবেন।

এই কথাটাই বুখারী শরীফের অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে, তিনি যুদ্ধ উঠিয়ে দিবেন। প্রকৃতপক্ষে, অস্ত্রযুদ্ধ উঠিয়ে দেওয়া আর যুদ্ধের কর উঠিয়ে দেওয়া একই কথা তাই কেউ কেউ রেওয়ায়াত করেছেন। কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) তা-ই করেছেন। বিনা যুদ্ধে দুনিয়া জয় করে সমগ্র মানবজাতিকে ইসলামের পতাকাতলে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের প্রেম-মন্ত্রে দীক্ষিত করার ঘোষণা করেছেন। এর ফলেই আজ দুনিয়ার বড়ো বড়ো কেন্দ্রে তৌহিদের আহ্বান প্রতিধ্বনিত হয়েছে ও হচ্ছে।

বস্তুত হাদীসের এই বাক্যটি দ্বারাও কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এরই সত্যতা প্রতিপন্ন হয়।

বহু সম্পদ দান করবেন কিন্তু কেউই তা গ্রহণ করবে না

“ওহ খাযায়েন জো হাযারোঁ সাল সে মাদফুন থে,
আব ম্যা দেতা হুঁ আগার কোঈ মিলে উমিদওয়ার”

অর্থ: ‘সেই ভাণ্ডার যা হাজার বছর যাবত মাটি চাপা পড়ে ছিল, এখন আমি তা দিচ্ছি যদি নেয়ার আকাজক্ষী কেউ থাকে।’

হাদীসে এসেছে, “তিনি মালের দিকে আহ্বান করবেন, কিন্তু কেউই তা গ্রহণ করবে না।”

কাদিয়ানের হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) “বারাহীনে আহমদীয়া” কিতাব লিখে ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ পেশ করেছেন এবং সমস্ত দুনিয়াবাসীকে তার পেশ করা দলিলগুলো খণ্ডন করতে আহ্বান করে বলেছেন যে, কেউ যদি তার দলিলগুলোর এক পঞ্চমাংশও খণ্ডন করে নিজেদের ধর্মের সত্যতা নিজেদের ধর্মীয় পুস্তক হতে পেশ করতে পারেন তাহলেও এমন ব্যক্তিকে দশ হাজার রূপি পুরস্কার দিবেন অথবা দশ হাজার রূপি মূল্যের পৈত্রিক সম্পত্তির ওপর দখল ছেড়ে দিবেন কিন্তু কেউই তার এই আহ্বান গ্রহণ করে পুরস্কার নিতে অগ্রসর হয় নি। একইভাবে বিরুদ্ধবাদী মৌলবি মাওলানারা যখন তার আরবী ভাষায় কোনো জ্ঞান নাই বলে বিদ্রূপ ও টিটকারি করতে লাগল তখন আল্লাহ তা’লা তাকে অদৃশ্যভাবে আরবী ভাষা ও কুরআন শরীফের মারেফত বা তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিলেন এবং তিনি সমস্ত জগদ্বাসীকে আরবী সাহিত্যে তার মোকাবিলা করতে হাজার হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে আহ্বান করলেন যে, কেউ যদি আরবী সাহিত্যে এবং কুরআন শরীফের তত্ত্বজ্ঞানে তার সমকক্ষতা লাভ করতে পারে তাকে তিনি হাজার হাজার টাকা পুরস্কার দান করবেন। এমনকি এই ঘোষণাবাণীর মর্ম অনুযায়ী তিনি নিজে এই মোকাবিলার জন্য কতিপয় গ্রন্থ প্রণয়ন করে জগতে প্রচার করে দিলেন। আরবী ভাষাভাষী মিশর, ইরাক, হেজাজ ইত্যাদি দেশসমূহের মধ্যে এই সমস্ত গ্রন্থের ঘোষণাবাণী পাঠিয়ে দিলেন কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউই এই পুরস্কার গ্রহণ করতে অগ্রসর হলো না। আবার একটি কিতাবে হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবিত থাকা সম্বন্ধে চ্যালেঞ্জ করে বিশ হাজার রূপি পুরস্কার ঘোষণা করেছেন কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউই এটা গ্রহণ করতে অগ্রসর হলো না।

ফলে এটি প্রতিপন্ন হচ্ছে যে, মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী “তিনি সম্পদের দিকে লোকদেরকে আহ্বান করবেন কিন্তু কেউই এটা গ্রহণ করবে না” পূর্ণ হয়েছে এবং এটা দ্বারা কাদিয়ান পানে আবির্ভূত হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর দাবির সত্যতা প্রতিপন্ন হচ্ছে।

পৃথিবীর সকল বস্তুর চেয়ে একটি সিজদা উৎকৃষ্ট হবে

একটি সিজদা যা দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় ঐশ্বর্য্য হতে উৎকৃষ্ট এবং সবসময়ই উৎকৃষ্ট তা কোনো ঈমানদার মুসলমান অস্বীকার করবে না। যে সিজদা মানুষের সীমাহীন জীবনকে অনন্ত সুখের ও গৌরবের অধিকারী করে দেয়, সেই সিজদার মূল্য যে কত, তার সঙ্গে যে পার্থিব ঐশ্বর্য্যের কোনো তুলনাই হতে পারে না, প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তিই এটা বুঝতে পারেন।

কিন্তু এখানে চিন্তার বিষয় হচ্ছে, আখেরী যামানায় প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর আবির্ভাবের সঙ্গে এই কথার সম্পর্ক কী? মহানবী (সা.)-এর যামানায় বা খুলাফায়ে রাশেদীনের যামানায় কি প্রকৃত সিজদার মূল্য দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় ঐশ্বর্য্য হতে অধিকতর মূল্যবান বা উৎকৃষ্ট ছিল না? নিশ্চয় ছিল। তাহলে এই কথার অর্থ কী?

এটা দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, আল্লাহর প্রকৃত ইবাদত সে সময় দুনিয়া থেকে উঠে যাবে, প্রকৃত সিজদা দুনিয়াতে আর বাকি থাকবে না। মহানবী (সা.) বলেছেন, “মানবের ওপর এমন এক সময় আসবে যখন ইসলামের শুধু নাম ব্যতিরেকে আর কিছুই বাকি থাকবে না, কুরআনের শিক্ষার কতক বাহ্যিক রীতিনীতি ছাড়া আর কিছুই বাকি থাকবে না, মসজিদগুলি খুব আবাদ হবে কিন্তু তাতে প্রকৃত হিদায়াত থাকবে না, তখনকার আলেমগণ আকাশের নীচে সকল প্রাণী হতে নিকৃষ্টতম হবে।”

সুতরাং এরকম যামানাতে যখন মসীহ মাওউদ (আ.) আগমন করে প্রকৃত ইবাদত দুনিয়াতে কায়েম করবেন তখন আবার আল্লাহর প্রতি প্রকৃত সিজদা দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হবে। সেই সিজদার মূল্য দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় ঐশ্বর্য্য হতে অধিক।

ধর্মব্যবসায়ী মোল্লা-মৌলভী ও মুরীদ ব্যবসায়ী পীর-পুরোহিতদের লোক দেখানো ইবাদত দেখে ইবাদতের প্রতি দুনিয়ার যে অভক্তি ও বিতর্কাত্মক সৃষ্টি হবে প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) এসে তা দূর করে দিবেন। ইবাদতের প্রকৃত মূল্য, সিজদার প্রকৃত তাৎপর্য্য মসীহ মাওউদ (আ.) এসে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

বস্ত্ত কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এসে এরূপ করেছেন। যারা সিজদার এই উপলব্ধি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) হতে লাভ করেছেন

তারাই আজ দুনিয়ার যাবতীয় সুখসমৃদ্ধি, ধনসম্পদ ও আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগ করে মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সঙ্গে আল্লাহর প্রকৃত সিজদায় ঝুঁকে পড়ে একটি সিজদায় সারাজীবন অতিবাহিত করে দিতে লুটিয়ে পড়েছেন।

প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীকে পূর্ণ করে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত পুরুষ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) আবিস্থত হলেন।

* তাঁর নাম ‘আহমদ’ (সূরা আস-সাফফ, বুখারী, হুজাজুল কিরামা, কাসিদা নিয়ামত উল্লাহ, যেন্দাবেস্তা)।

* তাঁর নামের এক অংশে ‘গোলাম’ শব্দটিও আছে (বিহারুল আনোয়ার)।

* তিনি পারস্যের রাজবংশীয় লোক অর্থাৎ মির্যা (বুখারী, কিতাবুত তফসীর)।

* তিনি দামেস্কের পূর্বদিকে অবস্থিত ভারতের ‘কারা’ অঞ্চলের কাদিয়ান হতে আগমন করবেন (মুসলিম, এরশাদুল মুসলিমীন, হুজাজুল কিরামা, জাওয়াহেরুল আসরার)।

* তিনি ১২৫০ হিজরীর ১৪ই শাবান বা শাওয়াল শুক্রবার দিন এক ভগ্নিসহ জন্মগ্রহণ করেছেন (আল ইউয়াকিত ওয়াল জাওয়াহের, বিহারুল আনোয়ার, ফুসুসুল হাকাম)।

বাঙালিদের মনস্তৃষ্টি করা হবে

ভাষা মানুষের জন্মগত অধিকার। আল্লাহ তা’লা পবিত্র কুরআনে বলেন,

خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝

(সূরা আর-রহমান: ৪-৫)

অর্থ: তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাকে বাগ্মিতা শিখিয়েছেন।

প্রত্যেক নবী তাঁর জাতির ভাষায় প্রচারকার্য চালিয়ে গেছেন (সূরা ইবরাহীম: ৫)। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-ও মাতৃভাষায় দোয়া করতে এবং খুতবা দিতে নির্দেশ দিয়ে গেছেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, “ ১৯০৬ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি তারিখে বাংলা প্রদেশ সম্পর্কে একটি ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যার শব্দমালা ছিল,

”پہلے بنگالہ کی نسبت جو کچھ علم جاری کیا گیا تھا اب اُن کی دلجوئی ہوگی۔“

অর্থ: ইতঃপূর্বে বাংলা সম্বন্ধে যে-সব আদেশ জারি করা হয়েছিল এখন তাদের মনস্তৃষ্টি করা হবে।” [হাকীকাতুল ওহী, রুহানী খাযায়েন, ২২তম খণ্ড, পৃ. ৩১০]

নানাভাবে এটি পূর্ণ হয়েছে। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন রহিত হয়ে, বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পাবার মাধ্যমে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের মধ্য দিয়েও এটি পূর্ণতা লাভ করেছে। ঐশীবাণীতে বর্ণিত ‘বাঙ্গলা’ শব্দটি কিয়ামতকাল পর্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। এখন আর এটিকে কখনো মুছে ফেলা যাবে না।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মের পরপরই আহমদীয়া জামা’তের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) কয়েকটি নীতিনির্ধারণী বক্তৃতা করেছিলেন, তন্মধ্যে একটিতে তিনি বলেছিলেন, ‘মাতৃভাষায় শিক্ষা দেয়া হোক’ এ সম্বন্ধে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর যেন উর্দুকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে চাপিয়ে দেয়া না হয়, তাহলে কিন্তু এটি পাকিস্তান হতে পৃথক হয়ে যাবে, কেননা ওখানকার অধিবাসীদের বাংলা ভাষার জন্য এক বিশেষ ভালোবাসা রয়েছে [মাওলানা দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ কৃত তারিখে আহমদীয়াত; আল ফযল, ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৪৭ হতে উদ্ধৃত] যুগের মহামানবের এই দূরদর্শিতা ও ভবিষ্যদ্বাণী কীরূপে সত্য হয়েছে তা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে এমন এক সময় এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন যখন এ ব্যাপারে কেউ চিন্তাও করতে পারে নি। ১৯৪৮ সালে কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করলেন, “উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা”। সে হতে শুরু হলো ভাষা আন্দোলন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাঙালির বুকের রক্ত দিয়ে প্রমাণ করল যে, তারা মাতৃভাষাকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসে। এই ভাষা আন্দোলন শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তান পৃথক হয়ে জন্ম নেয় স্বাধীন বাংলাদেশ।

এরকম শত শত নিদর্শন দেখিয়েছেন হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)। ‘হাকীকাতুল ওহী’ পুস্তক পড়লে আপনারা এমন অসংখ্য নিদর্শন সম্পর্কে জানতে পারবেন।

বয়আতের দশটি শর্ত

এ বছরের শেষে অর্থাৎ ১৮৮৯ সনের ১২ জানুয়ারি, ‘ইশতেহার তকমীলে

তবলীগ' নামে বয়আতের দশটি শর্ত সংবলিত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করেন। সে শর্ত মেনে আজও জামা'তে আহমদীয়ায় বয়আত করতে হয়। শর্তগুলি নিম্নরূপ:

(১) বয়আতকারী সর্বান্তঃকরণে এ কথার অঙ্গীকার করবে যে, এখন থেকে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্ক থেকে বিরত থাকবে।

(২) মিথ্যা, ব্যভিচার, কামলোলুপ দৃষ্টি, সকল প্রকার অবাধ্যতা ও পাপাচার, অন্যায়, খিয়ানত এবং নৈরাজ্য ও বিদ্রোহের সকল পথ পরিহার করে চলবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হোক না কেন, এর কাছে পরাভূত হবে না।

(৩) খোদা ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী বিনা ব্যতিক্রমে নিয়মিত পাঁচবেলার নামায পড়বে। আর যথাসাধ্য তাহাজ্জুদ নামায পড়ার ও প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরুদ প্রেরণের এবং প্রত্যহ নিজ পাপসমূহের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা ও এস্তেগফার করার স্থায়ী অভ্যাস করবে। আন্তরিক ভালোবাসার সাথে খোদা তা'লার অনুগ্রহরাজি স্মরণ রেখে তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করাকে দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত করবে।

(৪) প্রবৃত্তির উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে সামগ্রিকভাবে আল্লাহর সৃষ্ট কোনো জীবকে আর বিশেষকরে মুসলমানদেরকে কথায়, কাজে অথবা অন্য কোনোভাবে অন্যায় কোনো কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, স্বাচ্ছন্দ্যে-কাঠিন্যে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তা'লার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সর্বাবস্থায় ও সর্ব পরিস্থিতিতে ঐশী সিদ্ধান্ত সম্ভটচিন্তে মেনে নিবে। তাঁর পথে সকল প্রকার লাজ্জনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে। কোনো বিপদ এসে উপস্থিত হলে তাঁর প্রতি বিমুখ হবে না বরং সম্মুখপানে এগিয়ে যাবে।

(৬) সামাজিক কদাচার ও কুপ্রবৃত্তির দাসত্ব পরিহার করবে। কুরআনের অনুশাসন শতভাগ শিরোধার্য করবে এবং আল্লাহ ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশনাবলীকে নিজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কর্মপন্থা হিসাবে অবলম্বন করবে।

(৭) অহংকার ও দম্ব সর্বতোভাবে পরিহার করবে। নম্রতা, বিনয়, সদাচরণ, সহনশীলতা ও দীনতার সাথে জীবনযাপন করবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধনপ্রাণ, মানসম্ভ্রম, সন্তানসন্ততি ও সকল প্রিয়জন হতে প্রিয়তর জ্ঞান করবে।

(৯) কেবল আল্লাহ তা'লার সম্ভৃষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট সকল জীবের সেবায় রত থাকবে এবং খোদাপ্রদত্ত নিজ শক্তি ও সম্পদ ব্যয়ে মানবজাতির যথাসাধ্য হিতসাধন করবে।

(১০) শুধুমাত্র আল্লাহর সম্ভৃষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে মা'রুফ বা ধর্মানুমোদিত সকল আজ্ঞা পালন করার প্রতিজ্ঞায় এই অধর্মের সাথে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আমৃত্যু এতে অটল থাকবে। আর এই ভ্রাতৃত্ববন্ধনে এমন মহান পর্যায়ে উপনীত থাকবে যার দৃষ্টান্ত জাগতিক কোনো সম্পর্ক ও বন্ধনে এবং তাবৎ সেবকসুলভ অবস্থার মাঝে খুঁজে পাওয়া যাবে না। (ইশতেহার তকমীলে তবলীগ, ১২ জানুয়ারি, ১৮৮৯)

উদাত্ত আহ্বান

প্রত্যেক ভাষায় দূরকম বর্ণনারীতি অনুসৃত হয়েছে—

(১) স্ক্রাসরি বা সুস্পষ্ট বর্ণনা।

(২) ক্রিপক বর্ণনারীতি।

এগুলো অস্বীকার করলে কোনো ভাষাই পরিপূর্ণ ভাষা হিসাবে পরিগণিত হতে পারে না। আরবী ভাষা হলো, ‘উম্মুল লিসান’ বা ‘ভাষার জননী’। সুতরাং এ ভাষায় উচ্চাঙ্গীন রূপকের ব্যবহার থাকাটাই স্বাভাবিক। এখন প্রশ্ন হলো, মৌলবিদের মধ্যে অনেকেই রূপকের ব্যাখ্যা করতে দ্বিধা করেন কেন? এই বিষয়টির অন্তরালে ধর্মীয় বড়ো বড়ো প্রশ্নের সহজ এবং সরল সদুত্তর রয়েছে।

সত্য উদ্ঘাটনের রীতির কথা বলতে গিয়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, “সত্য যদি উদ্ঘাটন করতে হয়, সত্য অবগত হতে হয় তাহলে নামাযে আল্লাহ তা'লার কাছে দোয়া করো যেন আল্লাহ তোমাদের সামনে সত্য স্পষ্ট করেন। আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, যদি মানুষ বিদ্বেষ এবং হঠকারিতা মুক্ত হয়ে সত্য প্রকাশিত হবার জন্য আল্লাহর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে তাহলে ৪০ দিন অতিবাহিত হবার পূর্বেই তার সামনে সত্য স্পষ্ট হয়ে যাবে। যদি নিরপেক্ষ হৃদয়ে সত্য লাভের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করো কিন্তু খুব কম মানুষই এমন আছে যারা এসব শর্ত সাপেক্ষে আল্লাহর কাছে সিদ্ধান্ত চায়

আর এভাবে নিজেদের বুদ্ধির ঘাটতি বা বিদ্বেষ ও হঠকারিতার কারণে আল্লাহর ওলীকে অস্বীকার করে নিজেদের ঈমান ধ্বংস করে। যদি আল্লাহর ওলীতে ঈমান না থাকে তাহলে ওলী যিনি নবুয়তের জন্য কিলকস্বরূপ এমন ব্যক্তিকে নবুয়ত অস্বীকার করতে হয় আর নবীকে অস্বীকার করা খোদাকে অস্বীকারের নামান্তর। এভাবে ঈমান সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে যায়, ধ্বংস হয়ে যায়।”

যুক্তরাষ্ট্রের ‘ক্যাপিটল হিল’-এ গত ২৭ জুন ২০১১ তারিখে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের বর্তমান নেতা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) বর্তমান যুগের জটিল সমস্যাবলীর সমাধানের লক্ষ্যে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যুদ্ধ প্রতিহত করার পথ ও পন্থা সংবলিত একটি ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছেন। উক্ত ভাষণ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে সম্প্রচার করা হয়েছে এবং তা অব্যাহত রয়েছে। ভাষণটির একাংশে তিনি (আই.) বলেন, “আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত সম্পূর্ণভাবে একটি ধর্মীয় সংগঠন। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস হলো, যে মসীহ এবং সংস্কারকের এ যুগে আবির্ভাবের ও বিশ্বকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায় আলোকিত করার কথা ছিল, তিনি সত্যিই এসে গেছেন। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের জামা’তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা কাদিয়ান নিবাসী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-ই হলেন সেই প্রতিশ্রুত মসীহ ও সংস্কারক। আর এ কারণে আমরা তাঁকে গ্রহণ করেছি। আমরা তাঁর শিক্ষার আলোকে পবিত্র কুরআনের অনুশাসন মেনে চলি, আর ইসলামের সেই প্রকৃত ও খাঁটি শিক্ষার প্রচার করি যার ভিত্তি হলো পবিত্র কুরআন।”

অন্য একটি ভাষণে তিনি (আই.) বলেন, “আমি আল্লাহর ইচ্ছায় বিশ্বের সকল প্রান্তে শান্তি, সহিষ্ণুতা, ন্যায়বিচার এবং সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠায় আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য চালিয়ে যেতে থাকব।” (দশম বার্ষিক শান্তি সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণের বরাতে)

বিগত এপ্রিল ২০১৩ সনে তিনি স্পেনে একটি মসজিদের উদ্বোধনী ভাষণের একাংশে বলেন, “আজ আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত বিশ্বের দুই শতাধিক দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা যেদিকে যাই সেখানেই এই বাণী প্রচার করি, Love for all, Hatred for none অর্থাৎ ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয় কারো পরে”।

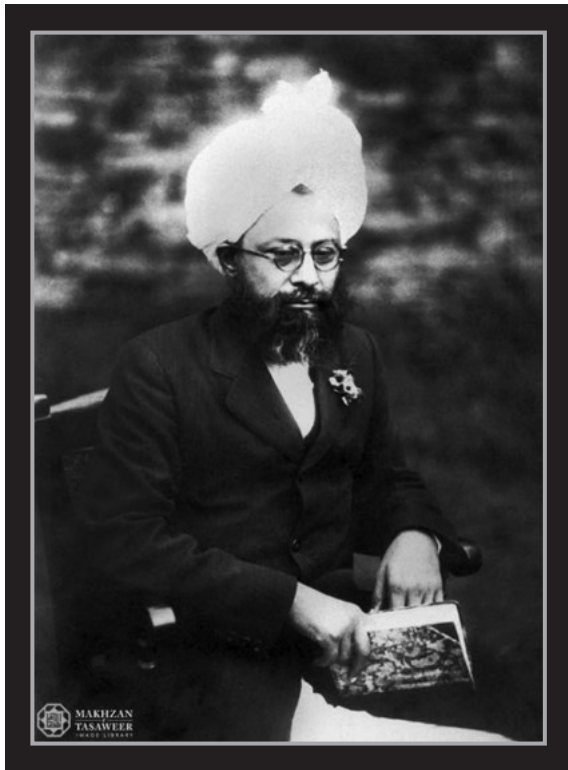
সুখী পাঠক! খোদা তা'লার চিরন্তন বিধান অনুযায়ী উগ্র মৌলবাদীদের পক্ষ থেকে এই ঐশী জামা'তের প্রচণ্ড বিরোধিতা পূর্বেও হয়েছে এবং বর্তমানেও চলছে। আপনাদের কাছে বিনীত আবেদন, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা যাচাই করে তাঁর হাতে বয়আত গ্রহণ করুন, কেননা হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, “তোমরা যখন তাঁকে দেখতে পাবে তাঁর হাতে বয়আত করো, বরফের ওপর হামাণ্ডি দিয়েও যদি যেতে হয়, নিশ্চয় তিনি আল্লাহর খলীফা আল-মাহদী।” (সুনানে ইবনে মাজা, বাবু খুরুজুল মাহদী)

আর হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা প্রমাণের একটি সহজ পদ্ধতি তিনি নিজেই বলে দিয়েছেন। তিনি (আ.) বলেন, “আমার কাছে হাজার হাজার প্রমাণ আছে, কিন্তু এতে যদি তোমরা সম্মত হতে না পারো, তবে আমার কথা গ্রহণ করো না, আমার বিরোধীদের কথাও গ্রহণ করো না; খোদা তা'লার কাছে যাও এবং জিজ্ঞাসা করো, আমি সত্যবাদী কি-না। খোদা তা'লা যদি বলে দেন, আমি মিথ্যাবাদী, তবে নিশ্চয় আমি মিথ্যাবাদী। কিন্তু যদি খোদা তা'লা জানিয়ে দেন, আমি সত্যবাদী তবে আমার সত্যতা গ্রহণ করতে তোমার আপত্তি কেন?” (মাকতুবাতে আহমদ, ৫ম খণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়, পৃ. ৫)

অতএব, মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ বিপদাবলী, বাইরের বিপদাবলী এবং বর্তমান যুগের ভয়াবহ বিশ্ব-পরিস্থিতি থেকে মানবজাতিকে উদ্ধারকল্পে জন্য ঐশী প্রতিশ্রুত ব্যবস্থা আছে কি-না, সেটাও একবার ভেবে দেখা প্রয়োজন। তাই এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মাধ্যমে ঐশী প্রতিশ্রুত পথের খোঁজ করে সেই পথের কার্যকারিতাকে পরীক্ষা করে দেখার জন্য বিশ্বের সচেতন বিবেকের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।



২০ ফেব্রুয়ারি: মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস



প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর দ্বিতীয় খলীফা হযরত আলহাজ্জ মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) ১২ জানুয়ারি ১৮৮৯ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম এবং জীবন প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর একটি ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতার স্বাক্ষর বহন করে। উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে এই প্রতিশ্রুত সন্তানের বায়ান্নটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ ছিল। তাঁর রচিত কুরআন শরীফের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সংবলিত ‘তফসীরে সগীর’ ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা সংবলিত ‘তফসীরে কবীর’ তাঁর অম্লান স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

তিনি ১৯৩৪ সালে তাহরীকে জাদীদ স্কীম আরম্ভ করে সমগ্র বিশ্বে আহমদীয়া মসজিদ ও ইসলাম প্রচারকেন্দ্র স্থাপনের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখেন। তিনি এই জামা'তের কয়েকটি অঙ্গসংগঠন প্রতিষ্ঠা করে জামা'তকে সাংগঠনিকভাবে অনেক বেশি বলিষ্ঠ ও সুসংহত করেন। তাঁর খিলাফতকালে এই ঐশী জামা'ত বিশ্বের ৭৫টি দেশে বিস্তৃতি লাভ করে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর দ্বিতীয় খলীফা তাঁর ৫১ বছর দীর্ঘ ঐতিহাসিক ও কল্যাণময় খিলাফতকাল অতিবাহিত করে ৮ নভেম্বর ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের রাবওয়ায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।



মুসলেহ মাওউদ (রা.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পটভূমি

আল্লাহর পক্ষ থেকে আগমনকারী নবী-রসূল অথবা মহামানবরা যখন জগদ্বাসীকে এক আল্লাহর দিকে আহ্বান করেন তখন তাঁরা নিজ সত্যতার স্বপক্ষে জগদ্বাসীকে নিদর্শনও দেখিয়ে থাকেন। তেমনি এ যুগে আগমনকারী মহামানব তথা হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-ও তার নেতা এবং মনিব মহানবী (সা.)-এর কল্যাণে অজস্র নিদর্শন লাভ করেছেন। এবিষয়ে তিনি (আ.) তাঁর লিখিত বিভিন্ন পুস্তকাদির মাঝে বিশেষভাবে ‘হাকীকাতুল ওহী’ পুস্তকে তুলে ধরেছেন। এসব নিদর্শনের মাঝে প্রতিশ্রুত পুত্রসন্তান সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। পণ্ডিত লেখরাম, ইন্দ্রমোহন সহ বিভিন্ন বিরুদ্ধবাদীরা যখন তাঁর কাছে নিদর্শন দাবি করে, তখন তিনি দোয়া করে এর উত্তর দিবেন বলে জানান। এরপর চল্লিশ দিনের জন্য তিনি হুশিয়ারপুরে এক নিভৃত কক্ষে ধ্যানমগ্ন হন। তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে এক মহান পুত্রসন্তান লাভের সুসংবাদপ্রাপ্ত হন যা তিনি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিদর্শন প্রত্যাশীদেরকে জানিয়ে দেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে না জেনে কোনো ব্যক্তির পক্ষে এমন ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব কি? কেননা প্রত্যেক ব্যক্তির জানা আছে, জীবনের কোনো ভরসা নাই এমনকি এক মিনিট পর কেউ বেঁচে থাকবে, তা-ও বলা দুষ্কর। সেখানে মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীই প্রমাণ করে যে, এই নিদর্শন আল্লাহ প্রদত্ত নিদর্শন।

১৯৪৪ সনে মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, “আজ এই ভবিষ্যদ্বাণীর ৫৯তম বছর আরম্ভ হচ্ছে। আজ থেকে পুরো ৫৮ বছর পূর্বে আজকের এই দিনে অর্থাৎ ১৮৮৬ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি এই হুশিয়ারপুর শহরে (এই বক্তব্য তিনি হুশিয়ারপুরে প্রদান করেছেন) এবং এই বাড়িতে যা এখন আমার সামনে রয়েছে, (যেখানে তিনি বক্তৃতা করছিলেন সে মাঠের সামনেই বাড়িটি ছিল।) এমন এক বাড়ি যা তখন ‘তাবেলা’ হিসাবে পরিচিত ছিল, অর্থাৎ তা বসতবাড়ি ছিল না বরং এক ধনাঢ্য ব্যক্তির অতিরিক্ত বাড়িগুলোর একটি, যাতে প্রয়োজনে কোনো অতিথি অবস্থান করত অথবা সেখানে তারা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র স্টোর করার ব্যবস্থা রেখেছিল বা ঘটনাক্রমে হয়তোবা পশু রাখার জন্যও ব্যবহার করা হতো। কাদিয়ানের এক অপরিচিত ব্যক্তি, যাকে স্বয়ং কাদিয়ানের

বাসিন্দারাও ভালোভাবে চিনত না, ইসলাম এবং ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা (সা.)-এর প্রতি মানুষের বিরোধিতা দেখে, নিভূতে নিজ প্রভুর ইবাদত করতে এবং তাঁর সাহায্য ও সমর্থন যাচনা করার জন্য সে ব্যক্তি সেখানে আসেন আর চল্লিশ দিন পর্যন্ত জনমানব হতে বিচ্ছিন্ন থেকে নিজ প্রভুর কাছে দোয়া করতে থাকেন। চল্লিশ দিন দোয়ার পর খোদা তা'লা তাকে একটি নিদর্শন প্রদান করেন। সেই নিদর্শন হলো, আমি তোমাকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি কেবল পূর্ণই করব না, তোমার নাম শুধু পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তেই পৌঁছাবো না বরং এই প্রতিশ্রুতিকে আরও মহিমার সাথে পূর্ণ করার জন্য আমি তোমাকে এমন এক পুত্রসন্তান দান করব, যে অসাধারণ গুণাবলীর ধারক হবে। ইসলামকে সে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাবে। খোদা তা'লার বাণীর তত্ত্ব সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করবে। রহমত এবং কল্যাণের নিদর্শন হবে আর ধর্মীয় এবং পার্থিব জ্ঞান, যা ইসলাম প্রচারের জন্য আবশ্যিক তা তাকে প্রদান করা হবে। একইভাবে আল্লাহ তা'লা তাকে দীর্ঘায়ু দান করবেন যতক্ষণ না সে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে সুখ্যাতি লাভ করে।” (দাওয়া মুসলেহ মাওউদ কে মুতায়াল্লেখ পুর শওকত এলান, আনোয়ারুল উলুম, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ১৪৬-১৪৭)

১৮৮৫ সনে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) ঘোষণা দিলেন যে, যুক্তিপ্রমাণ যথেষ্ট দেয়া হয়েছে কিন্তু কেউ উত্তর দিচ্ছেন না। এবার তিনি ঐশীনিদর্শন প্রদর্শন করবেন। বিশ হাজার বিজ্ঞাপন উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করে সারা পৃথিবীর সকল ধর্মীয় নেতাদের উদ্দেশ্যে প্রচার করলেন যে, তিনি ঐশীনিদর্শন প্রদর্শন করবেন। অতঃপর কাদিয়ানে বসবাসকারী হিন্দু ধর্মের একদল লোক হযরত মির্যা সাহেবের খেদমতে লিখিত আবেদন করলেন, আপনি সারা পৃথিবীর মানুষকে নিদর্শন দেখাতে চাচ্ছেন। আমরা আপনার সাথেই বসবাস করি আমাদেরকে নিদর্শন দেখান।

হযরত মির্যা সাহেব তাদের আবেদন পেয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ তা'লা তাকে বললেন, “তেরী উক্বদাহ কুশাঈ হুশিয়ারপুর মেঁ হোগী।” অর্থ: ‘তুমি হুশিয়ারপুর যাও, সেখানে তোমার উদ্দেশ্য সফল হবে’।

হযরত মির্যা সাহেব ২২ জানুয়ারি ১৮৮৬ সনে হুশিয়ারপুর গেলেন। হুশিয়ারপুরে একটি নির্জন বাগানবাড়িতে তিনি অবস্থান গ্রহণ করলেন। চল্লিশ দিনের জন্য তিনি ঐ বাড়ির দোতলায় নিজেকে আবদ্ধ রেখে দোয়ায় রত

হলেন। চল্লিশ দিন কারো সাথে সাক্ষাত করলেন না, কথা বললেন না। শুধু দোয়াতে রত থাকলেন।

চল্লিশ দিন পর চিল্লা শেষ করে বেরিয়ে আসলেন এবং ঘোষণা দিলেন, আল্লাহ তা'লা আমার দোয়া শুনেছেন এবং উত্তরে আমাকে বলেছেন, আমাকে নিদর্শনস্বরূপ একজন পুত্রসন্তান দেয়া হবে যার দ্বারা পৃথিবীতে ইসলামের সত্যতা প্রচার করা হবে। আর এই প্রতিশ্রুতি (মুসলেহ মাওউদ-প্রতিশ্রুতি সংস্কারক) পুত্র সম্পর্কে ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬ তারিখে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করলেন। এই বিজ্ঞাপনে তিনি লিখলেন: “আল্লাহ তা'লা আমাকে এক প্রতিশ্রুতি পুত্রের সুসংবাদ দিয়েছেন।”

উপরোক্ত বিজ্ঞাপনে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর সম্মানিত স্ত্রী হযরত সৈয়দা নুসরত জাহান বেগম সাহেবা ১২ জানুয়ারি ১৮৮৯ মোতাবেক ৯ জমাদীউল উলা ১৩০৬ হিজরী রোজ শনিবার দিবাগত রাত পৌনে এগারটার সময় একটি পুত্রসন্তান জন্ম দেন। হযরত মির্যা সাহেবের নিজ গৃহ দারুল মসীহ কাদিয়ানে এই ছেলে জন্মগ্রহণ করেন। এ ছেলের নাম রাখা হয় মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ।

মুসলেহ মাওউদ কে?

আপত্তি ছিল যে, ‘আপনি মুসলেহ মাওউদ নন বরং পরবর্তীতে তিন-চারশ বছর অথবা এক-শো বা দু-শো বছর পর কোনো এক সময় মুসলেহ মাওউদ জন্মগ্রহণ করবেন’। এর উত্তর প্রদান করে হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) বলেন, “অনেকে বলে, মুসলেহ মাওউদ হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বংশধর থেকে পরবর্তী কোনো প্রজন্মে তিন-চারশ বছর পর জন্মগ্রহণ করবে; বর্তমান যুগে তার আগমন হতে পারে না। কিন্তু তাদের কেউ কী খোদা তা'লাকে ভয় করে না? কমপক্ষে ভবিষ্যদ্বাণীর বাক্যগুলো দেখে নেয়া উচিত, সেগুলো নিয়ে ভাবা উচিত। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) লিখেছেন, ইসলামের বিরুদ্ধে এখন আপত্তি করা হয়, ইসলাম নিজের মাঝে নিদর্শন প্রদর্শনের কোনো বৈশিষ্ট্য রাখে না। যেমন পণ্ডিত লেখরাম আপত্তি করছিল, ইসলাম যদি সত্য ধর্ম হয়ে থাকে তবে নিদর্শন দেখানো উচিত। ইন্দ্র মোহন আপত্তি করেছিল, ইসলাম সত্য ধর্ম হয়ে থাকলে নিদর্শন দেখানো

হোক। তিনি (আ.) তখন খোদা তা'লার দরবারে সেজদাবনত হন আর বলেন, হে খোদা! তুমি এমন নিদর্শন প্রদর্শন করো যা এসব নিদর্শন প্রত্যাশীদের ইসলামের মাহাত্ম্য স্বীকারে বাধ্য করে। অতএব এমন নিদর্শন প্রদর্শন করার কথা বলা হয়েছে, যা ইন্দ্র মোহন মুরাদাবাদী প্রমুখকে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব মানতে বাধ্য করবে। এসব আপত্তিকারী আমাদের বলে, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) যখন আল্লাহ তা'লার কাছে দোয়া করলেন, তখন খোদা তা'লা নাকি তাঁকে সংবাদ দিয়ে বলেছেন, আজ থেকে তিন শত বছর পর আমরা তোমাকে এমন এক পুত্রসন্তান দান করব যে ইসলামের সত্যতার নিদর্শন হবে। জগতে কি এমন কোনো ব্যক্তি আছে, যে এই কথাকে যুক্তিযুক্ত আখ্যা দিবে? এটি তো হলো এমন কথা যেমন কোনো ব্যক্তি প্রচণ্ড পিপাসার্ত হয়ে কারো দ্বারে গিয়ে বলে, ভাই আমার খুবই তেষ্টা পেয়েছে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে পানি পান করাও আর সে প্রত্যুত্তরে বলে, ভাই আপনি চিন্তা করবেন না। আমি আমেরিকায় চিঠি লিখেছি। সেখান থেকে এ বছরেরই শেষের দিকে উন্নত মানের নির্যাস আসবে আর পরের বছরেই আপনাকে শরবত বানিয়ে পান করানো হবে। কোনো বন্ধ পাগলও এমন কথা বলতে পারে না। আর পুরোপুরি কোনো উম্মাদও খোদা এবং তাঁর রসূলের প্রতি এমন কথা আরোপ করতে পারে না।

পণ্ডিত লেখরাম, মুন্সি ইন্দ্র মোহন মুরাদাবাদী এবং কাদিয়ানের হিন্দুরা বলছে, ইসলাম সম্পর্কে দাবি করা হয়, এর খোদা জগদ্বাসীকে নিদর্শন দেখানোর ক্ষমতা রাখেন, এটি একটি মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন দাবি। যদি এ দাবির কোনো সত্যতা থেকে থাকে তবে আমাদের নিদর্শন দেখানো হোক। তখন হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আল্লাহ তা'লার দরবারে সেজদাবনত হন আর বলেন, হে খোদা! আমি তোমার সমীপে প্রার্থনা করছি, তুমি আমাকে তোমার রহমতের নিদর্শন দেখাও, তোমার শক্তিমত্তার এবং নৈকট্যের নিদর্শন দান করো। অতএব উল্লিখিত সব নিদর্শন প্রার্থীর জীবদ্দশাকালে নিকটবর্তী কোনো সময়েই সেসব নিদর্শন প্রকাশিত হওয়া উচিত আর কার্যত হয়েছেও তাই। আল্লাহ তা'লার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ১৮৮৯ সনে যখন আমার জন্ম হয় তখন তারা জীবিত ছিল, যারা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর কাছে নিদর্শন দেখতে চেয়েছিল। আর আমার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তা'লার নিদর্শনাবলীও ক্রমবর্ধিতহারে অবিরাম ধারায় প্রকাশ পেতে থাকে।” (মঁয়্যা হি

মুসলেহ মাওউদ কি পেশগোয়ী কা মিসদাক হুঁ, আনোয়ারুল উলূম, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ২২২-২২৩)

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) সাহেব ১৪ মার্চ ১৯১৪ সনে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা (হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী) নির্বাচিত হন। ১৯৪৪ সনে হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) খলীফাতুল মসীহ সানী নিজেকে 'আল-মুসলেহ আল-মাওউদ' বলে ঘোষণা দেন। অর্থাৎ হুশিয়ারপুরের চল্লিশ দিনের দোয়ার জবাবে আল্লাহ তা'লা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-কে যে পুত্রের শুভসংবাদ দিয়েছিলেন, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬ তারিখের বিজ্ঞাপনে যার উল্লেখ আছে এবং ১ ডিসেম্বর ১৮৮৮ তারিখের সবুজ ইশতেহারে যার উল্লেখ আছে, তিনিই সেই সুযোগ্য সন্তান।

এ সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেন, “সবুজ ইশতেহারে (১ ডিসেম্বর ১৮৮৮) যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, এতে কোনো সন্দেহ নাই যে, সেখানে আমারই সম্পর্কে বলা হয়েছিল।” (আল-ফযল, ২৩ মার্চ ১৯৪০)

তারপর ৫-৬ জানুয়ারির মধ্য রাতে ১৯৪৪ সালে হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) আল্লাহর তরফ হতে ঐশীবাণী (ইলহাম) প্রাপ্ত হলেন, ‘আনাল মসীহুল মাওউদু মাসিলুহু ওয়া খালীফাতুহু’ (অর্থ) ‘আমি মসীহ মাওউদ (অর্থাৎ) তাঁর প্রতিচ্ছবি এবং তাঁর খলীফা’। অর্থাৎ তিনিই সেই প্রতিশ্রুত পুত্র মুসলেহ মাওউদ। এ বিষয়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) ২৮ জানুয়ারি ১৯৪৪ শুক্রবার মসজিদ আকসা কাদিয়ানে জুমুআর খুতবায় বিশদ ব্যাখ্যা দেন’। (তারীখে আহমদীয়াত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪৯১)

হাদীসসমূহে ‘মুসলেহ মাওউদ’-এর সংবাদ

রসূলে করীম (সা.)-ও ‘মুসলেহ মাওউদ’-এর সংবাদ দিয়েছেন এবং তাঁর আবির্ভাব মসীহ মাওউদ-এর যুগেই হবে বলে জানিয়েছেন। তিনি (সা.) বলেন- ‘ইয়াতাযাওওয়াজু ওয়া ইউলাদু লাহ’। [মিশকাত, কিতাবুল ফিতান, বাব নুযুলে জিসা]

অর্থ: ‘মসীহ মাওউদ বিয়ে করবে এবং তাঁর ঘরে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে।’ এখন এর অর্থ তো এ হতে পারে না যে, মসীহ মাওউদ-এর ঘরে এমনই সাধারণ সন্তান জন্মগ্রহণ করবে যে-রূপ অন্য লোকদের ঘরে জন্মগ্রহণ করে, কেননা যদি এর অর্থ এই দাঁড়ায় তবে এর প্রতি সেই আপত্তি আরোপিত হবে যা অআহমদীরা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি করত যে, ‘সন্তান জন্মগ্রহণ করা এমন কী বড়ো বিষয়! পৃথিবীতে প্রত্যেকের ঘরেই সন্তান জন্মগ্রহণ করে থাকে’ আর আমরা স্বীকার করি, শুধু যদি এই সংবাদ দেয়া হয় যে, এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করবে তবে এটাকে কোনো বিশেষ ভবিষ্যদ্বাণী বলা যায় না। অনুরূপভাবে যখন রসূলে করীম (সা.) একথা বলেছেন, মসীহ মাওউদ-এর ঘরে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, তাহলে তো এর এই অর্থ হতে পারে না যে, তাঁর ঘরে সাধারণ সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, কেননা যদি এরূপ হতো তবে রসূলে করীম (সা.)-এর বিশেষভাবে এই সংবাদ দেয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তিনি (সা.)-এর সংবাদ প্রদান করা এই কথাই বর্ণনা করে যে, রসূলে করীম (সা.)-এর ইচ্ছা এই ছিল যে, তাঁর ঘরে বিশেষ সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, আর তেমনই পূর্ণতাপ্রাপ্ত ও গুণসম্পন্ন হবে যেভাবে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) সংবাদ দিয়েছেন।

অতঃপর রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, ‘লাও কানাল ঈমানু ইনদাস সুরাইয়া লানালাহু রিজালুন মিন হাউলায়ে’। [মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, খণ্ড: ২, পৃ. ৪১৭, মাতবুয়াহ বৈরুত, ১৯৭৮]

বুখারী কিতাবুত তাফসীরেও এই হাদীস রয়েছে এবং সেখানে বাক্য এরূপ- ‘লাও কানাল ঈমানু ইনদাস সুরাইয়া লানালাহু রিজালুন আও রাজুলুন মিন হাউলায়ে’। [বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, তাফসীর সুরাতুল জুমুআ]

অর্থাৎ যদি ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রেও পৌঁছে যায় তবে পারস্য বংশোদ্ভূত কিছু লোক এমন হবেন যারা তাকে ভূপৃষ্ঠে ফিরিয়ে আনবেন। শুধুমাত্র মসীহ মাওউদ সম্পর্কেই রসূলে করীম (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেন নি; বরং হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এবং তাঁর (আ.) বংশের অপরাপর কিছু লোক সম্পর্কেও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এবং বলেছেন, তাঁরা সকলে মিলে সুরাইয়া নক্ষত্র থেকে ঈমান ফিরিয়ে আনবেন।

ہآرررر مسیہ ماوؤد (آا.) کررررر ررررر

‘موسلہہ ماوؤد’ سآررررر ررررررررر

”آدائے رحیم و کریم بزرگ و برتر نے جو ہر چیز پر قادر ہے (جَلَّ شَانُهُ وَ عَزَّ اِسْمُهُ) مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بہ پایہ قبولیت جگہ دی اور تیرے سفر کو (جو ہوشیار پور اور لودھیانہ کا سفر ہے) تیرے لئے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے۔ فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر تجھ پر سلام! آدائے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجے سے نجات پاویں اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں۔ اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو اور تاحق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آجائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے۔ اور تالوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں جو چاہتا ہوں سو کرتا ہوں۔ اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور تا انہیں جو آدائے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور آدائے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔

سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیہ اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا۔ ایک زکی غلام (لڑکا) تجھے ملے گا۔ وہ لڑکا تیرے ہی ختم سے تیری ہی ذریت و نسل ہو گا۔ خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے۔ اس کا نام عنوا نیل اور بشیر بھی ہے۔ اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ جس سے پاک ہے۔ اور وہ نور اللہ ہے۔ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے۔ اُس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ وہ صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہو گا۔ وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمۃ اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تجید سے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذہین و فہیم ہو گا۔ اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پُر کیا جائے گا۔ اور وہ تین کو چار کرنے والا ہو گا (اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے)۔ دو شنبہ ہے مبارک دو شنبہ۔ فرزند دلبند گرامی ارجمند مَظْهَرُ الْاَوَّلِ وَالْاٰخِرِ۔ مَظْهَرُ الْحَقِّ وَ الْغُلَاءِ کَانَ اللّٰهُ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ۔ جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہو گا۔ نور آتا ہے نور جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے مسح کیا۔ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہو گا۔ وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہو گا۔ اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا۔ اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب وہ اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ وَ کَانَ اَمْرًا مَّقْضٰیًا۔

অনুবাদ

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, “পরম দয়ালু ও করুণাময়, সুমহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বশক্তিমান খোদা (যিনি মহামর্যাদাবান ও গৌরবময় নামের অধিকারী) আমাকে সম্বোধন করে নিজ ইলহামে বলেছেন, ‘আমার সমীপে তোমার প্রার্থনা অনুযায়ী তোমাকে আমি দয়ার একটি নিদর্শন দিচ্ছি। আমি তোমার কাকুতিমিনতি শুনেছি এবং তোমার সকল দোয়াকে নিজ কৃপাশ্রমে গ্রহণ করেছি আর তোমার (হুশিয়ারপুর ও লুথিয়ানার) সফরকে তোমার জন্য কল্যাণময় করেছি। অতএব শক্তি, দয়া এবং নৈকট্যের নিদর্শন তোমাকে দেয়া হচ্ছে। কৃপা ও অনুগ্রহের নিদর্শন তোমাকে প্রদান করা হচ্ছে। বিজয় ও সাফল্যের চাবি তুমি পেতে যাচ্ছ। হে বিজয়ী! তোমার প্রতি সালাম। খোদা এ কথা বলেছেন, যেন জীবন প্রত্যাশীরা মৃত্যুর কবল থেকে মুক্তি লাভ করে। যারা কবরে চাপা পড়ে আছে তারা বেরিয়ে আসে, যেন ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আল্লাহর বাণীর মর্যাদা মানবজাতির সামনে প্রকাশিত হয়, সত্য স্বীয় কল্যাণরাজিসহ উপস্থিত হয়, মিথ্যা তার যাবতীয় অকল্যাণসহ পলায়ন করে এবং মানুষ যেন বুঝতে পারে, আমিই সর্বশক্তিমান, যা চাই তা-ই করে থাকি। আর তারা যেন নিশ্চিতভাবে জেনে নেয়, আমি তোমার সঙ্গে আছি। যারা খোদার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী, খোদা ও তাঁর ধর্ম এবং তাঁর কিতাব ও পবিত্র রসূল মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-কে অস্বীকার করে এবং অসত্য বলে মনে করে— তারা যেন একটি স্পষ্ট নিদর্শন লাভ করে এবং অপরাধীদের পথ চিহ্নিত হয়ে যায়।

অতএব তোমার জন্য সুসংবাদ! এক সুদর্শন ও পবিত্র পুত্রসন্তান তোমাকে দেয়া হবে। তুমি এক মেধাবী পুত্র লাভ করবে। সেই ছেলে তোমারই ঔরসজাত হবে। সুদর্শন পবিত্র পুত্র তোমার অতিথি হয়ে আসছে। তার নাম হবে আনমোয়াইল ও বশীর। তাকে পবিত্রাত্মা দেয়া হয়েছে এবং সে পঙ্কিলতামুক্ত আর আল্লাহর জ্যোতি। কল্যাণময় সে— যে উর্ধ্বলোক থেকে আসে। তাঁর সঙ্গে ফযল থাকবে— যা তার আগমনের সাথে আসবে। সে প্রতাপের অধিকারী, ঐশ্বর্যশালী ও সম্পদশালী হবে। সে পৃথিবীতে আসবে এবং তার নিরাময়ী বৈশিষ্ট্য ও পবিত্র আত্মার কল্যাণে অনেককে ব্যাধিমুক্ত করবে। সে খোদার এক নিদর্শন— কারণ তাঁর করুণা ও প্রবল মর্যাদাবোধ তাকে মর্যাদার নিদর্শন হিসাবে পাঠিয়েছে। সে অত্যন্ত ধীমান, প্রজ্ঞাবান ও

কোমলমতি হবে আর বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তাকে সমৃদ্ধ করা হবে। সে তিনকে চার করবে (এর অর্থ বুঝতে পারি নি)। সোমবার, শুভ সোমবার। ন্নেহাস্পদ ও সম্মানিত প্রিয় পুত্র। অনাদি ও অনন্ত সত্তার এবং সত্য ও মাহাত্ম্যের বিকাশস্থল, যেন আল্লাহ স্বয়ং উর্ধ্বলোক থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন। যার আগমন অত্যন্ত কল্যাণময় এবং ঐশীপ্রতাপ প্রকাশের কারণ হবে। জ্যোতি আসছে, জ্যোতি! খোদা তাকে তাঁর সম্ভূষ্টির সৌরভে সিক্ত করেছেন। আমরা তার মধ্যে আপন পবিত্র আত্মা ফুঁকে দিব এবং খোদার ছায়া তার শিরে বিরাজমান থাকবে। সে তাড়াতাড়ি বড়ো হবে, বন্দিদের মুক্তির কারণ হবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে সুখ্যাতি লাভ করবে। জাতিসমূহ তার মাধ্যমে আশিসমণ্ডিত হবে। এরপর সে তার আত্মিক উন্নতির পরম মার্গে উত্তোলিত হবে। ওয়া কানা আমরা মাকযিয়া (তথা এটি একটি অবধারিত বিষয়)’।” [২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বঙ্গানুবাদ]

হুশিয়ারপুরের অবস্থা

“এই দোয়া ও ইস্তিখারার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে সংবাদ দেয়া হয় যে, “তুমি হুশিয়ারপুরে চিল্লা করো”। সে সময় মৌলবী আব্দুল্লাহ সান্নোরা সাহেব তাঁর শিষ্য ছিলেন। তিনি যখন জানতে পারলেন যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) চল্লিশ দিনের জন্য বিশেষ দোয়া করতে যাচ্ছেন, তখন তিনি তাঁর (আ.) সমীপে আবেদন করেন, যখন আপনি চিল্লা করবেন তখন আমাকে অবগত করবেন যে, কোথায় চিল্লা করা হবে, যেন আমিও সেবায়ত্ত ও পুণ্য লাভ করতে পারি। তিনি সে সময় পাটিয়ালাতে পাটোয়ারী (হিসাবরক্ষক) ছিলেন। যখন হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) অবগত হন, খোদা তা’লা হুশিয়ারপুরে চিল্লা করাকে পছন্দ করেছেন তখন তিনি মৌলবী আব্দুল্লাহ সান্নোরা সাহেবকে লিখেন, “আমি চিল্লা করার জন্য হুশিয়ারপুর যাচ্ছি। আপনিও শীঘ্রই এসে যান, যেন আমরা কাদিয়ান হতে এক সঙ্গে রওয়ানা হতে পারি।” অতএব মৌলবী আব্দুল্লাহ সান্নোরা সাহেব কাদিয়ান পৌঁছে যান এবং তিনি (আ.) ২১ জানুয়ারি, ১৮৮৬ তারিখে হুশিয়ারপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান। তিনি (আ.)-এর সাথে কেবল তিনজন ব্যক্তি ছিলেন।

প্রথমত, মৌলবী আব্দুল্লাহ সান্নোরা সাহেব। দ্বিতীয়ত, হাফেয শেখ হামিদ আলী সাহেব। যিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর অত্যন্ত পুরনো সেবকদের মধ্যে ছিলেন এবং এক দীর্ঘ সময় ধরে তিনি (আ.)-এর সেবা করে

গিয়েছেন। তৃতীয়ত, শেখ খাঁন সাহেব। যিনি রসূলপুর সংলগ্ন টাঙ্গা জেলার হুশিয়ারপুরের এক জমিদার বন্ধু ছিলেন। তিনি (আ.) যাবার পূর্বে হুশিয়ারপুরের জমিদার শেখ মেহের আলী সাহেব, যিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর পরিচিত বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন, উনাকে এক চিঠি লিখেন, আমি সেখানে দুই মাসের জন্য আসতে চাচ্ছি। আপনি আমার জন্য কোনো ঘরের ব্যবস্থা করুন যেখানে অবস্থান করে আমি নিভুতে আল্লাহ তা'লার ইবাদত করতে পারব। তিনি (আ.) এ-ও লিখেছেন, “আমি চাই না যে এ দিনগুলোতে লোকজন আমার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আসুক। আমি শুধু আল্লাহ তা'লার নিকট দোয়া করতে চাই। এজন্য স্থান এমন হওয়া বাঞ্ছনীয় যা শহরের একপ্রান্তে অবস্থিত হবে এবং তা দ্বিতলবিশিষ্ট হবে যেন দোয়া ও আল্লাহ তা'লার প্রতি ধ্যানমগ্ন হতে কোনো ত্রুটি না থেকে যায়। অতএব তিনি নিজের এক অভিজাত বাসস্থান যা কোনো এক সময় ‘তাবেলা’ (ঘোড়ার আস্তাবল) হিসাবে ব্যবহৃত হতো আর এ নামেই প্রসিদ্ধ ছিল, তা খালি করে দেন এবং লিখেন যে, “আমি আপনার জন্য এক বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছি যা শহরের বাইরে অবস্থিত। কিন্তু এতদূরও নয় যে শহর থেকে জিনিপত্র নিয়ে আসতে কষ্টসাধ্য হবে। আপনি যখন আসতে চান আসতে পারেন”। এই সংবাদে প্রেক্ষিতে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ২১ জানুয়ারি, ১৮৮৬ সনে রওয়ানা হন এবং পথিমধ্যে রসূলপুরে এক রাত অবস্থান করে ২২ জানুয়ারি রোজ শুক্রবার সেখানে পৌঁছেন। অতঃপর তিনি (আ.) চল্লিশ দিন পর্যন্ত এই দ্বিতীয় তলায় আল্লাহ তা'লার সমীপে নিরবে-নিভুতে দোয়া করেছেন। এই সময়ে আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে তিনি (আ.)-এর নিকট কিছু মহান বিষয় প্রকাশিত হয় যার ভিত্তিতে ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৬ রোজ শনিবার হুশিয়ারপুরেই তিনি (আ.) একটি ইশতেহার লিখেন এবং তা প্রকাশ করে বিভিন্ন এলাকাতে প্রেরণ করেন।” [‘আল-মাওউদ’, আনোয়ারুল উলুম, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ৫২৫-৫২৬]

ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্য

এটা সেই বিজ্ঞাপন যা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) হুশিয়ারপুরে প্রকাশ করেন। এই বিজ্ঞাপন দ্বারা স্পষ্ট, এই ভবিষ্যদ্বাণী এজন্য করা হয়েছিল যে—

১. যারা জীবন প্রত্যাশী, তারা যেন মৃত্যুর কবল থেকে মুক্তি লাভ করে এবং যারা কবরের মধ্যে প্রোথিত, তারা বের হয়ে আসে।

২. যাতে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও আল্লাহ তা'লার কালামের মর্যাদা মানুষের কাছে প্রকাশিত হয়।

৩. যাতে সত্য তার যাবতীয় আশিসসহ আসে এবং মিথ্যা তার যাবতীয় অকল্যাণসহ পলায়ন করে।

৪. এবং মানুষ যেন বুঝে, খোদা সর্বশক্তিমান; তিনি যা ইচ্ছা পোষণ করেন, তা-ই করে থাকেন।

৫. যেন তারা বিশ্বাস আনয়ন করে যে, খোদা তা'লা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সাথে আছেন।

৬. এবং যারা খোদার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী; খোদার ধর্ম ও কিতাব এবং তাঁর পবিত্র রসূল মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-কে অস্বীকার করে আর অসত্য মনে করে, তারা যেন একটি প্রকাশ্য নিদর্শন পায়।

৭. এবং অপরাধীদের শাস্তির পথ পরিষ্কার হয়। [‘আল-মাওউদ’, আনোয়ারুল উলূম, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ৫২৮-৫২৯]

এখন চিন্তার বিষয় হলো, লোকজন কীভাবে খোদা তা'লাকে সর্বশক্তিমান মনে করতে পারত বা লোকজন এটা কীভাবে বিশ্বাস করতে পারত যে, খোদা তা'লা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সাথে রয়েছে? যদি একথা বলা হয় যে, তিনশ বছর পর অথবা চারশ বছর পর এমন এক নিদর্শন প্রকাশিত হবে যার দরুন তোমরা একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়ে যাবে যে, ইসলামের খোদা সর্বশক্তিমান বা খোদা তা'লা তাঁর সাথে রয়েছেন। এমন ভবিষ্যদ্বাণীকে লেখরাম কি গুরুত্ব দিতে পারত অথবা সে সকল লোক যারা সে সময় ইসলামের প্রতি আপত্তি আরোপ করছিল, রসূলে করীম (সা.)-এর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা আখ্যা দিচ্ছিল, ইসলামকে মৃতধর্ম আখ্যা দিচ্ছিল, তাদের প্রতি কি ‘হুজ্জত’ (অকাট্য দলিলপ্রমাণ) হতে পারত যে, তোমরা চারশ বছর পর খোদা তা'লাকে সর্বশক্তিমান মনে করতে থাকবে।

‘মুসলেহ মাওউদ’-এর জন্মগ্রহণের নির্ধারিত সময়সীমা নয় বছর

অনুরূপভাবে তিনি (আ.) ইশতেহারে লিখেন, “এমন পুত্রসন্তান ঐশী ওয়াদা অনুযায়ী নয় বছরের মধ্যে অবশ্যই জন্মগ্রহণ করবে। দ্রুত হোক অথবা

দেহিতে হোক, এই সময়ের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করবে”। [মাজমুয়া ইশতেহারাত, খণ্ড: ১, পৃ. ১১৩]

এভাবে তিনি (আ.) এই ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে আরও একটি শর্ত যুক্ত করেন। প্রথমে তো নির্দিষ্ট সময়সীমার উল্লেখ ছিল না। লোকজন বলতে পারত যে, হতে পারে দশ অথবা পনের অথবা বিশ বছরের মধ্যে পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করবে, কিন্তু এই ইশতেহারের মাধ্যমে তিনি (আ.) এক নতুন শর্তের ঘোষণা দেন এবং বলেন, ঐশী ইলহামের মাধ্যমে এই সংবাদ সম্পর্কে অবগত হয়েছি যে, সেই পুত্রসন্তান, যার সম্পর্কে প্রথম ইশতেহারে সংবাদ দেয়া হয়েছিল যে, নয় বছরের মধ্যে জন্মগ্রহণ করবে, দ্রুত হোক কিংবা দেহিতে, এই সময়ের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করবে। এতে মানুষ আপত্তি জানায় যে, নয় বছর তো অনেক দীর্ঘ সময়। এই সময়ের মধ্যে পুত্রসন্তানের জন্মগ্রহণ করা কোনো অসম্ভব বিষয় নয়। যখন তাঁর (আ.) নিকট এই আপত্তি পৌঁছে তখন তিনি ৮ এপ্রিল, ১৮৮৬ সনে আরো একটি ইশতেহার প্রকাশ করেন। সেখানে লিখেন, “যে সমস্ত বিশেষ গুণাবলীসম্পন্ন পুত্রসন্তানের শুভসংবাদ দেয়া হয়েছে, কোনো দীর্ঘ সময় নয়, বরং নয় বছরের কিছু কম-বেশিও যদি হতো তথাপি তার মহত্ব ও মর্যাদায় কোনো পার্থক্য আসতে পারে না। বরং প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি নিঃসংকোচে সাক্ষ্য দেয় যে, এত উচ্চ পর্যায়ের সংবাদ যা এমন বিখ্যাত ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত, তা মানুষের শক্তিসামর্থ্যের উর্ধ্বে।” [মাজমুয়া ইশতেহারাত, খণ্ড: ১, পৃ. ১১৭]

অর্থাৎ আমরা শুধুমাত্র এক পুত্রসন্তান জন্মের সংবাদ দিচ্ছি না, বরং এমন এক পুত্রসন্তানের জন্মের সংবাদ দিচ্ছি যে নয় বছরের মধ্যে জন্মগ্রহণ করবে, ইসলাম ধর্মের সেবা করবে, রসূলে করীম (সা.)-এর নামকে প্রসারতা দান করবে এবং ধর্মের সেবা করার মাধ্যমে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রসিদ্ধি লাভ করবে।

প্রথম বশীরের জন্মগ্রহণ

এসব ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশিত হবার পর হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ঘরে ৭ আগস্ট, ১৮৮৭ সনে এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। (দেখুন- ইশতেহার ৭ আগস্ট, ১৮৮৭) যার নাম তিনি ‘বশীর’ রাখেন এবং তাকে ৮ এপ্রিল, ১৮৮৬ সনের ইশতেহারে যে অপর এক পুত্রসন্তানের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যার

নিকটবর্তী সময়ে জন্মগ্রহণ করার কথা ছিল তার সত্যায়নকারী আখ্যা দিয়েছেন। [‘আল-মাওউদ’ পুস্তক অবলম্বনে]

প্রথম বশীরের মৃত্যুতে লোকজনের আপত্তিসমূহ

অতঃপর ১ ডিসেম্বর, ১৮৮৮ সনে প্রথম বশীরের মৃত্যুতে তিনি (আ.) সেই ইশতেহার প্রকাশ করেন যাকে ‘সবুজ ইশতেহার’ বলা হয়। এতে তিনি (আ.) লোকজনের সে সকল ফিতনা-ফাসাদের জবাব দিয়েছেন যা প্রথম বশীরের মৃত্যুতে সৃষ্টি হয়েছিল যে, ভবিষ্যদ্বাণী তো এক অতি মর্যাদাবান ও মহত্বপূর্ণ পুত্রসন্তান সম্পর্কে করা হয়েছিল, কিন্তু সে-তো শৈশবেই মৃত্যুবরণ করেছে। এই হাদীসে একান্তই ভ্রান্ত ছিল, কেননা যেভাবে ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে, ইলহামসমূহে এমন একটি শব্দও ছিল না যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রথম বশীর এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নকারী ছিলেন। ইলহামসমূহে কেবল এক অসাধারণ গুণসম্পন্ন পুত্রসন্তানের সংবাদ ছিল যার সম্পর্কে বলা হয়েছিল, এক গর্ভধারণের সময়সীমার মধ্যে জন্মগ্রহণ করবে এবং ব্যাখ্যা করে দেয়া হয়েছিল যে, হযরত আম্মাজান অন্তঃসত্তা। হয়তবা এই অন্তঃসত্তায় নতুবা এর নিকটবর্তী অন্তঃসত্তা অবস্থায় জন্মগ্রহণ করবে। অতএব এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রথম বশীর জন্মগ্রহণ করেছে এবং ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৬ সনের ভবিষ্যদ্বাণীর অপর অংশ যেখানে তাকে মেহমান আখ্যা দেয়া হয়েছিল, তদনুযায়ী সে ৪ নভেম্বর, ১৮৮৮ সনে মৃত্যুবরণ করেছে। [‘আল-মাওউদ’, আনোয়ারুল উলুম, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ৫৩৭]

২০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৬ সনের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বিশদ ইলহামী ব্যাখ্যা

“সবুজ ইশতেহার”-এ একথাও উল্লেখ করা হয়েছে, ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৬ সনের ইশতেহারে প্রকৃতপক্ষে দুটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল।

“ধন্য সে, যে আকাশ থেকে আসে”- এই বাক্য পর্যন্ত প্রথম বশীর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল এবং “তাঁর সাথে ফজল (বিশেষ কৃপা) রয়েছে যা তাঁর আগমনের সাথে উপস্থিত হবে”- এই বাক্য দ্বারা সেই ভবিষ্যদ্বাণী শুরু হয় যা ‘মুসলেহ মাওউদ’ সম্পর্কিত ছিল। মূলত এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রথমে কেবল এক পুত্রসন্তান সম্পর্কিত ধারণা করা হয়েছিল। এই সম্পর্কে পরবর্তীতে আল্লাহ

তাঁলা কর্তৃক ইলহামের মাধ্যমে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর এই বিষয়ে জ্ঞান লাভ হয় যে, এর দুটি অংশ রয়েছে। ভবিষ্যদ্বাণীর প্রথম অংশ ছিল, “অতএব তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো, সুদর্শন ও এক পবিত্র পুত্রসন্তান তোমাকে দেয়া হবে, এক মেধাবী পুত্র তুমি লাভ করবে। সেই পুত্রসন্তান তোমারই ঔরসজাত, তোমারই সন্তান হবে। সুশ্রীপুত্র তোমার মেহমান আসছে। তার নাম ‘আনমোয়াইল’ এবং সুসংবাদদাতাও বটে। তাঁকে পবিত্র আত্মা দেয়া হয়েছে। আর সে কলুষতা থেকে পবিত্র। আর সে আল্লাহর নূর। ধন্য সে, যে আকাশ থেকে আসে”। ভবিষ্যদ্বাণীর এই অংশ সম্পর্কে খোদা তাঁলা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে বলেছেন, এটা প্রথম বশীর সম্পর্কিত।

ভবিষ্যদ্বাণীর ২য় অংশ যা ‘মুসলেহ মাওউদ’-এর সাথে সম্পর্ক রাখে, সে অংশ এই বাক্য দ্বারা শুরু হয়, “তাঁর সাথে ফজল (বিশেষ কৃপা) আছে, যা তাঁর আগমনের সাথে উপস্থিত হবে”। আর ‘কানা আমরাম মাকযিয়ান’ পর্যন্ত যায়।

এতে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ইঙ্গিত করেছেন, নিঃসন্দেহে মোবাস্থের (সুসংবাদদাতা), বশীর (সুসংবাদদাতা), নূরুল্লাহ (আল্লাহর জ্যোতি), সাইয়েব (বৃষ্টি বর্ষণকারী মেঘ), চেরাগে দীন (ধর্মের প্রদীপ) প্রমুখ নামসমূহ মৃত পুত্রসন্তানের রাখা হয়েছিল। কিন্তু এই সবগুলোই তাঁর সত্তাগত গুণাবলী ছিল। তাঁর দীর্ঘায়ু লাভ করার কোনো প্রকার শর্ত ইলহামে উল্লেখ ছিল না। বরং ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৬ সনের ভবিষ্যদ্বাণীতেই একথা লিপিবদ্ধ ছিল— “খুব সুন্দর, পবিত্র ছেলে তোমার মেহমান আসছে।” আর মেহমান সেই হয়ে থাকে যার অবস্থান সাময়িক ও কিছু দিনের জন্য হয়ে থাকে। তবে তাঁর সত্তাগত ফজিলত সংক্রান্ত যে ইলহামসমূহ ছিল, যেখানে তাঁকে বশীর, মোবাস্থের, সাইয়েব, চেরাগে দীন ইত্যাদি আখ্যা দেয়া হয়েছিল তা হতে কেবল এতটুকুই ধারণা করা যাচ্ছিল যে, সে সত্তাগত যোগ্যতার দিক দিয়ে উচ্চ পর্যায়ের হবে। এটা ধারণা করা যাচ্ছিল না যে, সে জীবিতও থাকবে এবং দীর্ঘায়ু লাভ করবে। তিনি (আ.) বলেন, এ বিষয়টি এমনই যেভাবে রসূলে করীম (সা.) নিজ সন্তান ইবরাহীমের মৃত্যুতে বলেন, ‘লাউ আশা ইবরাহীমা লাকানা সিদ্দীকান নাবীয়ান’। [ইবনে মাজাহ, কিতাবুল জানায়েয, অধ্যায়- মা জা’আ ফিসসালাতে ‘আলা ইবনে রসূলিল্লাহে (সা.) ...]

‘ইবরাহীম যদি জীবিত থাকত তবে অবশ্যই নবী হতো’। এখন এটা স্পষ্ট যে,

রসূলে করীম (সা.) নিজ সন্নিধান হতে ইবরাহীমকে নবুয়তের মর্যাদা দান করতে পারতেন না, কেননা নবী খোদা বানায়, মানুষ বানায় না। আর যখন তিনি (সা.) তাঁকে নিজ সন্নিধান হতে নবুয়তের মর্যাদা দান করতে পারতেন না, তখন তাঁর (সা.)-এর একথা বলা যে, ‘ইবরাহীম যদি জীবিত থাকত তবে নবী হতো’- স্পষ্টভাবে একথাই প্রকাশ করে যে, আল্লাহ তা’লা তিনি (সা.)-কে ইলহামের মাধ্যমে অবগত করেছিলেন যে, ইবরাহীমের সত্তাগত যোগ্যতা নবুয়ত লাভের দাবি রাখে। কিন্তু খোদা তা’লার নিকট তিনি দীর্ঘায়ু লাভকারী ছিলেন না। অনুরূপভাবে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, নিঃসন্দেহে প্রথম বশীর তাঁর ব্যক্তিগত গুণাবলীর দৃষ্টিকোণ থেকে মোবাস্থের, বশীর, নূরুল্লাহ, সাইয়েব, চেরাগে দীন ছিল, কিন্তু খোদার বাসনায় সে দীর্ঘায়ু লাভকারী ছিল না। যে-রূপ খোদা তা’লার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, সে মেহমানরূপে তোমার নিকট কেবল কিছুদিনের জন্য আসবে। কিন্তু পরবর্তী সংবাদ সেই সন্তান সংক্রান্ত যার সম্পর্কে এই সংবাদ ছিল যে, সে ‘মুসলেহ মাওউদ’ হবে এবং ইসলাম ও রসূলে করীম (সা.)-এর নামকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রসারতা দান করবে। [‘আল-মাওউদ’, আনোয়ারুল উলূম, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ৫৩৭-৫৪০]

দ্বিতীয় বশীর এবং মাহমুদ একই ব্যক্তি

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আরো বলেন, অপর এক বশীরের ওয়াদা রয়েছে যার নাম মাহমুদ। অতএব বলেন- “খোদা তা’লা এই অধমের নিকট প্রকাশ করেছেন, আরেকজন ‘বশীর’ তোমাকে দেয়া হবে যার নাম ‘মাহমুদ’ হবে। সে তাঁর কর্মে অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবে।

‘ইয়াখলুকুল্লাহু মাইয়াশাউ’ আল্লাহ তা’লা যা চান তা-ই সৃষ্টি করেন।” [সবুজ ইশতেহার, পৃ. ১৭; টীকা- রুহানী খাযায়েন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৩]

অনুরূপভাবে ১৫ জুলাই, ১৮৮৮ সনের ইশতেহারে লিখেন- “নিকটবর্তী সময়ের মধ্যে আরো এক পুত্রের ওয়াদা দেয়া হয়েছে। যার নাম মাহমুদ আহমদ হবে।” [মাজমুয়া ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬২]

এদ্বারা জানা যায় যে, দ্বিতীয় বশীর ও মাহমুদ একই ব্যক্তি। আর মাহমুদ সম্পর্কে এই ওয়াদা আছে, সে নিকটবর্তী সময়ে জন্মগ্রহণ করবে।

আগমনকারী ‘মাওউদ’-এর বায়ান্নটি লক্ষণ

এই ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, আগমনকারী নিজের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্যাবলী ধারণ করবে। সুতরাং যদি এই ভবিষ্যদ্বাণী গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা হয় তবে জানা যায় যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীতে আগমনকারী ‘মাওউদ’-এর ৫২টি লক্ষণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে।

১ম লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে, সে কুদরতের এক নিদর্শন হবে।

২য়, সে রহমতের এক নিদর্শন হবে।

৩য়, সে নৈকট্যের এক নিদর্শন হবে।

৪র্থ, সে ফজলের এক নিদর্শন হবে।

৫ম, সে অনুগ্রহের এক নিদর্শন হবে।

৬ষ্ঠ, সে জাঁকজমকপূর্ণ ঐশ্বর্যের অধিকারী হবে।

৭ম, সে গৌরবের অধিকারী হবে।

৮ম, সে সম্পদের অধিকারী হবে।

৯ম, সে সঞ্জীবনী আত্মার অধিকারী হবে।

১০ম, সে পবিত্র আত্মার প্রসাদে বহুজনকে ব্যাধিমুক্ত করবে।

১১তম, সে কালেমাতুল্লাহ (আল্লাহর বাণী) হবে।

১২তম, খোদা তা’লার দয়া ও সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ তাঁকে সম্মানিত বর্ণের সমাহারে প্রেরণ করবেন।

১৩তম, সে অত্যন্ত ধীমান হবে।

১৪তম, সে অত্যন্ত প্রজ্ঞাশীল হবে।

১৫তম, সে হৃদয়বান হবে।

১৬তম, তাঁকে জাগতিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে।

১৭তম, তাঁকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে।

১৮তম, সে তিনকে চার করবে।

১৯তম, তাঁর সাথে সোমবার এর বিশেষ সম্পর্ক হবে।

২০তম, সে সম্মানিত প্রিয় পুত্র হবে।

২১তম, সে সৌভাগ্যবান পুত্র হবে।

২২তম, সে আদি বিকাশস্থল হবে।

২৩তম, সে শেষ বিকাশস্থল হবে।

২৪তম, সে সত্যের বিকাশস্থল হবে।

- ২৫তম, সে মহত্বের বিকাশস্থল হবে।
২৬তম, সে ‘কাআন্লাল্লাহা নাযালা মিনাস সামায়ে’-এর সত্যায়নকারী হবে।
২৭তম, তাঁর আগমন অশেষ কল্যাণময় হবে।
২৮তম, তাঁর আগমন ঐশী গৌরব ও প্রতাপ প্রকাশের কারণ হবে।
২৯তম, সে জ্যোতি হবে।
৩০তম, সে খোদা তা’লার স্বীয় সম্ভুষ্টির সুরভিত নির্যাস দ্বারা সিক্ত হবে।
৩১তম, খোদা তা’লা তাঁর মধ্যে আপন রূহ ফুঁকে দিবেন।
৩২তম, খোদা তা’লার ছায়া তাঁর শিরে থাকবে।
৩৩তম, সে দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করবে।
৩৪তম, সে বন্দিদের মুক্তির কারণ হবে।
৩৫তম, সে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে খ্যাতি লাভ করবে।
৩৬তম, জাতিসমূহ তাঁর কাছ থেকে আশিস ও কল্যাণ লাভ করবে।
৩৭তম, আকাশের দিকে তাঁর আত্মিক কেন্দ্রের উত্তোলন ঘটবে।
৩৮তম, সে দেরিতে আগমনকারী হবে।
৩৯তম, সে দূর হতে আগমনকারী হবে।
৪০তম, সে রসূলগণের গৌরব হবে।
৪১তম, তাঁর জাগতিক আশিস ও কল্যাণ সমস্ত পৃথিবীতে প্রসার লাভ করবে।
৪২তম, তাঁর আধ্যাত্মিক আশিস ও কল্যাণ সমস্ত পৃথিবীতে প্রসার লাভ করবে।
৪৩তম, ইউসুফের মতো তাঁর বড়ো ভাই তাঁর বিরোধিতা করবে।
৪৪তম, সে সুসংবাদ প্রদানকারী হবে।
৪৫তম, সে বিবাহ করবে।
৪৬তম, সে ঐশী বিকাশস্থল হবে।
৪৭তম, সে সৌন্দর্যে ও অনুগ্রহে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সদৃশ হবে।
৪৮তম, সে মহান নিদর্শন হবে।
৪৯তম, সে ঐশী নিদর্শন হবে।
৫০তম, সে ‘নাসিরুদ্দীন’(ধর্মের সাহায্যকারী) হবে।
৫১তম, সে ‘ফাতেহুদ্দীন’(ধর্মের বিজয়দাতা) হবে।
৫২তম, সে দ্বিতীয় বশীর হবে।

[‘আল-মাওউদ’, আনোয়ারুল উলূম, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ৫৬২-৫৬৫]

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, এই লক্ষণাবলী আগমনকারী সম্পর্কে এই ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ণনা করা হয়েছে। এর মধ্যে কিছু লক্ষণাবলী এমন যা শুধুমাত্র মু'মিনদের সম্পর্কে এবং তারাই তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য দিতে পারবে। কিন্তু কিছু লক্ষণাবলী এমন যা অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে এবং ঐ লক্ষণাবলীকে উপস্থাপন করে তাদের ওপর 'হুজ্জত' (অকাট্য দলিলপ্রমাণ) পূর্ণ করা যেতে পারে। আমি এই মুহূর্তে এমনই লক্ষণাবলী চয়ন করছি যার পূর্ণতা লাভকে শত্রু থেকেও বড়ো শত্রু অস্বীকার করতে পারবে না। ['আল-মাওউদ' শীর্ষক বক্তৃতা, আনোয়ারুল উলূম, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ৫২৯-৫৩২]

‘মুসলেহ মাওউদ’-কে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী এই করা হয়েছিল, ‘তাকে জাগতিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে’। এই ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ এই যে, সে জাগতিক জ্ঞান কারো কাছে শিখবে না, বরং খোদার পক্ষ হতে তাঁকে এই জ্ঞান শিখানো হবে। এই বিষয় স্মরণ রাখা উচিত যে, সে জাগতিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত দক্ষ হবে; বরং বাক্য এই যে, তাঁকে জাগতিক জ্ঞান দ্বারা পূর্ণ করা হবে। যার অর্থ অন্য কোনো শক্তি তাঁকে এই জাগতিক জ্ঞান শিখাবে। তাঁর নিজের কোনো চেষ্টাপ্রচেষ্টা, পরিশ্রম ও নিরলস সাধনা এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। এখানে জাগতিক জ্ঞান বলতে গণিতবিদ্যা, বিজ্ঞান ইত্যাদি জ্ঞান হতে পারে না, কেননা এখানে “পরিপূর্ণ করা হবে” শব্দের মাধ্যমে যা প্রকাশ পায় তা হলো খোদার পক্ষ হতে তাঁকে এই জ্ঞান শিখানো হবে। আর খোদা তা'লার পক্ষ হতে বিজ্ঞান, গণিত, ভূগোল ইত্যাদি জ্ঞান শিখানো হয় না বরং ধর্ম ও কুরআন শিখানো হয়। অতএব “তাকে জাগতিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে”= ভবিষ্যদ্বাণীর এই বাক্যের অর্থ হলো, তাঁকে আল্লাহ তা'লার পক্ষ হতে ধর্মীয় ও কুরআনের জ্ঞান শিখানো হবে এবং খোদা স্বয়ং তাঁর শিক্ষক হবেন।

আমার শিক্ষা যেভাবে হয়েছে তা নিজ সন্তায় প্রকাশ করে যে, আমার শিক্ষায় মানুষের কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ ছিল না। আমার শিক্ষকগণের মধ্যে অনেকে জীবিত আছেন এবং অনেকে মৃত্যুবরণও করেছেন। আমার শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল-এর অনুগ্রহ সবচেয়ে বেশি। তিনি যেহেতু চিকিৎসক ছিলেন এবং এবিষয়ে অবগত ছিলেন যে, আমার স্বাস্থ্য এ

সামর্থ্য রাখে না যে, আমি বইয়ের দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারি। এজন্য তাঁর পদ্ধতি ছিল, তিনি আমাকে নিজের পাশে বসাতেন এবং বলতেন, মিয়া! আমি পড়ে যাই আর তুমি শুনতে থাকো। এর কারণ ছিল শৈশবেই আমার চোখে ফোড়া হয়েছিল এবং লাগাতার ৩-৪ বছর পর্যন্ত আমার চোখে হতে থাকে এবং ফোড়ার কারণে এত ব্যাপক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল যে ডাক্তারগণ বললেন, তার দৃষ্টিশক্তি কমে যাবে। এতে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আমার সুস্থাস্থ্যের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করতে শুরু করেন এবং রোযাও রাখতে শুরু করেন। আমার এই মুহূর্তে স্মরণ নাই যে, তিনি (আ.) কতগুলো রোযা রেখেছিলেন। যখন তিনি (আ.) শেষ রোযার ইফতারি করা শুরু করেন এবং রোযাভঙ্গের জন্য কোনো জিনিস মুখে দিলেন, তৎক্ষণাৎ আমি চোখ খুলি এবং চিৎকার করে বলি, আমি দেখতে পাচ্ছি!

হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) আমাকে বলতেন, মিয়া! তোমার স্বাস্থ্য এমন নয় যে, তুমি নিজে নিজে পড়তে পারো। আমার কাছে আসতে থাকো। আমি পড়ে যাব আর তুমি শুনতে থাকবে। সুতরাং তিনি তাগাদা দিয়ে দিয়ে কুরআন পড়িয়েছেন। অতঃপর বুখারী পড়িয়েছেন। এমন নয় যে তিনি আন্তে আন্তে কুরআন পড়িয়েছেন। বরং তাঁর পদ্ধতি এমন ছিল, তিনি কুরআন পড়ে যেতেন এবং সাথে সাথে এর অনুবাদ করতেন। কোনো বিষয় জরুরি মনে করলে বলে দিতেন। নতুবা দ্রুত পড়ে যেতেন। তিনি তিন মাসের মধ্যে সমস্ত কুরআন আমাকে পড়িয়ে দিয়েছিলেন। পুনরায় কিছু গড় হাজিরা শুরু হয়ে যায়। আমাকে পুনরায় বলেন, মিয়া! আমার নিকট হতে বুখারী তো পুরোটা পড়ে নাও। মূলত আমি তাঁকে বলেছিলাম যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আমাকে বলতেন, মৌলবী সাহেব থেকে কুরআন ও বুখারী পড়ে নাও। সুতরাং হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশাতেই আমি তাঁর কাছে কুরআন ও বুখারী পড়া শুরু করি। যদিও বা অনুপস্থিতি হতে থাকে। অনুরূপভাবে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর হিদায়াত মোতাবেক আমি তাঁর কাছে চিকিৎসাবিদ্যা পড়াও শুরু করে দেই। চিকিৎসাবিদ্যা অনুশীলন আমি ও মোহাম্মদ ইসহাক সাহেব একই দিনে শুরু করেছিলাম। বরং মীর সাহেবের একটা কৌতুক আছে যেটা আমাদের ঘরে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করে যে, পরদিনই মীর মোহাম্মদ ইসহাক সাহেব তাঁর মাকে বলতে লাগলেন, আম্মাজান! আমাকে তাড়াতাড়ি জাগিয়ে দিবে, কেননা মৌলবী সাহেব দেরি করে চিকিৎসালয়ে আসেন। আমি আগেই চিকিৎসালয়ে চলে যাব যেন রোগীদেরকে

প্রেসক্রিপশন লিখে দিতে পারি। অথচ এখনো একদিনই হয়েছে উনি চিকিৎসাবিদ্যা পড়া শুরু করেছিলেন। যাহোক, আমি তাঁর কাছে চিকিৎসাবিদ্যা পড়েছি এবং কুরআন করীমের তফসীরও পড়েছি। কুরআন করীমের তফসীর তিনি দুমাসের মধ্যেই সম্পন্ন করে দেন। তিনি আমাকে নিজের কাছে বসাতেন এবং কখনো অর্ধেক আবার কখনো সম্পূর্ণ পারা অনুবাদসহ পড়ে শোনাতেন। কোনো কোনো আয়াতের তফসীরও করে দিতেন। অনুরূপভাবে তিনি বুখারী দুই-তিন মাসের মধ্যে আমাকে সম্পন্ন করে দেন। একদা রমযান মাসে তিনি সমস্ত কুরআনের দরস দেন; তাতেও আমি শরীক হয়ে যাই। কিছু আরবী পত্রিকাও তাঁর কাছে পড়ার আমার সৌভাগ্য হয়েছে। মূলত এতটুকুই আমার শিক্ষা অর্জন ছিল। [‘আল-মাওউদ’ পুস্তক অবলম্বনে]

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, দ্বিতীয় সংবাদ এই ভবিষ্যদ্বাণীতে দেয়া হয়েছিল, ‘তাঁকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে’। আধ্যাত্মিক জ্ঞান বলতে সেই বিশেষ জ্ঞান, যা খোদা তা’লার পক্ষ হতে দান করা হয়। যেমন, অদৃশ্যের জ্ঞান। যা তিনি নিজের এমন বান্দাদের নিকট প্রকাশ করে থাকেন, যাকে তিনি পৃথিবীতে কোনো বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করেন। খোদা তা’লার সাথে তাঁর সম্পর্ক প্রকাশ্য হবে এবং তিনি তাঁর মাধ্যমে লোকদের ঈমানকে সতেজ করেন। অতএব এই ক্ষেত্রেও আল্লাহ তা’লা আমার ওপর বিশেষ অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন এবং অসংখ্য স্বপ্ন ও ইলহাম আমায় হয়েছে যা অদৃশ্যের জ্ঞান দ্বারা সংবলিত। কিন্তু আমি উদাহরণস্বরূপ গুটিকয়েক এস্থলে উল্লেখ করছি। [‘আল-মাওউদ’ পুস্তক অবলম্বনে]

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) কত বড়ো মাপের জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন তা জানতে হলে তাঁর লেখনী, বক্তৃতা, প্রবন্ধ, খুতবা এবং মজলিসে এরফান ইত্যাদির পরিমাণ ও স্থূলতার একটি পরিসংখ্যান জানলেই বুঝা যাবে। যে-সব বইপুস্তক, বক্তৃতা, ভাষণ, প্রবন্ধ, বাণী ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে অথবা এখন প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে এবং ছাপানোর জন্য প্রস্তুত রয়েছে অর্থাৎ ‘আনোয়ারুল উলূম’ আকারে যে-সব বক্তৃতা ও ভাষণ রয়েছে, এর মোট ৩৮টি খণ্ড হবে আর এগুলোর সংখ্যা হলো ১৪২৪। এগুলোর মোট পৃষ্ঠা হলো প্রায় ২০৩৪০, অর্থাৎ আনুমানিক এতটা হবে। তফসীরে কবীর ও তফসীরে সগীরসহ অন্যান্য তফসীরমূলক অংশের পৃষ্ঠা সংখ্যা হলো ২৮৭৩৫। খুতবা জুমুআ রয়েছে ১৮০৮টি যেগুলোর মোট পৃষ্ঠা হলো ১৮৭০৫। ঈদুল ফিতরের

খুতবা রয়েছে ৫১টি যেগুলোর মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫০৩। ঈদুল আযহার খুতবা রয়েছে ৪২টি যেগুলোর পৃষ্ঠা সংখ্যা হলো ৪০৫। বিয়ের খুতবা রয়েছে ১৫০টি যেগুলোর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৮৪। গুরার বক্তৃতামালা প্রথম ও তৃতীয় খণ্ডও প্রকাশিত হয়েছে, এর পৃষ্ঠা সংখ্যা হলো ২১৩১। এছাড়াও আরো আছে। এই সমস্ত পৃষ্ঠাকে একত্রিত করলে মোট প্রায় ৭৫,০০০ পৃষ্ঠা দাঁড়ায়। ‘রিসার্চ সেল’ আল-হাকাম ও আল-ফযল পত্রিকার ১৯১৩ থেকে ১৯৭০ সন পর্যন্ত সংখ্যাগুলোকে যাচাইবাছাই করেছে। তাদের ভাষ্য হলো, আরো কিছু বিষয় সামনে এসেছে যেগুলো এখনো আনোয়ারুল উলুম বা অন্য কোনো গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নি। এই বর্ণনানুযায়ী ৫৫টি প্রবন্ধ, ২৭টি বক্তৃতা, ১৪৩টি মজলিসে এরফান, ২২২টি মলফুযাত বিষয়ক প্রবন্ধ এবং ১৩১টি পত্রাবলী এখন পর্যন্ত পাওয়া গেছে। এগুলো জ্ঞানের অনেক বড়ো এক ভাণ্ডার। [জুমুআর খুতবা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ থেকে সংগৃহীত]

কুরআনী জ্ঞানের বিকাশ ও তফসীর সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে চ্যালেঞ্জ

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, আমি দেখি, আমি একটি জায়গায় দাঁড়ানো। পূর্বদিকে আমার মুখ ফিরানো। আকাশ হতে আমার কাছে এমন আওয়াজ আসল যেভাবে ঘণ্টা বাজে অথবা পিতলের কোনো পাত্রে টোকা দিলে তা হতে যে চিকন টন টন শব্দ সৃষ্টি হয়। অতঃপর কিছু সময়ের মধ্যেই সেই আওয়াজ ছড়িয়ে পড়তে থাকে ও উচ্চ হতে থাকে। এমনকি সমস্ত পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর আমি কি দেখি যে, সেই আওয়াজ আকৃতি ধারণ করে ছবির ফ্রেম হয়ে যায়। অতঃপর সেই ফ্রেমে নড়াচড়া শুরু হয় এবং তাতে এক অতিশয় সুন্দর ও চমৎকার সত্তার ছবি পরিলক্ষিত হয়। কিছুক্ষণ পর সে ছবি নড়তে শুরু করে এবং মুহূর্তের মধ্যে তা হতে এক সত্তা লাফ দিয়ে আমার সামনে আসে এবং বলে, আমি খোদা তা’লার ফেরেশতা। আমাকে আল্লাহ তা’লা তোমার কাছে এজন্য পাঠিয়েছে যেন আমি তোমাকে সূরা ফাতিহার তফসীর শিখাই। আমি বললাম, শিখাও। সে শিখাতেই থাকল, শিখাতেই থাকল আর শিখাতেই থাকল। এমনকি সে যখন ‘ইয়্যাকা না’বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতা’ঈন’ [সূরা আল-ফাতিহা: ৫] পর্যন্ত পৌঁছালো তখন বলতে লাগল, আজ পর্যন্ত যেসকল তফসীরকারকগণ গত হয়েছেন, তারা সবাই এই

পর্যন্ত তফসীর করেছেন। কিন্তু আমি তোমাকে আরো শিখাতে চাই। আমি বললাম, শিখাও। সুতরাং সে শিখাতে থাকল, এমনকি সমস্ত সূরা আল-ফাতিহার তফসীর সে আমাকে শিখিয়ে দেয়।

যখন আমার চোখ খোলে তখন ফিরিশতার শিখানো কথাগুলোর মধ্যে কিছুকথা আমার স্মরণে ছিল। কিন্তু আমি নোট করি নি। পরের দিন আমি হযরত খলীফা আউয়াল-এর নিকট এই স্বপ্নের কথা উল্লেখ করি এবং একথাও বলি যে, কিছু কথা আমার স্মরণে ছিল, কিন্তু আমি তা নোট করি নি। আর এখন তো আমার স্মৃতি থেকে একেবারে মুছে গিয়েছে। হযরত খলীফা আউয়াল ভালোবাসার সাথে বলতে লাগলেন, “আপনিই সমস্ত জ্ঞান নিয়ে নিয়েছেন। কিছু স্মরণ রাখলে তো আমাদেরও শোনাতেন”। [‘আল-মাওউদ’ পুস্তক অবলম্বনে]

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, আমি বারবার লোকদেরকে এবিষয়ে চ্যালেঞ্জ দিয়েছি যে, তারা কুরআন করীমের তফসীর নিয়ে আমার সাথে মোকাবিলা করুক। কিন্তু অদ্যবধি কারো সাহস হয় নি যে কুরআনের তফসীর নিয়ে আমার সাথে মোকাবিলা করতে পারে। এতে কোনো সন্দেহ নাই যে মৌলবী সানাউল্লাহ সাহেব ও মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব আমার এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় সর্বদা কিছু না কিছু লিখে থাকেন। কিন্তু ঘটনা হলো, তাদের হৃদয়ে দৃঢ়তার সহিত এই সাহস পাওয়া যায় না যে, তারা আমার কুরআন করীমের তফসীর সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করে। মৌলবী সানাউল্লাহ সাহেব এর জবাবে এটা লিখে দেন যে, আমার পক্ষ হতে কেবল এটুকুই শর্ত যে, অনুবাদবিহীন কুরআন করীম এবং কাগজ, কলম, দোয়াত নিয়ে আমরা সামনাসামনি বসে পড়ি এবং কুরআন করীমের তফসীর লিখি। উনার এই কথার প্রেক্ষিতে সর্বদা আমার এই সন্দেহের উদ্রেক হয় যে, সম্ভবত উনার বিশ্বাস আমি কুরআন করীমের অনুবাদ পারি না। যদি অনুবাদবিহীন কুরআন আমার হাতে দেয়া হয় তবে আমি বলব, আমি এখন কী করব? আমি তো অনুবাদই জানি না, তফসীর আমি কীভাবে লিখব। অথচ যখন আমি কুরআন করীমের তফসীর সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি এবং পৃথিবীর সমস্ত আলেমদের বলছি, যদি তাদের সাহস থাকে তবে তারা আমার মোকাবিলা করুক। তাই উনার বুঝা উচিত যে, কুরআন করীমের অনুবাদ তো আমি অবশ্যই জানি। কিন্তু মনে হয় মৌলবী সানাউল্লাহ সাহেব আমার পক্ষ হতে তফসীর লেখার

চ্যালেঞ্জ দেয়া সত্ত্বেও এই ধারণা পোষণ করেন যে, যদি আমার কাছে অনুবাদবিহীন কুরআন থাকে তবে আমি কিছুই লিখতে পারব না। উনি সর্বদা একথা বলেই চুপ হয়ে যান। অথচ আমার মূল চ্যালেঞ্জ যা পূর্বেও প্রকাশিত হয়েছে এবং এখনো কায়েম আছে তা হলো, “গয়ের আহমদী আলেমরা সবাই মিলে কুরআন করীমের সেই আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান বর্ণনা করুন যা পূর্বের কোনো পুস্তকে পাওয়া যায় না এবং যা ব্যতীত আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা অসম্ভব ছিল। অতঃপর আমি তাদের মোকাবিলায় কমপক্ষে দ্বিগুণ কুরআনী তত্ত্বজ্ঞান বর্ণনা করব যা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) লিখেছেন। আর এই মৌলবীদের তো এবিষয়ে কোনো বোধশক্তিই ছিল না যে, পূর্বের তফসীরকারক ও লেখকগণ কী লিখেন নি! [‘আল-মাওউদ’ পুস্তক অবলম্বনে]

আহমদীদের মোকাবিলায় লাহোরী গ্রুপের ব্যর্থতার সংবাদ

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জীবদশাতে যখন খেলাফত সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন মাথায় আসতেই পারে না, আমার প্রতি আল্লাহ তা’লার পক্ষ হতে ইলহাম হয়—

‘ইন্শাআল্লাহীনাৎ তাবাউকা ফাউক্বাল্লাহীনা কাফারু ইলা ইয়াওমিল কিয়ামাতে’ অর্থাৎ সেই সমস্ত লোক যারা তোমার প্রতি ঈমান আনবে কিয়ামত পর্যন্ত যারা তোমার বিরোধী হবে তাদের ওপর বিজয়ী থাকবে। এই ইলহাম আমি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে শুনাই এবং তিনি (আ.) সেটা লিখে ফেলেন। এটা সেই আয়াত যা হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে কুরআনে করীমে এসেছে। কিন্তু সেখানে বাক্য এরূপ—

‘ওয়া জায়িলুল্লাহীনাৎ তাবাউকা ফাউক্বাল্লাহীনা কাফারু ইলা ইয়াওমিল কিয়ামাতে’ [সূরা আলে ইমরান: ৫৬] আমি তোমার অস্বীকারকারীদের ওপর তোমার মান্যকারীদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত বিজয় দান করব। কিন্তু আমার প্রতি যে ইলহাম হয় তা হলো—

‘ইন্শাআল্লাহীনাৎ তাবাউকা ফাউক্বাল্লাহীনা কাফারু ইলা ইয়াওমিল কিয়ামাতে’ যা পূর্বের তুলনায় অধিক তাগিদপূর্ণ। অর্থাৎ আমি আমার সন্তারই কসম খেয়ে বলছি, নিশ্চয় আমি তোমার অনুসারীদেরকে তোমার অস্বীকারকারীদের ওপর

কিয়ামত পর্যন্ত বিজয় দান করব। আমি বহুদিন যাবৎ এই ইলহাম বন্ধুগণকে শুনিয়ে আসছি। এর পরিণামে দেখ! আমার কিরূপ বিরোধিতা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তা'লা আমাকে বিজয় দান করেছেন। লাহোরী গ্রুপ হযরত খলীফা আউয়াল-এর যুগে এই কথা— “এক বাচ্চার জন্য জামা'তকে ধ্বংস করার পায়তারা চলছে” বলে অপপ্রচার করেছে। কিন্তু সম্পূর্ণ নিষ্ফল প্রমাণিত হয়েছে। [‘আল-মাওউদ’ শীর্ষক বক্তৃতা, আনোয়ারুল উলূম, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ৫৪৭]

লাহোরী গ্রুপের আরেকটি বিভীষিকাময় পরিণতি:

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, অতঃপর আমার খেলাফতের যুগে জামা'তের সদস্যগণ মসজিদে নূর-এ আমার হাতে বয়আত গ্রহণ করে। ‘আল ওসীয্যত’-এর উদ্ধৃতি যেখানে একথার উল্লেখ আছে, “যার সম্মুখে ৪০ জন মু'মিন একমত হয়ে বলবেন যে, তিনি আমার নামে লোকের বয়আত গ্রহণ করার উপযুক্ত, তিনি বয়আত গ্রহণ করার অধিকারী হবেন”। (আল ওসীয্যত, পৃ. ৮; টীকা- রুহানী খাযায়েন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩০৬ টীকা)-এর মোকাবিলায় তারা অন্য কাউকে খলীফা বানানোর চেষ্টা করে। এই উদ্ধৃতির তো অন্য অর্থ। কিন্তু যখন তারা দেখল যে, লোকজন কোনো অবস্থাতেই খেলাফত ত্যাগ করতে পারবে না, তখন তারা আকাজক্ষা করল যে, আমরাও এক খলীফা বানাই। অতএব মাস্টার আব্দুল হক সাহেব যিনি প্রথম পারার ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন এবং যিনি প্রাথমিক অবস্থায় আমার হাতে বয়আত গ্রহণ করেন নি, বরং তাদের সঙ্গে ছিলেন; পরবর্তীতে বলেন, মৌলবী সদরউদ্দীন সাহেব রাতের বেলা লঠন হাতে মাস্টার আব্দুল হক সাহেব ও আরেকজন সাহেবসহ দুই হাজার আহমদীদের ঘরে চক্কর লাগাতে থাকেন যেন এই ধারণার চল্লিশজন লোক মিলে যায়। কিন্তু এতজন লোকও সে পায় নি যারা তাকে সাহায্য করবে। বরং উনার বর্ণনা ছিল, শুধুমাত্র তেরোজন ব্যক্তি এই ধারণার অনুসারী ছিল। চল্লিশ জনের সংখ্যা পূর্ণ হয় নি।

এখন দেখো! এটা খোদা তা'লার কি মহান কুদরত যে, সে সময় সমস্ত দায়িত্বাবলী এইসব লোকদের হাতে ছিল। আজ্ঞামানের ওপর তাদের দখল ছিল, গ্রন্থাবলী তাদের দায়িত্বে ছিল, পদাবলী তাদের কজায় ছিল। কিন্তু সর্বপ্রকার চেষ্টা চালিয়েও সমস্ত কাদিয়ানে তেরোজনের বেশি ব্যক্তি পাওয়া যায় নি যারা এ বিষয়ে একমত হয় যে, আমার মোকাবিলায় অন্য কারো হাতে

বয়আত গ্রহণ করবে। তারা এই উদ্দেশ্যে সৈয়্যদ আবেদ আলী শাহ সাহেবের নাম প্রস্তাব করেছিল এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, তার খেলাফতের জন্য চল্লিশজন ব্যক্তি প্রস্তুত করা হবে। কিন্তু আল্লাহ তা'লা তাদেরকে শুধুমাত্র এইভাবে লজ্জিত করে নি যে, এত বড়ো জমায়েত হতে সমস্ত রাত চক্কর লাগিয়েও চল্লিশজন ব্যক্তি পাওয়া যায় নি এবং তারা ব্যর্থ হয়ে নিজ গৃহে ফেরত আসে। বরং খোদা তা'লা তাদেরকে এভাবেও লজ্জিত করেন যে, অবশেষে সৈয়্যদ আবেদ আলী শাহ সাহেব আমার হাতে বয়আত গ্রহণ করেন, কিন্তু পরবর্তীতে তিনি উন্মাদ হয়ে যান এবং মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটায় দরুন তিনি নবুয়তের দাবি করেন এবং ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ তা'লা বলেছেন, আমার ঘরে প্লেগ আসবে না। কিন্তু ঘোষণা করার পর তিনি নিজেই প্লেগে মারা যান। [‘আল-মাওউদ’ শীর্ষক বক্তৃতা, আনোয়ারুল উলুম, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ৫৪৯]

আহরারী জামা'তের পরাজয়

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, অনুরূপভাবে আহরারী জামা'ত আমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। আহরারীদের প্রতি কিছু নেতৃবর্গের সমর্থনও ছিল, কেননা কাশ্মির কমিটির সভাপতির দায়িত্ব আমার হাতে ন্যস্ত করা হয়েছিল। তার দরুন কিছু নেতৃবর্গের এই ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে, এই শক্তিকে ভেঙে ফেলতে হবে। এমনটা যেন না হয় যে, সে আবার অন্য কোনো রাজ্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়ে যায় অথবা কাশ্মিরের বিপক্ষেই-না আন্দোলন শুরু করে দেয়। অতএব আহরারীরা ১৯৩৪ সনে আন্দোলন শুরু করে এবং এরূপ বিরোধিতা করে যে, সমস্ত ভারতবর্ষকে আমাদের জামা'তের বিপক্ষে উস্কে দেয়। সেসময় মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে আমি আমার এক খুতবায় ঘোষণা করি যে, তোমরা আহরারীদের ফিৎনা-ফ্যাসাদের দরুন বিচলিত হয়ো না।

“খোদা তা'লা আমাকে ও আমার জামা'তকে বিজয় দান করবেন। কেননা খোদা তা'লা আমাকে যে রাস্তায় দাঁড় করিয়েছেন তা বিজয়ের রাস্তা। যে শিক্ষা দিয়েছেন তা সফলতার চূড়ায় পৌঁছানোর শিক্ষা এবং যে মাধ্যমসমূহ অবলম্বনের তৌফিক দিয়েছেন তা সফল ও উদ্দেশ্যপূর্ণকারী মাধ্যম। এর বিপরীতে আমি তাদের পায়ের তলা হতে মাটি সরে যেতে দেখছি এবং আমি তাদের পরাজয়কে তাদের নিকটবর্তী হতে দেখছি। তারা যত বেশি পরিকল্পনা

করত ও নিজেদের সফলতার জয়ধ্বনি উচ্চরিত করত, ততটাই স্পষ্ট তাদের মৃত্যু আমায় দেখা দিচ্ছে।” [আল-ফযল, ৩০ মে, ১৯৩৫, পৃ. ৫]

তিনি (রা.) বলেন, আমি যখন খলীফা হই তখন আমাদের ভাণ্ডারে পয়সা ছিল কেবল চৌদ্দ আনা আর ঋণ ছিল আঠারো হাজার রুপি। এমনকি আমি যখন আমার খিলাফতের যুগে প্রথম বিজ্ঞাপন রচনা করি যার বিষয়বস্তু ছিল “কে আছে যে খোদার কাজকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে!” তা ছাপানোর জন্যও আমার কাছে কোনো অর্থ ছিল না। তখন আমাদের নানাজানের কাছে কিছু চাঁদার অর্থ জমা ছিল যা তিনি মসজিদ খাতে লোকদের কাছ থেকে নিয়েছিলেন। সেই চাঁদা থেকে দু-শো টাকা তিনি বিজ্ঞাপন ছাপানোর জন্য দেন এবং বলেন, বাইতুল মালে যখন চাঁদা আসতে শুরু করবে, এই ঋণ তখন পরিশোধ হয়ে যাবে। এককথায় তার কাছ থেকে সেসময় দু-শো রুপি ঋণ নিয়ে এই বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। আর তা করা হয় সেই সময় যখন জামা’তের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির আমার বিরোধী, জামা’তের অর্থ ভাণ্ডার শূন্য, জমা ছিল শুধুমাত্র চৌদ্দ আনা পয়সা। (চৌদ্দ আনার অর্থ, এক রূপিতে ষোল আনা হয় অর্থাৎ পুরো এক রূপিও ছিল না। আর বর্তমান যুগের হিসাবে ৮৭/৮৮ পয়সা।) আঞ্জুমানের কাঁধে ঋণের বোঝা ছিল আঠারো হাজার রুপি, আঞ্জুমানের অধিকাংশ সদস্য ছিল আমার বিরোধী, আঞ্জুমানের সেক্রেটারী আমার বিরোধী, মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকও আমার বিরোধী আর তখন আমি খোদার ইচ্ছায় সে বিজ্ঞাপনে এই বাক্য প্রকাশ করেছিলাম, খোদা চান আমার হাতে জামা’তের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হোক, খোদার এ ইচ্ছাকে এখন কেউ বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না। তারা কি দেখে না, তাদের সামনে মাত্র দুটি পথই খোলা আছে, হয় তারা আমার হাতে বয়আত করে জামা’তের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকবে নয়-তো কামনা-বাসনার অনুসরণে সেই পবিত্র বাগানকে উপড়ে ফেলুক যাতে পবিত্র লোকেরা রক্তাক্ত সিংহন করেছেন। পূর্বে যা কিছু হয়েছে তা-তো হয়েছেই কিন্তু এখন এতে কোনো সন্দেহ নাই যে, জামা’তের ঐক্যের একটাই পথ আর তা হলো খোদা তা’লা যাকে খলীফা নিযুক্ত করেছেন তাঁর হাতে বয়আত করা, অন্যথায় এর বিরুদ্ধে যে-ই যাবে সে বিভেদের কারণ হবে। এরপর তিনি বলেন, আমি লিখেছি, জগতের সবাই যদি আমাকে মেনে নেয় তবুও আমার খিলাফত বড়ো হতে পারে না আর খোদা না করুক সবাই যদি আমাকে পরিত্যাগ করে তবুও আমার খিলাফতে

কোনো পার্থক্য আসতে পারে না। যেভাবে নবী একাই নবী হন সেভাবে খলীফাও একাই খলীফা হন।

অতএব কল্যাণমণ্ডিত তারা, যারা খোদার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। খোদা তা'লা আমার ওপর যে দায়িত্ব অর্পন করেছেন তা অনেক ভারি আর যদি তাঁর সাহায্য আমার সাথে না থাকে তবে আমি কিছুই করতে পারব না। কিন্তু সেই পবিত্র সত্তার প্রতি আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে, তিনি অবশ্যই আমাকে সাহায্য করবেন। মোটকথা, বিভিন্ন ধরনের বিরোধিতা হয়েছে, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, অভ্যন্তরীণ এবং বাহিরগতও; কিন্তু আল্লাহ তা'লা জামা'তকে উন্নতির মহাসড়কে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আমাকে তৌফিক দিয়েছেন। (ম'য়্যা হি মুসলেহ মাওউদ কি পেশগোয়ী কা মিসদাক হুঁ, আনোয়ারুল উলুম, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ২১৯-২২১)

পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে 'মুসলেহ মাওউদ'-এর প্রসিদ্ধি ও ইসলামের প্রসার লাভ

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণী এই করা হয়েছিল যে, 'সে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রসিদ্ধি লাভ করবে এবং বিভিন্ন দেশে তাঁর মাধ্যমে ইসলামের তবলীগ হবে।' এই ভবিষ্যদ্বাণীও এমনভাবে পূর্ণতা লাভ করেছে যে, বড়ো বড়ো শত্রুও একে অস্বীকার করতে পারবে না।

খোদা তা'লা যখন আমাকে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত করেন সেসময় জামা'তের অবস্থা এমন ছিল যে, ভাঙারে শুধু চার আনা ছিল এবং আঠারো হাজার রূপি ঋণ ছিল। আর্থিক অবস্থা এত করুণ ছিল যে, সেই ইশতেহার যা আমরা লাহোরী গ্রুপের জবাবে প্রকাশ করতে চাইতাম, তার জন্যও আমাদের নিকট কোনো রূপি ছিল না। ইশতেহার তো আমরা লিখতে পারতাম, কিন্তু এটা ধারণা করতে পারতাম না যে, সেই ইশতেহারসমূহ প্রকাশিত হবার স্বরূপ কি হবে। প্রাথমিক পর্যায় হবার দরুন চাঁদার তাহরীকও করা যেত না; কেননা ভয় ছিল যে মানুষ বিচলিত না হয়ে যায়। এই চিন্তায় মগ্ন ছিলাম যে, আমাদের নানাজান মীর নাসের নওয়াব সাহেব আমার কাছে আসেন এবং বলেন, সম্ভবত ইশতেহার সম্পর্কে তোমার এই ধারণা হবে, সেগুলো প্রকাশের জন্য রূপি কোথা হতে আসবে। আমার নিকট এই মুহূর্তে 'দারুজ যোয়াফা'-এর চাঁদা

আছে। এটা নিয়ে নাও, যখন রূপি আসবে তখন ফেরত দিয়ে দিও। অতএব তিনি ৫০০ রূপির থলে আমার সামনে রেখে দেন। এইভাবে যে চাঁদা অর্জিত হয় তা দ্বারা প্রথম ইশতেহার প্রকাশ করা হয় যার বিষয়বস্তু হলো— “কে আছে, যে খোদার কাজে প্রতিবন্ধক হতে পারে”। এমতাবস্থায় যখন জামা’তের বড়ো বড়ো নেতারা বিরোধী ছিল, আল্লাহ তা’লা আমার মাধ্যমে ঘোষণা করান— ‘লাইউমায়িকান্নাহুম’ আল্লাহ তা’লা তাদেরকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিবেন। একদিকে তো এই ঘোষণা প্রকাশিত হয়েছে যে, “কে আছে, যে খোদার কাজে প্রতিবন্ধক হতে পারে” এবং অন্যদিকে এই ঘোষণা করে দেয়া হয় যে, আল্লাহ তা’লা সেসকল লোককে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিবেন এবং তাদের জামা’তকে খণ্ডবিখণ্ড করে দিবেন। অতএব খোদা তা’লা নিজ অনুগ্রহ দ্বারা এমন অবস্থা সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে, তিনি শুধু আমাদেরকে আমাদের অবস্থা সামলানোর তৌফিক-ই দান করেন নি, বরং বাইরের জামা’তকেও শক্তিশালী করার সামর্থ্য দিয়েছেন। সেসময় লাহোরী গ্রুপ নিজেদের সম্পর্কে প্রকাশ্যে ঘোষণা করত যে, আমাদের সঙ্গে জামা’তের ৯৫ ভাগ রয়েছে এবং তার সাথে মাত্র ৫ ভাগ রয়েছে। কিন্তু এরপর আল্লাহ তা’লা আমাদেরকে শক্তি প্রদান করতে শুরু করেন এবং এমন উলামা তিনি নিজ অনুগ্রহবলে আমাকে দান করেছেন যারা আমার নির্দেশে বিদেশে গিয়েছেন এবং তাঁরা সেখানে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর নাম পৌঁছিয়েছেন। ইতঃপূর্বে শুধুমাত্র আফগানিস্তান একমাত্র এমন দেশ ছিল যেখানে গুরুত্ব সহকারে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর নাম পৌঁছেছিল। যথারীতি অন্য কোনো দেশে জামা’ত প্রতিষ্ঠিত ছিল না। হযরত খলীফা আউয়াল-এর যুগে খাজা কামাল উদ্দীন সাহেব নিঃসন্দেহে ইংল্যান্ডে গিয়েছেন, কিন্তু সেখানে তিনি আহমদীয়াতের নাম উল্লেখ করাকে মৃত্যুযোগ্য অপরাধ আখ্যা দিয়ে দেয়। এজন্য তার মাধ্যমে ইংল্যান্ডে যে মিশন প্রতিষ্ঠা হয়, তা আহমদীয়াতের প্রচার ও প্রসারের কারণ হয় নি। যদি নাম ছড়ায় তবে তা খাজা সাহেবের, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর নয়। মোটকথা, বিদেশের মধ্যে আফগানিস্তান ব্যতীত অন্য কোনো দেশ এমন ছিল না যেখানে আমার খিলাফতের পূর্বে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর নাম পৌঁছায়। কিন্তু যখন আমার যুগ আসল তখন আল্লাহ তা’লা আমার মাধ্যমে (১) শ্রীলংকা, (২) মরিশাস, (৩) সুমাত্রা, (৪) জাভা, (৫) Straits Settlements [মালায়াতে ইংল্যান্ডের সাবেক আভিজাত্যময় নতুন বসতি। ১৮২৬-১৮৫৮ সন পর্যন্ত ‘ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী’ পিনাঙ্গ, মিলকা এবং

সিঙ্গাপুরকে এক ব্যবস্থাপনামূলক অংশ হিসাবে সামলে রেখেছে। পরবর্তীতে কিছুদিনের জন্য ‘ইন্ডিয়া অফিস’ ব্যবস্থাপনাকে নিজের হাতে নিয়ে নেয়। ১৮৬৭ সনে এই নতুন বসতি স্থাপন করা হয় এবং ১৯৪৬ সনে সমাপ্তি ঘটানো হয়। বর্তমানে সিঙ্গাপুর একটি পৃথক কলোনী। কিন্তু বাকি অংশ মালায়ার মিত্রত্বে शामिल হয়ে গিয়েছে। (উর্দু জামে এনসাইক্লোপিডিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৪১, প্রকাশকাল- লাহোর, ১৯৮৭)

(৬) চীন, (৭) জাপান, (৮) বুখারা, (৯) রাশিয়া, (১০) ইরান, (১১) ইরাক, (১২) সিরিয়া, (১৩) ফিলিস্তিন, (১৪) মিশর, (১৫) সুদান, (১৬) আবিসিনিয়া, (১৭) মরক্কো, (১৮) সিয়েরালিয়ন, (১৯) নাইজেরিয়া, (২০) গোল্ড কোস্ট, (২১) নাটাল [নাটাল পূর্ব-দক্ষিণ আফ্রিকার একটি প্রদেশ। ১৮৩৭ সনে ‘বুইয়ার’ স্থানান্তর হয়ে ‘নাটাল’ পৌছায় এবং ‘যুলু’ গোত্রকে ১৮৩৮ সনে পরাজিত করে গণপ্রজাতান্ত্রিক নাটাল রাষ্ট্রের ভিত্তি রচিত হয়। ১৮৪২ সনে ইংল্যান্ড নাটালকে সংযুক্ত করে নেয়। ১৮৫৬ সনে এই আভিজাত্যময় নতুন বসতি স্থাপিত হয় এবং ১৮৯৭ সনে পোল্যান্ডকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯১০ সনে এটা দক্ষিণ আফ্রিকার প্রদেশ হয়। (উর্দু জামে এনসাইক্লোপিডিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭০৯, লাহোর ১৯৮৮ইং)

(২২) ইংল্যান্ড, (২৩) জার্মানি, (২৪) স্পেন, (২৫) ফ্রান্স, (২৬) ইতালি, (২৭) হাঙ্গেরী, (২৮) গ্রীস, (২৯) আলবেনিয়া, (৩০) পোল্যান্ড, (৩১) চেকোস্লোভাকিয়া [বর্তমান চেক প্রজাতন্ত্র ও স্লোভেনিয়া], (৩২) যুগোস্লাভিয়া (৩৩) ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা, (৩৪) আর্জেন্টিনা এবং অনুরূপভাবে অন্যান্য আরো এলাকায় তবলীগে ইসলাম ও আহমদীয়াত প্রসার লাভ করে এবং হাজার হাজার খ্রিষ্টান আমার মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করে। ফালহামদুলিল্লাহি ‘আলা যালিকা।

এইভাবে আমার মাধ্যমে ইসলাম ও আহমদীয়াতের যে তবলীগ হয়েছে তা সমস্ত দুনিয়াকে পরিবেষ্টন করে নেয়। এর মধ্যে কিছুস্থান এমন আছে যেখানে খোদা তা’লার ফযলে বড়ো বড়ো জামা’ত পাওয়া যায়। সুতরাং ইংল্যান্ডে আমাদের বড়ো জামা’ত আছে। অনুরূপভাবে ইতালিতে জামা’তের সদস্য পাওয়া যায়। তারা নিজেদের পত্রিকা বের করে এবং আরব দেশগুলোতে আহমদীয়াতের প্রচারকাজ অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা ও নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন করে। অনুরূপভাবে মিশরেও আমাদের জামা’ত পাওয়া যায়। আর এখন তো

সুদান ও আবিসিনিয়াতেও গুটি কয়েক আহমদী খোদা তা'লার ফযলে পাওয়া যায়। পশ্চিম আফ্রিকায় আমাদের এত বড়ো জামা'ত প্রতিষ্ঠিত আছে যে এর সংখ্যা ৭৫ হাজারের কাছাকাছি হয়ে গিয়েছে। মোটকথা, আমার যুগেও আমার মাধ্যমে পৃথিবীর চতুর্দিকে আহমদীয়াত প্রসার লাভ করেছে। শত-সহস্র মানুষ যারা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর নামকে ভালোবাসত, যারা রসূলে করীম (সা.)-এর নামকে ভালোবাসত, তারা ইসলামের শত্রু, খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারী অথবা মূর্তিপূজারি ছিল, আল্লাহ তা'লা তাদেরকে আমার মাধ্যমে ইসলাম ধর্মে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর এভাবে আমাকে সেই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা দানকারী বানিয়েছেন যা 'মুসলেহ মাওউদ' সম্পর্কে করা হয়েছিল, সে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রসিদ্ধি লাভ করবে এবং জাতিসমূহ তাঁর নিকট হতে বরকত লাভ করবে। ['আল-মাওউদ' শীর্ষক বক্তৃতা, আনোয়ারুল উলূম, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ৫৭৬-৫৭৮]

‘সে বন্দিদের মুক্তির কারণ হবে’

“এক ভবিষ্যদ্বাণী এই করা হয়েছিল যে, ‘সে বন্দিদের মুক্তির কারণ হবে’। আল্লাহ তা'লা এই ভবিষ্যদ্বাণীকেও আমার মাধ্যমে পূর্ণতা দান করেছেন। প্রথমত, এভাবে আল্লাহ তা'লা আমার মাধ্যমে সে জাতিসমূহকে পথপ্রদর্শন করেছেন যাদের প্রতি মুসলমানদের কোনো দ্রুক্ষেপ ছিল না এবং তারা অত্যন্ত লাক্ষিত ও নিঃস্ব অবস্থায় ছিল। তারা বন্দি জীবনযাপন করত। তাদের মধ্যে না শিক্ষা পাওয়া যেত, না তাদের সমাজ ব্যবস্থা উচ্চ পর্যায়ে ছিল, না তাদের তরবিরের কোনো ব্যবস্থা ছিল। যেমন, আফ্রিকান এলাকা। পৃথিবীবাসী তাদেরকে পৃথক করে ফেলে রেখেছিল এবং তারা শুধু বিনামূল্যে কাজ করা ও সেবা-শুশ্রূষার কাজে আসত। এইমাত্র পশ্চিম আফ্রিকার এক প্রতিনিধি আপনাদের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে। সে দেশের কিছু লোক তো শিক্ষিত কিন্তু দেশের মধ্যে অধিক সংখ্যায় এমন লোক পাওয়া যায় যারা কাপড়ও পরিধান করত না। উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াতো। আল্লাহ তা'লার ফযলে এমন জর্বেল লোকদের মধ্যে সহস্রাধিক লোক আমার মাধ্যমে ইসলামে প্রবেশ করেছে। সেখানে অধিকহারে খ্রিষ্টানদের রাজত্ব ছিল। কিন্তু আমার নির্দেশনা অনুযায়ী সেই এলাকাসমূহে আমাদের মোবাল্লেগগণ গিয়েছেন। তাঁরা সহস্রাধিক মুশরেক মানুষকে মুসলমান বানিয়েছেন এবং সহস্রাধিক লোককে খ্রিষ্টান হতে

ইসলামের দিকে টেনে নিয়ে এসেছেন। খ্রিষ্টানদের ওপর এর এরূপ প্রভাব বিদ্যমান যে, ইংল্যান্ডে পাদ্রীদের এক অনেক বড়ো আঞ্জুমান আছে যা রাজকীয় ক্ষমতা রাখে এবং সরকারের পক্ষ থেকে খ্রিষ্টানধর্মের প্রচার এবং তার পর্যবেক্ষণের জন্য নির্ধারিত আছে। তারা এই উদ্দেশ্যে একটি কমিশন নির্ধারণ করেছিল যারা এই বিষয়ে রিপোর্ট করবে যে, পশ্চিম আফ্রিকায় খ্রিষ্টান ধর্মের উন্নতি কেন থেমে গিয়েছে। সেই কমিশন তাদের আঞ্জুমানের সামনে যে রিপোর্ট উপস্থাপন করে তাতে এক ডজনেরও বেশি জায়গায় আহমদীয়াতের বিষয় আসে এবং লিখেন, এই জামা'ত খ্রিষ্টধর্মের উন্নতিকে থামিয়ে দিয়েছে। মূলত পশ্চিম আফ্রিকা ও আমেরিকা উভয় দেশেই হাবশী গোষ্ঠী অধিকহারে ইসলাম গ্রহণ করেছে। এইভাবে আল্লাহ তা'লা এই জাতিসমূহে তবলীগের সুযোগ দান করে আমাকে এই বন্দিদের মুক্তির কারণ বানিয়েছেন এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার তৌফিক দান করেছেন।” [‘আল-মাওউদ’ শীর্ষক বক্তৃতা, আনোয়ারুল উলুম, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ৫৮১-৫৮২]

‘খোদার ছায়া তার শিরে থাকবে’

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, ষষ্ঠ সংবাদ এই দেয়া হয়েছিল যে, ‘খোদার ছায়া তার শিরে থাকবে’। অর্থাৎ আল্লাহ তা'লা তাঁর সুরক্ষাকারী ও সাহায্যকারী হবেন এবং তাঁকে শত্রুর আক্রমণ হতে সুরক্ষিত রাখবে। এখন দেখো! আল্লাহ তা'লা কীভাবে এই ইলহামের সত্যতায় লাগাতার আমাকে সুরক্ষা ও সাহায্য করেছে। আমার প্রতি এখন পর্যন্ত এমন কোনো ইলহাম হয় নি যার ভিত্তিতে আমি বলতে পারি যে, আমি মানুষের হাত দ্বারা মারা যাব না। কিন্তু নিঃসন্দেহে আমি এই বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার কাজ অবশিষ্ট আছে সে সময় পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি আমাকে হত্যা করতে পারবে না। আমার সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে এমন ঘটনা সংঘটিত হয়েছে যে, মানুষ আমাকে ধ্বংস করতে চেয়েছে কিন্তু আল্লাহ তা'লা নিজ অনুগ্রহবলে তাদের আক্রমণ হতে আমাকে সুরক্ষিত রেখেছেন।

প্রথম ঘটনা:

বিগত এক জলসার ঘটনা। আমি বক্তৃতা করছিলাম। আর আমার অভ্যাস যে, বক্তৃতা করতে করতে গরমাগরম চায়ের এক-দুই ঢোক পান করি যেন গলা ঠিক থাকে। এরইমধ্যে জলসাগাহ থেকে কোনো এক ব্যক্তি মিষ্টির এক

পেয়ালা দেয় এবং বলে, এটা দ্রুত হযরত সাহেব পর্যন্ত পৌঁছে দিন, কেননা হুযূর বজ্রতা করতে করতে দুর্বল হয়ে যাচ্ছেন। অতএব একজন দ্বিতীয়জনকে, দ্বিতীয়জন তৃতীয়জনকে, তৃতীয়জন চতুর্থজনকে-এভাবে সেই পেয়ালা হাতে হাতে পৌঁছানো শুরু করে। এমনকি এরূপে মঞ্চ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। মঞ্চে মঞ্চে হঠাৎ কারো খেয়াল হলে তিনি সতর্কতাস্বরূপ একটু স্বাদ গ্রহণ করেন। এতে তার জিহবা বিস্মাদ হয়ে যায়। তখন জানা যায় যে, এতে বিষ মিশানো আছে। এখন যদি সেই মিষ্টি আমার পর্যন্ত পৌঁছে যেত আর খোদা না করুন তা চেষ্টে ফেলতাম তাহলে অন্য কোনো প্রভাব পড়ুক বা না-ই পড়ুক, এতটা অবশ্যই হতো যে, বজ্রতা করা বন্ধ হয়ে যেত।

দ্বিতীয় ঘটনা:

দ্বিতীয় ঘটনাটি হলো, আহরারীদের উপদ্রবের দিনগুলোতে আমি একদা আমার কুঠি ‘দারুল হামদ’-এ ছিলাম। একজন আফগান ছেলে আসে এবং সে বলে পাঠায় যে, আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই। আমার ছোটো বাচ্চা ভিতরে এসে বলে, একজন ছেলে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে এবং সে সাক্ষাৎ করতে চায়। আমি বাইরে বেরই হচ্ছিলাম এমন সময় আমি শোরগোল শুনতে পাই। আমি বিস্মিত হয়ে ভাবি, এটা কিসের শোরগোল! অতএব আমি অনুসন্ধান করে জানতে পারি যে, এই ছেলে হত্যার উদ্দেশ্য এসেছিল। কিন্তু আব্দুল আহাদ সাহেব তাকে পাকড়াও করেন এবং তার নিকট হতে একটি ছুরিও পেয়েছেন। আমি আব্দুল আহাদ সাহেবকে জিজ্ঞেস করি, তুমি কীভাবে বুঝতে পারলে যে সে হত্যার উদ্দেশ্যে এসেছে? তিনি বলেন, এই ছেলে পাঠান ছিল এবং আমরা পাঠানদের অভ্যাস ভালোভাবে জানি। যখন সে কথা বলছিল তখন কথা বলতে বলতে সে নিজের পা এমনভাবে নাড়া দিয়েছে যে আমি সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে গিয়েছি সে ছুরি লুকিয়ে রেখেছে। অতএব আমি হাত দিলে ছুরি বের হয়ে আসে। পুলিশ তার ওপর মোকদ্দমাও চালিয়েছিল এবং সম্ভবত সে স্বীকার করেছিল যে, আমি হত্যার উদ্দেশ্যেই কাদিয়ান এসেছিলাম।

(এই পর্যায়ে হুযূর বলেন, ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়্যদ হাবীবুল্লাহ শাহ সাহেব বলেন, সে সেই জেলখানায় বন্দি ছিল, যেখানে আমি অফিসার হিসাবে ছিলাম। সে বলেছিল, আমি প্রথমে ‘ধর্মশালা’ পর্যন্ত উনাকে হত্যা করার জন্য গিয়েছিলাম। কিন্তু আমি সফল হইনি। অবশেষে আমি কাদিয়ান যাই এবং ধরা পড়ে যাই)

[‘আল-মাওউদ’ শীর্ষক বক্তৃতা, আনোয়ারুল উলুম, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ৫৯৫-৫৯৭] [২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা অবলম্বনে]

‘সে মহিমাম্বিত, মাহাত্ম্য ও সম্পদের অধিকারী হবে’

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, এরপর লেখা আছে, ‘সে মহিমাম্বিত, মাহাত্ম্য ও সম্পদের অধিকারী হবে’ এটি ভবিষ্যদ্বাণীর বাক্য আর স্বপ্নেও দেখানো হয়েছে, একটি জাতির মাঝে আমি এক ব্যক্তিকে নেতা মনোনীত করি আর যেভাবে এক শক্তিশালী বাদশাহ তার অধীনস্থকে আদেশ দেয় অনুরূপভাবে আমিও বলি, হে আব্দুশ শাকুর! তোমার দেশ যেন স্বল্পতম সময়ের মধ্যে তৌহিদের প্রতি ঈমান আনে, শিরক পরিত্যাগ করে, মহানবী (সা.)-এর শিক্ষার ওপর আমল করে এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর নির্দেশাবলীকে নিজেদের দৃষ্টিতে রাখে- এগুলো হলো, আমার পক্ষ থেকে তোমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব। এটি মহামহিমাম্বিত এবং মহান সত্তারই উক্তি হতে পারে যা স্বপ্নে আমার মুখে জারি করা হয়েছে। (খুতবাতো মাহমুদ, ২৫তম খণ্ড, পৃ. ৬৯-৭১, খুতবাতো জুমুআ, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪)

‘আমরা তার মাঝে আমাদের রুহ ফুৎকার করব’

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লিখিত এ কথাটি এর প্রতিই ইঙ্গিত করে যে, তার প্রতি ঐশীবাণী অবতীর্ণ হবে আর স্বপ্নে এর-ও উল্লেখ রয়েছে। অতএব ঐশী ইচ্ছার অধীনে স্বপ্নে আমার উপলব্ধি হয়, এখন আমি কথা বলছি না বরং খোদা তা’লার পক্ষ থেকে ইলহামী ভাষায় আমাকে কথা বলানো হচ্ছে। তাই স্বপ্নের এ অংশে ভবিষ্যদ্বাণীর এ কথাগুলোর পূর্ণতার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে, আমরা তার মাঝে আমাদের রুহ ফুৎকার করব। (খুতবাতো মাহমুদ, ২৫তম খণ্ড, পৃ. ৬৯-৭১, খুতবাতো জুমুআ, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪)

এরপর তিনি (রা.) বলেন, আল্লাহ তা’লা স্বীয় ফিরিশতাদের মাধ্যমে আমাকে পবিত্র কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন এবং আমার মাঝে তিনি এমন যোগ্যতা সৃষ্টি করেছেন যে, যেভাবে কেউ কোনো ধনভাণ্ডারের চাবি পেয়ে যায়, ঠিক একইভাবে আমি পবিত্র কুরআনের জ্ঞানভাণ্ডারের চাবি লাভ করেছি। পৃথিবীতে এমন কোনো আলেম নাই, যে আমার সামনে আসবে আর আমি তার কাছে

পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারব না। তিনি (রা.) লাহোরে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, এটি লাহোর শহর। এখানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, বিভিন্ন কলেজও খোলা হয়েছে। শাস্ত্রীয় জ্ঞানের বড়ো বড়ো বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ এখানে রয়েছেন। আমি তাদের সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলছি, পৃথিবীর যে-কোনো জ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তি আমার সামনে আসুক, পৃথিবীর যে-কোনো অধ্যাপক আমার সামনে আসুক, পৃথিবীর যে কোনো বিজ্ঞানী আমার সামনে এসে দাঁড়াক এবং সে তার জ্ঞানের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের ওপর আক্রমণ করে দেখুক, আল্লাহ তা'লার ফযলে আমি তাকে এমন দাঁতভাঙা জবাব দিতে পারি যে, পৃথিবীর মানুষ স্বীকার করতে বাধ্য হবে, তার আপত্তির খণ্ডন হয়েছে। আর আমি দাবির সাথে বলছি, আমি খোদা তা'লার কালাম হতেই তার উত্তর দিব এবং পবিত্র কুরআনের আয়াতের আলোকেই তার আপত্তি খণ্ডন করে দেখাব। (মু'আয় হি মুসলেহ মাওউদ কি পেশগুয়ী কা মিসদাক হুঁ, আনোয়ারুল উলূম, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ২২৭)

তিনি (রা.) “আহমদীয়াতের পয়গাম” নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন যাতে ‘আহমদীয়াত কী’ মর্মে প্রশ্নকারীদের প্রশ্নের উত্তর রয়েছে। এই প্রবন্ধের একস্থলে তিনি বলেন, লেখক স্বয়ং ফিরিশতাদের নিকট থেকে অনেক কিছু শিখেছে। একবার এক ফিরিশতা আমাকে সূরা ফাতিহার তফসীর শিখান আর তখন থেকে নিয়ে অদ্যবধি সূরা ফাতেহার জ্ঞান এত ব্যাপকভাবে আমার নিকট উন্মোচিত হয়েছে যে, এর কোনো সীমা নাই। আমি দাবির সাথে বলছি, অন্য যে-কোনো ধর্মের লোক তার পুরো ধর্মগ্রন্থ হতে যে পরিমাণ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বর্ণনা করতে পারবে খোদার ফযলে তার চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞান আমি শুধু সূরা ফাতিহা হতেই বর্ণনা করতে পারি। বহুদিন ধরে আমি বিশ্ববাসীকে এই চ্যালেঞ্জ দিয়ে আসছি কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে নি। আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ, খোদার একত্ববাদের প্রমাণ, রিসালতের আবশ্যকতা, পরিপূর্ণ শরীয়তের লক্ষণাবলী ও মানবমণ্ডলীর জন্য এর প্রয়োজনীয়তা, দোয়া, তকদীর, হাশর-নশর, বেহেশত, দোযখ, এই সমস্ত বিষয়ের ওপর সূরা ফাতিহার মাধ্যমে এমনভাবে আলোকপাত হয় যে, অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের শত শত পৃষ্ঠা পাঠ করলেও ততটা সম্ভব নয়। (আহমদীয়াত কা পয়গাম, আনোয়ারুল উলূম, ২০তম খণ্ড, পৃ. ৫৬৭)

এরপর তিনি (রা.) বলেন, খিলাফতের পদে অধিষ্ঠিত হবার পর আল্লাহ তা'লা

কুরআনের জ্ঞান এত ব্যাপকভাবে আমার কাছে উন্মোচন করেছেন যে, এখন কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতে মুসলেমা আমার বইপুস্তক পাঠ করতে এবং তা থেকে উপকৃত হতে বাধ্য। এমন কোনো ইসলামী বিষয় আছে, যা আল্লাহ তা'লা আমার মাধ্যমে সবিস্তারে উন্মোচন করেন নি? নবুয়ত, কুফর, খিলাফত, তকদীর, কুরআনে নিহিত মানবজীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়াদির উদ্ঘাটন এবং ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী রাজনীতি এবং ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে গত তেরোশ বছর ধরে তেমন বিস্তারিতভাবে কোনো প্রবন্ধ ছিল না। আল্লাহ তা'লা আমাকে ইসলামের এ সেবা করার তৌফিক দিয়েছেন এবং আল্লাহ তা'লা আমার মাধ্যমেই এ বিষয় সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে অন্তর্নিহিত তত্ত্বজ্ঞানের দ্বার উন্মোচন করেছেন, যা আজ শত্রুমিত্র সকলেই নকল করছে। আমাকে কেউ লক্ষ বার গালি দিক বা গালমন্দ করুক, যে ব্যক্তিই বিশ্বে ইসলামের শিক্ষা প্রচার করতে চাইবে তাকে অবশ্যই আমার দ্বারস্থ হতে হবে। সে পয়গামী (লাহোরী জামা'তের সদস্য-অনুবাদক) হোক বা মিশরীয় হোক, আমার অনুগ্রহের গঞ্জির বাইরে তারা কোনোক্রমেই যেতে পারবে না। তাদের সন্তানসন্ততিরা যখনই ইসলামের সেবা করার ইচ্ছা করবে আমার বইপুস্তক পড়তে এবং কাজে লাগাতে বাধ্য হবে। বরং আমি গর্ব না করেই বলতে পারি, এই ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি তথ্য আমার মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে এবং হচ্ছে। অতএব এরা আমাকে যা-ই বলুক না কেন, যত ইচ্ছা গালি দিক না কেন তারা যদি কুরআনের জ্ঞান লাভ করতে চায় তবে আমার মাধ্যমেই লাভ করতে পারবে এবং বিশ্ববাসী তাদেরকে একথা বলতে বাধ্য হবে যে, হে নির্বোধেরা! তোমাদের থলিতে যা কিছু আছে তা তো তোমরা তার কাছ থেকেই নিয়েছ। অতএব কোন মুখে তার বিরোধিতা করছ? (খিলাফতে রাশেদা, আনোয়ারুল উলুম, ১৫তম খণ্ড, পৃ. ৫৮৭-৫৮৮)

‘সে তিনকে চারে পরিণত করবে’

এরপর ‘তিনকে চার করা’ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, এ কথাও সঠিক নয় যে, তিনকে চার করার লক্ষণ আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ তা'লার ফযলে আমি বিভিন্ন আঙ্গিকে তিনকে চার করেছি।

প্রথমত, এটি যেভাবে ঘটেছে তা হলো, আমার পূর্বে মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব, মির্যা ফযল আহমদ সাহেব এবং মির্যা বশীর আউয়াল জন্মগ্রহণ করেন আর চতুর্থত আমি। আর দ্বিতীয়ত, আমার পর হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-

এর তিনজন পুত্র জন্ম নিয়েছেন আর এভাবে আমি তাদের তিনকেও চার করেছি অর্থাৎ (কনিষ্ঠ থেকে জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে) মির্যা মুবারক আহমদ, মির্যা শরীফ আহমদ, মির্যা বশীর আহমদ আর চতুর্থ ছিলাম আমি। আর তৃতীয়ত, এভাবেও আমি তিনকে চারে পরিণত করেছি যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জীবিত সন্তানদের মধ্যে আমরা তিন ভাই, অর্থাৎ আমি, মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এবং মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি ঈমান রাখার কারণে তাঁর আধ্যাত্মিক সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব তাঁর আধ্যাত্মিক বংশধরের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। খলীফাতুল মসীহ আউয়ালের প্রতি তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর যুগে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন নি। কিন্তু হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর একটি স্বপ্ন থেকে বুঝা যেত, আল্লাহ তা'লা তার জন্য হিদায়াত নির্ধারণ করে রেখেছেন। কিন্তু হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এবং তাঁর পর খলীফাতুল মসীহ আউয়ালের যুগে তিনি আহমদীয়াত ভুক্ত হন নি। যখন আমার যুগ আসে তখন আল্লাহ তা'লা এমন ব্যবস্থা করেন যে, তিনি আমার মাধ্যমে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন। ... আর এভাবে আল্লাহ তা'লা আমাকে তিনকে চার-এ পরিণতকারী বানিয়েছেন। কেননা প্রথমে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বংশধরদের মধ্যে আমরা কেবল তিন ভাই-ই ছিলাম, এরপর তিন থেকে চার হয়ে যাই। [তিনি (রা.) বলেন,] এরপর এ দৃষ্টিকোণ থেকেও আমি তিনকে চার করেছি, আমি ইলহামের চতুর্থ বছর জন্মগ্রহণ করি। ১৮৮৬ সনে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এ ভবিষ্যদ্বাণীটি করেছিলেন আর ১৮৮৯ সনে আমার জন্ম হয় অর্থাৎ ১৮৮৬ এক, ১৮৮৭ দুই, ১৮৮৮ তিন এবং ১৮৮৯ চার। এর অর্থ, তিনকে চার করা সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে যেন এ সংবাদও দেয়া হয়েছিল যে, আমার জন্ম ভবিষ্যদ্বাণীর চতুর্থ বছরে হবে আর এভাবেই আমি তিনকে চারে পরিণত করব আর এমনটিই হয়েছে এবং সে অনুসারেই আমার জন্ম হয়েছে। [২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা অবলম্বনে]

‘ঐশী গৌরব ও প্রতাপ প্রকাশের কারণ হবে’

তিনি (রা.) বলেন, পঞ্চম সংবাদ যা দেয়া হয়েছিল তা হচ্ছে, তার আবির্ভাব ঐশী গৌরব এবং প্রতাপ প্রকাশের কারণ হবে। এটিও আমার যুগে পূর্ণ

হয়েছে। অতএব আমার খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হতেই প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ হয় আর এখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে, যার মাধ্যমে ঐশীগৌরব এবং প্রতাপ প্রকাশ পাচ্ছে। সম্ভবত কেউ বলতে পারে, এখনও লক্ষ লক্ষ মানুষ বেঁচে আছে। এই সকল যুদ্ধকে যদি তুমি নিজের সত্যতার পক্ষে উপস্থাপন করতে পার তবে প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তিই বলতে পারে, এই যুদ্ধ আমার সত্যতার প্রমাণ। এ সম্পর্কে আমার উত্তর হচ্ছে, এখন পর্যন্ত জীবিত লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষকে যদি পূর্ব থেকেই এ যুদ্ধের আগাম সংবাদ দেয়া হয়ে থাকে তবে এটি প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তির সত্যতার আলামত হতে পারে। কিন্তু তাদেরকে যদি পূর্বে এ যুদ্ধের সংবাদ আগাম দেয়া না হয় তবে যাকে এসব যুদ্ধের বিস্তারিত সংবাদ আগাম দেয়া হয়েছে, তারই জন্য এ ঐশীপ্রতাপ প্রকাশিত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। ('আল-মাওউদ' শীর্ষক বক্তৃতা, আনোয়ারুল উলূম, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ৬২৭)

কসম খেয়ে 'মুসলেহ মাওউদ' দাবির ঘোষণা ও বিরুদ্ধবাদীদেরকে মোবাহেলার আমন্ত্রণ

“আমি বলছি এবং খোদা তা'লার কসম খেয়ে বলছি, আমিই 'মুসলেহ মাওউদ' সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নকারী। আর আমাকেই আল্লাহ তা'লা সেই ভবিষ্যদ্বাণীর লক্ষ্যস্থল বানিয়েছেন, যা এক আগমনকারী 'মাওউদ' সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন। যে ব্যক্তি মনে করে, আমি ধোঁকাবাজির আশ্রয় নিয়েছি অথবা এ বিষয়ে আমি মিথ্যার পথ অবলম্বন করেছি, সে আসুক এবং আমার সঙ্গে মোবাহেলা করুক অথবা আল্লাহ তা'লার ভয়ংকর শাস্তির কসম খেয়ে ঘোষণা করে দিক যে, খোদা তাকে বলেছেন, আমি মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছি। অতঃপর আল্লাহ তা'লা নিজেই তাঁর ঐশী নিদর্শন দ্বারা ফয়সালা করে দিবেন যে, কে মিথ্যাবাদী এবং কে সত্যবাদী।

আর যদি সে বলে, স্বপ্ন তো সত্য, যেভাবে মিশরী ভদ্রলোক বলেছেন। তবে এর সত্যতার ওপর সে আরো প্রবন্ধ লিখুক। আমি তার এই প্রবন্ধের উত্তর দিব। আর আমি বিশ্বাস রাখি, যদি সে এই মোকাবিলায় আসে তবে এমনভাবে মুখ খুবড়ে পড়বে যে, জীবনভর স্মরণ রাখবে।

মোটকথা, আল্লাহ তা'লার অনুগ্রহ ও দয়ার ফলশ্রুতিতে সেই ভবিষ্যদ্বাণী যার পূর্ণতা লাভের জন্য এক দীর্ঘ সময় যাবৎ অপেক্ষা করা হচ্ছিল, আল্লাহ তা'লা

তাঁর সম্পর্কে নিজ ইলহাম ও নিদর্শনের মাধ্যমে আমাকে জানিয়েছেন যে, সেই ভবিষ্যদ্বাণী আমার সন্তায় পূর্ণতা লাভ করেছে এবং এখন ইসলামের শত্রুদের ওপর খোদা তা'লা 'হুজ্জত' (অকাট্য দলিল-প্রমাণ) পূর্ণ করে দিয়েছেন এবং তাদের ওপর এই বিষয় স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ইসলাম খোদা তা'লার সত্যধর্ম, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.) খোদা তা'লার সত্য রসূল এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) খোদা তা'লার সত্য প্রেরিত পুরুষ। মিথ্যুক সেসমস্ত লোক যারা ইসলামকে মিথ্যা আখ্যা দেয়। মিথ্যাবাদী হচ্ছে সেসমস্ত লোক যারা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-কে মিথ্যাবাদী বলে। খোদা তা'লা এই সুমহান ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে ইসলাম ও রসূলে করীম (সা.)-এর সত্যতার এক জীবন্ত প্রমাণ মানুষের সামনে উপস্থাপন করে দিয়েছেন।

নিঃসন্দেহে আপনারা আনন্দিত হতে পারেন যে, খোদা তা'লা এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা দান করেছেন, বরং আমি বলছি, আপনাদের অবশ্যই আনন্দিত হওয়া উচিত, কেননা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) স্বয়ং লিখেছেন, 'তোমরা আনন্দিত হও এবং আনন্দে উচ্ছ্বসিত হও, কেননা এরপর এখন আলো আসবে।' সুতরাং আমি তোমাদেরকে আনন্দিত হতে বিরত থাকতে বলছি না। আমি তোমাদেরকে আনন্দে উচ্ছ্বাসিত হতে বারণ করছি না। নিঃসন্দেহে তোমরা আনন্দ উদ্‌যাপন করো এবং আনন্দে উচ্ছ্বসিত হও। কিন্তু আমি বলছি, এই আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের মাঝে তোমরা নিজেদের দায়িত্বাবলীকে ভুলে যেও না। যেভাবে খোদা তা'লা আমাকে স্বপ্নে দেখিয়েছিলেন, আমি দ্রুত দৌড়ে যাচ্ছি এবং মাটি আমার পদতলে সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে।

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'লা ইলহামের মাধ্যমে আমার সম্পর্কে এই সংবাদ প্রদান করেছেন যে, আমি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি লাভ করব। সুতরাং আমার জন্য এটাই নির্ধারিত যে, আমি দ্রুতগতিতে নিজ পায়ে উন্নতির ময়দানে অগ্রসর হতে থাকব। কিন্তু এরই সাথে আপনাদের প্রতিও এই দায়িত্ব অর্পিত হয় যে, নিজেদের পথচলাকে দ্রুত করুন এবং নিজেদের অলসতা ত্যাগ করুন। বরকতমণ্ডিত সে, যে আমার কদমের সাথে নিজ কদম মিলায় এবং দ্রুতগতিতে উন্নতির ময়দানে দৌড়ে চলে যেতে থাকে। আর আল্লাহ তা'লা সেই ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করুন যে অলসতা ও অবহেলার দরুন নিজ কদমকে দ্রুতগতি দান করে না এবং ময়দানে অগ্রসর হবার পরিবর্তে মুনাফিকদের মতো নিজ কদমকে পিছু হটিয়ে নেয়। তোমরা যদি উন্নতি করতে চাও, যদি

তোমরা নিজেদের দায়িত্বাবলীকে সঠিকভাবে অনুধাবন করো— তবে আমার সঙ্গে অগ্রসর হতে থাকো যেন আমরা কুফরের হৃদপিণ্ডে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর পতাকা গেঁড়ে দেই এবং মিথ্যাকে চিরতরে পৃথিবীর বুক হতে মিটিয়ে দেই। আর ইনশাআল্লাহ এমনটি-ই হবে। পৃথিবী ও আকাশ টলতে পারে কিন্তু খোদা তা'লার কথা কখনো টলতে পারে না।” [‘আল-মাওউদ’ শীর্ষক বক্তৃতা, আনোয়ারুল উলূম, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ৬৪৫-৬৪৯]

একনজরে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর অসামান্য অবদান

আন্তর্জাতিক বলয়ে অবদান:

- * শতের অধিক জ্ঞানভাণ্ডার সংবলিত বইপুস্তক ও পত্রপত্রিকা প্রকাশ।
- * পবিত্র কুরআনের তফসীর হিসাবে তফসীরে কবীর ও তফসীরে সগীর প্রণয়ন।
- * বিরোধীদের পক্ষ থেকে তাঁর (রা.) তফসীরের গুণকীর্তন।
- * বিরোধীদেরকে বহুবার তফসীরে কুরআনের চ্যালেঞ্জ প্রদান।
- * ১৬টি ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ প্রকাশ।
- * ঐশী সাহায্যে ধর্মীয় বিষয়ের অভাবনীয় ব্যাখ্যা এবং অগণিত অদৃশ্যের খবর প্রকাশ— যা ‘রুইয়া ও কুশুফে সাইয়েয়েদনা মাহমুদ’ নামে প্রকাশিত।
- * কয়েকটি দেশে মহিলা ও পুরুষের জন্য ধর্মীয় শিক্ষার স্থায়ী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা।
- * ২৪টি দেশে ৭৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা।
- * আহমদীয়াতের কেন্দ্র কাদিয়ান ও রাবওয়াতে উন্নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা।

মসজিদ নির্মাণ:

- * উপমহাদেশের বাইরে ৩১৮ টি মসজিদ নির্মাণ।
- * পৃথিবীর বড়ো বড়ো এবং গুরুত্বপূর্ণ দেশসমূহে মসজিদ ও মিশন হাউজ প্রতিষ্ঠা যার মাঝে আমেরিকা, লন্ডন, ইন্দোনেশিয়া, জার্মানি, হল্যান্ড, ডেনমার্ক এবং আফ্রিকার দেশসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
- * কাদিয়ান ও রাবওয়াতে মসজিদ নির্মাণ এবং সম্প্রসারণ।

* মসজিদ নির্মাণের জন্য হাজার বার তাহরীক এবং কতক মসজিদ কেবল মহিলাদের চাঁদায় নির্মিত।

আন্তর্জাতিক দাওয়াতে ইলাল্লাহ স্কিম:

- * ওয়াকফে যিন্দেগীর স্থায়ী ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন।
- * ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা এবং এশিয়ায় দাওয়াতে ইলাল্লাহর ব্যাপক কার্যক্রম।
- * ৪৬টি দেশে আহমদীয়া মিশন হাউজ প্রতিষ্ঠা।
- * ১৬৪ জন ওয়াকফে যিন্দেগীকে প্রবাসে ধর্মসেবার উদ্দেশ্যে প্রেরণ। তাদের অনেকে প্রবাসেই পরলোক গমন করে সেখানেই গোরস্থ হন।
- * বহু রাষ্ট্রপ্রধান এবং গোত্রপ্রধানের কাছে লিখিত ও অডিও আকারে ইসলামের বাণী প্রদান।
- * ১৯১২, ১৯২৪ এবং ১৯৫৫ সালে আরব উপদ্বীপ ও ইউরোপ সফর।
- * সুবিশাল পরিসরে তাঁর লেখনী প্রচার এবং বিভিন্ন দেশ থেকে তাঁর ৪০টি পত্রপত্রিকা প্রকাশ।

জামা'তের ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রতিষ্ঠা:

- * ১৯১৯ সালে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ায় নাযারাত (তথা রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা) প্রতিষ্ঠা।
- * ১৯২২ সালে মজলিসে শূরার (তথা পরামর্শ সভার) স্থায়ী ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা।
- * জামা'তের যিলি তানযীম (তথা উপসংস্থা) প্রতিষ্ঠা। যথা: ১৯২২ সালে লাজনা ইমাইল্লাহ, ১৯৩৮ সালে মজলিস খোদামুল আহমদীয়া এবং ১৯৪০ সালে মজলিস আনসারুল্লাহ প্রতিষ্ঠা।
- * খিলাফত নির্বাচন মজলিস প্রতিষ্ঠা।
- * ১৯১৩ সাল থেকে পত্রিকা 'আল-ফযল' প্রকাশ।
- * হিজরতের পর আহমদীয়াতের কেন্দ্র রাবওয়া প্রতিষ্ঠা এবং আবাসন সৃষ্টি।

স্থায়ী আর্থিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা:

- * আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে সুসংহত ও সুনিপুণ আর্থিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি।
- * ১৯৩৪ সালে তাহরীকে জাদীদের আন্তর্জাতিক ঘোষণা।

* ১৯৫৭ সালে ওয়াকফে জাদীদের তাহরীকের সূচনা।

* ৫২ বছরের খিলাফতকালে বড়ো বড়ো ৫৬টি আর্থিক কুরবানীর তাহরীক।

সুমহান জাতীয় সেবা:

* ১৯৩১ সালে কাশ্মির কমিটির সভাপতি এবং কাশ্মিরের অধিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সাংগঠনিক কার্যক্রম শুরু।

* ১৯৪৮ সালে কাশ্মির ইস্যুতে ফুরকান ব্যাটালিয়ানের মাধ্যমে সুমহান সেবাদান।

* আন্তর্জাতিক বলয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা এবং আরবদের অধিকার প্রতিষ্ঠা বিশেষত ফিলিস্তিন, জর্ডান, তিউনিশিয়া, মরক্কো, লেবানন এবং লিবিয়ার স্বাধীনতার জন্য সরাসরি নিজে এবং চৌধুরী স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ সাহেবের মাধ্যমেও অশেষ চেষ্টাপ্রচেষ্টা।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর জীবনের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা:

* ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬।

* জন্ম ১২ জানুয়ারি ১৮৮৯ সোমবার।

* তাশহীযুল আযহান নামক সমিতি গঠন, ত্রৈমাসিক পত্রিকার প্রকাশনা ও সম্পাদনা, সালানা জলসায় ‘শিরকের মূলোৎপাটন’ বিষয়ে বক্তৃতা ১৯০৬।

* সাপ্তাহিক ‘আল-ফযল’ প্রকাশনা ১৯১৩ সাল।

* খলীফাতুল মসীহ সানী হিসাবে মনোনীত ১৪ মার্চ ১৯১৪ সাল।

* মিনারাতুল মসীহ নির্মাণের কাজ পুনরায় শুরু, লন্ডনে মোবাল্লেগ প্রেরণ ১৯১৫ সাল।

* পবিত্র কুরআনের ইংরেজী ও উর্দু অনুবাদ ও তফসীর প্রকাশ ১৯১৬ সাল।

* আমেরিকায় মোবাল্লেগ প্রেরণ, খিলাফত আন্দোলন ও সহযোগ আন্দোলনে প্রকৃত পথপ্রদর্শন ১৯২০ সাল।

* পশ্চিম আফ্রিকা ও জার্মানিতে মুবাল্লিগ প্রেরণ ১৯২১ সাল।

* মসলিসে গুরা প্রতিষ্ঠা; লাজনা ইমাইল্লাহ হিসাবে মহিলা সংগঠন প্রতিষ্ঠা ১৯২২ সাল।

* মালকানা ক্যাম্পেইনে পথ নির্দেশ, মিশরে মোবাল্লেগ প্রেরণ ১৯২৩ সাল।

* লন্ডন সফর, বক্তৃতা এবং আহমদীয়াত টু ইসলাম নামক পুস্তক প্রকাশ ও বিশ্ব শান্তির সঠিক পথ নির্দেশ; লন্ডন মসজিদের ভিত্তি স্থাপন ১৯২৪ সাল।

- * মেয়েদের জন্য মাদরাসা স্থাপন ১৯২৫ সাল।
- * ধর্মনেতাদের সম্মান প্রতিষ্ঠা ও মুসলমানদের আর্থিক উন্নতির আন্দোলন ১৯২৭ সাল।
- * জামেয়া আহমদীয়া প্রতিষ্ঠা, ‘রঙিলা রসূল’ নামক ইসলাম বিরোধী পুস্তকের জবাবে ‘সীরাতুননবী (সা.) দিবস’ পালনের নির্দেশ এবং ইসলাম সম্বন্ধে সঠিক ধারণা বিস্তারের ব্যবস্থা ১৯২৮ সাল।
- * নুসরত গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা ১৯২৯ সাল।
- * সাইমন কমিশন রিপোর্টের ওপর সমালোচনা এবং গোল টেবিল কনফারেন্সের প্রতিনিধির নিকট পুস্তক প্রেরণ ১৯৩০ সাল।
- * কাশ্মির কমিটির সভাপতি মনোনীত ১৯৩১ সাল।
- * আহরারী নৈরাজ্যের প্রাক্কালে জামা’তকে বিশেষভাবে সুসংহত করণ এবং সুদূরপ্রসারী ব্যবস্থা হিসাবে তাহরীকে জাদীদ নামক কর্মসূচীর ঘোষণা ১৯৩৪ সাল।
- * যুবক ও কিশোরদের সংগঠন যথাক্রমে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ও আতফালুল আহমদীয়া প্রতিষ্ঠা ১৯৩৯ সাল।
- * জুবিলী উৎসব; আন্তঃধর্ম প্রবর্তক দিবস পালনের ব্যবস্থা ১৯৩৯ সাল।
- * জামা’তের পতাকা এবং খোদ্দামুল আহমদীয়ার পতাকা প্রবর্তন ১৯৩৯ সাল।
- * ফযলে উমর গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা; পবিত্র স্থানের সুরক্ষা রেডিও বক্তৃতা ১৯৪১ সাল।
- * ওয়াকারে আমল ১৯৪২ সাল।
- * মুসলেহ মাওউদ হবার ঘোষণা ১৯৪৪ সাল।
- * ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে ব্যাপকভাবে ইসলামের তবলীগের জন্য মোবাল্লেগ প্রেরণ; হিলফুল ফুয়ুল তাহরীক ১৯৪৫ সাল।
- * বিশ্বের আটটি বিখ্যাত ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ সমাপ্ত, ফযলে ওমর রিসার্চ ইন্সটিটিউট-এর ভিত্তি স্থাপন ১৯৪৬ সাল।
- * কাদিয়ান থেকে পাকিস্তান হিজরত ১৯৪৭-৪৯ সাল।
- * পবিত্র কুরআনের ইংরেজী তফসীরের ভূমিকা এবং দশ পারা প্রকাশ ১৯৪৯ সাল।

- * বিরুদ্ধবাদীদের উস্কানীতে পাঞ্জাবে দাঙ্গা সৃষ্টির সময় আহমদীয়া জামা'তকে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ ১৯৫২-৫৩ সাল।
- * বিরুদ্ধবাদী আততায়ীর দ্বারা ছুরিকাহত ১৯৫৪ সাল।
- * পবিত্র কুরআনের ডাচ ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ, ইউরোপ সফর ১৯৫৫ সাল।
- * তফসীরে সগীর-এর প্রকাশনা ১৯৫৭ সাল।
- * ওয়াকফে জাদীদ ঘোষণা ১৯৫৭ সাল।
- * নিগরান বোর্ড গঠনের মঞ্জুরি ১৯৬০ সাল।
- * খিলাফতের পঞ্চাশ বছর পূর্তি এবং জামা'তের বিশেষ দোয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ১৯৬৪ সাল।
- * পরলোকগমন ৮ নভেম্বর ১৯৬৫ সাল।



২৭ মে: খিলাফত দিবস

مَا كَانَتْ نَبُوءَةٌ قَطُّ إِلَّا تَبِعَتْهَا خِلَافَةٌ

অর্থ: পৃথিবীতে এমন কোনো নবী আসেন নি
(যাঁর ইন্তেকালের পর) তাঁর খিলাফত কায়েম হয় নি।
(কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১০৯)



হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন,
“আমি খোদা তা’লার এক মূর্তিমান কুদরত
আমার পর আরো কতিপয় ব্যক্তি
দ্বিতীয় কুদরতের প্রকাশস্থল হবেন।”
(আল-ওসীয়াত, পৃ. ৭, বাংলা সংস্করণ ২০১৪)

কুদরতে সানীয়া

আজ বিশ্বের চলমান অবস্থার প্রতি অভিনিবেশকারী নিরপেক্ষ মনমানসিকতার অধিকারী প্রত্যেক মানুষ একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, বিশ্ব ক্রমাগত ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। শান্তি প্রতিষ্ঠার পথগুলো রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। স্বার্থপরতা, লোভ-লালসা, মিথ্যা, অবিশ্বস্ততা, প্রতারণা আর অন্যা-অবিচারের কারণে বিশ্বে অস্থিরতা আর পরস্পরের মাঝে সংঘর্ষের অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে। এথেকে মুক্তি লাভের উপায় কী তা কেউই বুঝতে পারছে না। ক্ষমতার নেশায় বঁদে বিভিন্ন জাতি সভ্যতা-ভব্যতা জলাঞ্জলি দিয়ে দুর্বল জাতিগুলোকে অপদস্ত করে যাচ্ছে। নিজেদের উদরপূর্তি করার লক্ষ্যে নিরপরাধ লোকদের রক্ত বারানো হচ্ছে। একদিকে শক্তিদ্র জাতিগুলো পৃথিবী থেকে খোদার নাম আর আকাশ থেকে তাঁর অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে আর অপরদিকে বাহ্যত খোদার প্রতি বিশ্বাসীরাও খোদাকে পরিত্যাগ করে সেসব শক্তির সামনে মাথানত করতে বাধ্য হচ্ছে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো! এসব কি এভাবেই চলতে থাকবে? সত্যিকার অর্থেই কি খোদার নাম মুছে ফেলা হবে? তাঁর রসুলের শিক্ষা কি বিস্মৃত হয়ে যাবে? কখনোই না। সেই খোদা, যিনি সকল শক্তি ও মহিমার আধার আর সবচেয়ে মহান অধিপতি, তাঁর প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি কখনোই এমনটি হতে দিবেন না। যেভাবে তিনি প্রাথমিক যুগে আমাদের মনিব ও অভিভাবক হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের ভিত্তি রেখেছেন এবং তাঁর তিরোধানের পর নবুয়তের পদ্ধতিতে প্রবর্তিত খিলাফতের মাধ্যমে এই ধর্মকে সুদৃঢ় করেছেন, একইভাবে তিনি স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে আখারীন বা পরবর্তীদের মধ্যেও হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ দাসের মাধ্যমে একই ধর্মের পুনর্জাগরণের ভিত রচনা করেন, আর এরপর নবুয়তের পদ্ধতিতে প্রবর্তিত খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন এবং আমাদের বিশ্বাস হলো, এখন এর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জগতে একটি বিপ্লব সৃষ্টি হবে। আর সত্য স্বীয় সকল কল্যাণসহ আসবে আর মিথ্যা তার সকল অকল্যাণসহ পলায়ন করবে। যারা এই খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে খোদা তাদেরকে আহসান তাকভীম বা সবচেয়ে উন্নত স্তরে নিয়ে যাবেন আর তাদের জন্য অসীম পুরস্কার থাকবে আর যারা এথেকে পৃথক হবে তারা আসফালা সাফিলীন বা সবচেয়ে

নিকৃষ্টদের দলে গিয়ে ভিড়বে। আর তাদের জন্য ক্রমান্বয়ে আধ্যাত্মিক উন্নতির সকল পথ রুদ্ধ হতে থাকবে। অতএব আল্লাহ তা'লা বলেন,

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

(সূরা আন-নূর: ৫৬)

অনুবাদ: “তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং পুণ্যকর্ম করে, তাদের সাথে আল্লাহ তা'লা অঙ্গীকার করেছেন, নিশ্চয় তিনি পৃথিবীতে তাদেরকে খলীফা বানাবেন যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে খলীফা বানিয়েছেন। আর অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিবেন, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির অবস্থার পর অবশ্যই তিনি তা নিরাপত্তায় বদলে দিবেন। তারা আমার ইবাদত করবে (এবং) আমার সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করবে না। আর এরপরও যারা অকৃতজ্ঞতা করবে তারাই দুষ্কৃতকারী।” (সূরা আন-নূর: ৫৬)

অনুরূপভাবে মহানবী (সা.) বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে ততদিন পর্যন্ত নবুয়ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ চাইবেন, অতঃপর আল্লাহ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। তারপর নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'লা চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন যুলুম, অত্যাচার ও উৎপীড়নের রাজত্ব কায়েম হবে। ... যখন এই যুগ শেষ হয়ে যাবে তখন এর চেয়েও ভয়ানক অহংকার ও জবরদস্তিমূলক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে... এরপর পুনরায় নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর তিনি (সা.) নীরব হয়ে যান।” (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৩, মিশকাত: বাবুল ইনযারে ওয়াত তাহযীর)

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, “তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখা-ও আবশ্যিক আর এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়, কেননা তা স্থায়ী যার ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবার নয়। আর সেই ‘দ্বিতীয় কুদরত’

আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না। কিন্তু আমার চলে যাবার পর খোদা তোমাদের জন্য সেই ‘দ্বিতীয় কুদরত’ প্রেরণ করবেন যা চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকবে।’ (রুহানী খাযায়েন, বিংশতম খণ্ড, পৃ. ৩০৫)

যখন পবিত্র কুরআনে বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল লোকদের সাথে খোদা তা’লা স্বয়ং খিলাফতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আর হাদীসে খোদার রসূল (সা.) শেষ যুগে খিলাফত প্রতিষ্ঠার সুসংবাদ দিয়েছেন আর এ যুগে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) খিলাফতের শুভসংবাদ শোনাচ্ছেন, কাজেই এটি একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, সত্যিকার অর্থে এ যুগে মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন শুধুমাত্র খিলাফতের সাথেই সম্পৃক্ত। কেননা খিলাফত একটি উন্নত মানের পুরস্কার, যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তা’লা মু’মিনদের প্রদান করছেন, যদি তোমরা ঈমান আনো আর সৎকাজ করো তাহলে তোমাদেরকে খিলাফতরূপী এমন ব্যবস্থাপনা প্রদান করব যার ফলে তোমাদের ধর্ম সুদৃঢ় হবে। তোমাদের ভয়ভীতি, শান্তি ও নিরাপত্তা বদলে যাবে। তোমাদের মাঝে ইবাদত প্রতিষ্ঠিত হবে আর তোমরা শিরকের নোংরামি বা অপবিত্রতা হতে নিরাপদ থাকবে। অর্থাৎ ইবাদত না থাকা বা লোকদেখানো ইবাদত করা, শিরকের পূজা করা— এগুলো সবই আধ্যাত্মিক জীবনের শত্রু। কিন্তু খিলাফতের কল্যাণে সত্যিকার ইবাদত প্রতিষ্ঠিত হবে আর শিরক নির্মূল হবে। এভাবে খোদা তা’লা খিলাফতের কল্যাণে আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির প্রতিশ্রুতি প্রদান করছেন। আমাদের এই যুগে আল্লাহ তা’লা ইসলাম ধর্মের পুনর্জীবন ও ইসলামী শরীয়ত প্রতিষ্ঠাকল্পে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেন এবং তাঁর (আ.) মৃত্যুর পর দ্বিতীয় কুদরত বা কুদরতে সানীয়ার বিকাশস্বরূপ খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। জামা’তে আহমদীয়ায় সর্বপ্রথম ২৭ মে, ১৯০৮ সনে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এজন্য প্রত্যেক বছর ২৭ মে খিলাফত দিবস উদ্‌যাপন করা হয় যাতে করে জামা’তের সদস্যদের মধ্যে খিলাফতের গুরুত্ব ও খলীফার পদমর্যাদা ও গুরুত্বের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়।

এই আয়াতে করীমা আমাদের সামনে সুন্দরভাবে কয়েকটি বিষয় উপস্থাপন করেছে। সেগুলো হলো—

১. ঈমান আনয়নকারী ও সৎকর্মশীলদের মাঝে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করবেন।
২. ধর্মকে খিলাফতের অনুসারীদের জন্য সুদৃঢ় করবেন।
৩. ভীতির অবস্থার পরিবর্তে নিরাপত্তা প্রদান করা হবে।

৪. [সত্যিকার অর্থে তারাই ইবাদতগুয়ার (শিরককারী নয়)– যারা খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত।

৫. [যারা খিলাফতের অস্বীকারকারী তারা ফাসেক।

প্রত্যেক নবীর সমসাময়িক যুগের অনুসারীরা সৎকর্মশীল হয়ে থাকেন। প্রথমে ঈমানের জন্য তাদেরকে চরম বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। সৎকর্মশীল হতে গিয়ে ত্যাগ করতে হয় জীবনের সমস্ত অপকর্ম। অবশেষে আল্লাহর দয়ার সাগর উছলে ওঠে। তিনি মানুষের আরো উন্নতিকল্পে নবীর মৃত্যুর পর খিলাফত পদ্ধতি চালু করেন। খিলাফতের মসনদে সমাসীন খলীফা নবীর অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে থাকেন। এমনকি অনেক ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার জন্য খিলাফতের ব্যবস্থাপনা অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে থাকে।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, “আধ্যাত্মিক জগতের অগ্নিশিখা আল্লাহর নূর। সেই চিমনি– যার মাধ্যমে নূর আলোকিত হয়, সেই চিমনি আল্লাহর নবীগণ। এমনিতে প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে আল্লাহর নূর বিকশিত হচ্ছে। কিন্তু মানুষ সেটা দেখে না। যখন আল্লাহর নবীর আগমন হয় এবং যখন (নবী) সেই নূর নিজ হাতে দুনিয়ার মানুষের সামনে তুলে ধরেন তখন প্রত্যেক মানুষ তা দেখতে পারে। তখন সে নূর বিকশিত হয় এবং প্রদীপের ন্যায় এর আলো অনেক বেশি ব্যাপকতা লাভ করে এবং নবুয়তের মধ্যে তা পূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু নবী তো বহুকাল জীবিত থাকেন না। স্বাভাবিকভাবে তিনি জীবন ও মৃত্যুর অধীনে। তিনি যেহেতু অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘজীবন লাভ করেন না তাই তাঁর নূর বা আলো অনেক দূরদূরান্তে পৌঁছাবার জন্য এবং দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য কোনো বিকল্প ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। সুতরাং এতদুদ্দেশ্যে আল্লাহ তা’লা একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এর নাম খিলাফত।” (তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩১৯-৩২১, সূরা আন-নূর, আয়াত ৫৬)

এরপর বলেছেন,

وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

অর্থাৎ, কেউ যদি এই আশিসপূর্ণ ব্যবস্থাপনাকে অস্বীকার করে সে দুষ্কৃতকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। ফাসেক এর অর্থ হলো, খোদার নির্দেশ অমান্য করা বা অস্বীকারকারী। যেমনটি ইবলিস সম্পর্কে বলা হয়েছে,

فَقَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ^ط

(সূরা আল-কাহাফ: ৫১)

অর্থাৎ, সে স্বীয় প্রভুর নির্দেশের অবাধ্য হয়ে গেল।

কাজেই খিলাফতকে অস্বীকার মূলত খোদাকে অস্বীকারের নামান্তর। তাঁর রসূলের নির্দেশাবলীর অস্বীকার। খিলাফতের অস্বীকারকারী মূলত ধর্মের দৃঢ়তার অস্বীকারকারী। মু'মিন বা বিশ্বাসীদের ভয়ভীতিকে শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিবর্তনের অস্বীকারকারী। খোদার ইবাদত প্রতিষ্ঠার অস্বীকারকারী। সে মূলত পৃথিবীতে শিরকের বিস্তার ঘটাতে চায়। কিছুটা চিন্তা করে দেখুন! এমন লোকদের আধ্যাত্মিক জীবনের সাথে কীসের সম্পর্ক। তারা শুধু দেহ সর্বস্ব, যা থেকে অনর্থক আওয়াজ বা শব্দ নির্গত হয়। তাদের কথাবার্তা নিরর্থক। তাদের কাজকর্ম বেহুদা। তাদের ধনসম্পদ, তাদের মিথ্যা সম্মান, তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি সবই নিষ্ফল। এদের সম্পর্কেই আল্লাহ তা'লা বলেন,

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا^ط وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا^ط وَلَهُمْ
أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا^ط أُولَٰئِكَ كَانُوا لَنَا نَعَامٍ^ط بَلْ هُمْ أَصْلُ

(সূরা আল-আ'রাফ: ১৮০)

অর্থাৎ, তাদের অন্তঃকরণ আছে ঠিকই কিন্তু তারা চিন্তাভাবনা করতে অক্ষম। তাদের চক্ষু রয়েছে কিন্তু দেখতে অক্ষম, তাদের কান রয়েছে ঠিকই কিন্তু তারা শোনে না। এরা চতুষ্পদ জন্তুর মতো বরং এর চেয়েও নিকৃষ্ট।

এ কারণেই আল্লাহ তা'লা বলেছেন,

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ^ع

(সূরা আন-নিসা: ৮১)

অর্থাৎ, যে রসূলের আনুগত্য করে সে আল্লাহর আনুগত্য করে আর মহানবী (সা.) বলেছেন, যে আমার আমীরের আনুগত্য করে সে আমার আনুগত্য করে আর যে আমার আমীরের অবাধ্য হয় সে আমার অবাধ্যতা করে। (মুসলিম, কিতাবুল আমারাহ)

আরেকটি হাদীসে বলেছেন, কেউ যদি বয়আত না করে মারা যায় তাহলে “ফাকাদ মাতা মিতাতল জাহিলিয়াত” সে অজ্ঞতার মৃত্যুবরণ করবে। (মুসলিম, কিতাবুল আমারাহ) আরো বলেছেন, “ইয়াদুল্লাহি আলাল জামায়াতে ওয়া মান শায়যা শুযযা ইলান নার” (তিরমিযী, কিতাবুল ফিতান) অর্থাৎ, আল্লাহর সাহায্য জামা’তের সাথে থাকে। যে ব্যক্তি জামা’ত থেকে পৃথক হয়ে যায় সে মূলত আগুনে নিষ্কিণ্ত হয়েছে।

জামা’ত বা দল তো অনেক হয়ে থাকে। তাহলে এখানে ‘আল জামা’ত’ বলতে কোন জামা’তকে বুঝানো হয়েছে! একটি হাদীসে মহানবী (সা.) স্বয়ং এর ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। তিনি (সা.) শেষ যুগের নৈরাজ্যের উল্লেখ করার পর বলেছেন, “ফা ইন রাআইতা ইয়াওমাইযিন খালিফাতাল্লাহে ফিল আরযে ফালযিম ওয়া ইন নুহিকা জিসমুকা ওয়া উখিযা মালুকা” (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল) অর্থাৎ, তোমরা যদি তখন পৃথিবীতে খোদার খলীফাকে দেখো তাহলে তাঁর সঙ্গে চিমটে থেকো, এতে যদি তোমাদের দেহ টুকরো টুকরো করে ফেলা হয় আর তোমাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হয় তবুও। এই হাদীস প্রমাণ করে, এখানে জামা’ত বলতে এমন একটি জামা’তকে বুঝানো হয়েছে যাদের একজন অবশ্য অনুসরণীয় খলীফা থাকবে।

কাজেই আল্লাহর সাথে সম্পর্ক, যা আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি, মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসা এবং আনুগত্যের কল্যাণেই লাভ করা সম্ভব। আর বর্তমানে মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসা ও আনুগত্য খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, “সত্যিকার অর্থে খলীফা ছাড়া ইকামাতুস সালাত বা নামায কায়েম হতে পারে না, একইভাবে রসূলের আনুগত্যও... খলীফা ছাড়া হতে পারে না। কেননা রসূলের আনুগত্যের মূল উদ্দেশ্য হলো, সবাইকে ঐক্যের বাঁধনে বেঁধে দেয়া। এমনিতে তো সাহাবীরাও নামায পড়তেন আর বর্তমান যুগের মুসলমানরাও নামায পড়ে। সাহাবীগণও (রা.) হজ্জ করতেন আর বর্তমান মুসলমানরাও হজ্জ করে। তাহলে সাহাবী এবং বর্তমান যুগের মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য হলো, একটি ব্যবস্থাপনার অধীনে থাকার কারণে সাহাবীদের মধ্যে আনুগত্যের চেতনা পরম মানে উপনীত ছিল ... কিন্তু আনুগত্যের এই চেতনা আজকালকার মুসলমানদের মধ্যে নাই, কেননা নেয়াম বা ব্যবস্থাপনা ছাড়া আনুগত্যের

বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হতে পারে না। অতএব যখনই খিলাফত হবে... রসূলের আনুগত্য করা হবে... যদি খিলাফত না থাকে তাহলে আল্লাহ তা'লা বলেন, তোমাদের নামাযও নষ্ট হবে, তোমাদের যাকাতও হারিয়ে যাবে আর তোমাদের হৃদয় থেকে রসূলের আনুগত্যের বৈশিষ্ট্যও লোপ পাবে।” (তফসীরে কবীর, সূরা আন-নূর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৭-৩২৯)

খিলাফত কী এবং কেন?

খিলাফত ঐ হাবলুল্লাহ, ঐ রশি যা আমাদেরকে খোদা তা'লার সাথে সম্পর্কযুক্ত রাখে। সব ধরনের দলাদলি, বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্ত রাখে। খিলাফত সেউ বৃক্ষ, সেই ছাতা যার ছায়া আমাদের সব ধরনের অশান্তি, নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা থেকে নিরাপদ রাখে। খলীফা সেই মহান পথপ্রদর্শক যিনি অত্যন্ত দ্রুত বেগে উন্নতির পথে, সফলতার পথে নিয়ে যান। খলীফা একজন সাধারণ ব্যক্তি নন। নবী ও রসূলের স্থলাভিষিক্ত হলেন খলীফা।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, “মানুষ চিরস্থায়ী নয়। এজন্য খোদা তা'লা ইচ্ছা করেছেন— রসূলের সত্তা যা জগতের অপরাপর সকল সত্তা থেকে শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত তা যেন কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকে। সুতরাং এজন্য খোদা তা'লা খিলাফত ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছেন। যেন কোনো যুগ কখনো নবুয়তের বরকত থেকে বঞ্চিত না থাকে। নবীর অবর্তমানে নবীর প্রতিনিধিত্ব করেন খলীফা। এ কারণে নবীর প্রতিটি কাজে যেভাবে আল্লাহ তা'লা সাহায্য করেন, সফলতা দেন, ঠিক সেভাবেই খলীফাকেও করে থাকেন।”

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আরো বলেন, “খলীফা স্থলাভিষিক্তকে বলে। আর রসূলের স্থলাভিষিক্ত সত্যিকার অর্থে তিনিই হতে পারেন যিনি প্রতিচ্ছায়ারূপে রসূলের গুণাবলী নিজের মাঝে রাখেন। এজন্য রসূলে করীম (সা.) চান নি অত্যাচারী বাদশাহদের জন্য খলীফা শব্দ ব্যবহৃত হোক, কেননা বাস্তবিক অর্থে খলীফা রসূলের প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকেন। যেহেতু কোনো মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকে না সেহেতু খোদা তা'লা সংকল্প করে নিয়েছেন— রসূলের সত্তা যা জগতের অপরাপর সকল সত্তা থেকে সম্মানিত ও সর্বোত্তম সেটাকে যেন প্রতিচ্ছায়ারূপে কিয়ামতকাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত রাখেন। সুতরাং এই উদ্দেশ্যেই খোদা তা'লা খিলাফত ব্যবস্থাকে বেছে নিয়েছেন যাতে জগৎ কখনো কোনো যুগে নবুয়তের বরকত থেকে বঞ্চিত না থাকে। সুতরাং যে

ব্যক্তি খিলাফতকে শুধুমাত্র ত্রিশ বছর পর্যন্ত মানে সে নিজের নির্বুদ্ধিতার কারণে খিলাফতের মূল উদ্দেশ্যকেই উপেক্ষা করে যায়। আর জানে না এটা কখনও খোদা তা'লার ইচ্ছা ছিল না যে, রসূলে করীম (সা.)-এর মৃত্যুর পর মাত্র ত্রিশ বছর পর্যন্ত নবুয়তের বরকতকে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। এরপর এ জগৎ ধ্বংস হয়ে যাক এতে কিছু যায় আসে না!

... সুতরাং খোদা তা'লার ব্যাপারে এমনটা মনে করা একটা হীন চিন্তাধারা— তাঁর শুধুমাত্র ... ত্রিশ বছরের চিন্তা ছিল। পরে সর্বদার জন্য পথভ্রষ্টতায় ছেড়ে দিয়েছেন। আর ঐ নূর যা প্রাচীন কাল থেকে পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতের মধ্যে খিলাফতের আয়নায় পরিদৃষ্ট হতো, এদের জন্য তা দেখানোর অনুমতি নাই! সুস্থ বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি কি দয়ালু ও অনুগ্রহশীল খোদার জন্য এ বিষয়টি মেনে নিতে পারে? কখনো না। আর এ আয়াত ইমামদের খিলাফতের বিষয়ে সাক্ষ্যদানকারী। ... কেননা এ আয়াত সুস্পষ্টভাবে বলছে ... খিলাফত চিরস্থায়ী। এজন্য “ইয়ারিমুহা” শব্দ স্থায়ীত্বকে চায়। কারণ হলো, যদি শেষ সুযোগ দুষ্টতাকারীরা পেয়ে যায় তাহলে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী তারাই হয়ে যাবে— সৎকর্মশীলরা হবে না। সবার উত্তরাধিকারী তারাই হয় যারা সবার পরে আসে।” (শাহাদাতুল কুরআন, রুহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৫৩-৩৫৪)

হযরহ মসীহ মাওউদ (আ.) আরো বলেন, “আমরা যখন কুরআনের প্রতি দৃষ্টি দেই এবং গভীর দৃষ্টিতে তা দেখি তখন এটা উচ্চস্বরে এই বলতে থাকে— আধ্যাত্মিক শিক্ষক সর্বদা বিদ্যমান থাকবে এটাই এর মূল অভিপ্রায়। ... এছাড়া আরো কতিপয় আয়াত আছে যা থেকে প্রমাণ হয়, খোদা তা'লা অবশ্যই এ ইচ্ছা পোষণ করেছেন, আধ্যাত্মিক শিক্ষক যারা নবীদের উত্তরাধিকারী তারা যেন সর্বদা হতে থাকেন। আর তা এই (সূরা আন-নূর: ৫৬) অর্থাৎ খোদা তা'লা তোমাদের জন্য ওয়াদা করেছেন— তিনি তোমাদেরকেও পৃথিবীতে খলীফা বানাবেন, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের করেছেন। ... এই আয়াতকে যদি কোনো ব্যক্তি গুরুত্বের সাথে ও গভীরভাবে দেখে, তাহলে আমি কীভাবে বলব— সে ব্যক্তি এ বিষয়কে বুঝবে না যে, খোদা তা'লা চিরস্থায়ী খিলাফতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। খিলাফত যদি চিরস্থায়ী না হতো তাহলে মূসায়ী শরীয়তের খিলাফতের সাদৃশ্য বর্ণনার মাহাত্ম্য কী? আর খিলাফতে রাশেদা ত্রিশ বছর থাকার পর সর্বদার জন্য যদি বিলুপ্তি ঘটে, তাহলে এটা থেকে ফলাফল দাঁড়ায় যে, খোদা তা'লার কখনো এ

ইচ্ছা ছিল না, এ উম্মতের জন্য সর্বদা সৌভাগ্যের দ্বার উন্মুক্ত থাকুক। আর মূলত আধ্যাত্মিকতার মৃত্যুতে ধর্মের মৃত্যুও অনিবার্য হয়ে পড়ে।” (শাহাদাতুল কুরআন, রুহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৫১-৩৫৩)

খিলাফতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

প্রতিটি ঘটনাপ্রবাহের কোনো না কোনো কারণ কিংবা তাৎপর্য রয়েছে। পবিত্র কুরআন, হাদীস ও মনীষীদের কথা আর অন্যদিকে বাস্তবে ঘটে যাওয়া ক্রম, যে-কোনো কিছুই তাৎপর্য নির্ণয়ের উত্তম পন্থা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা’লা ইরশাদ করেন—

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ

অর্থাৎ, “তিনিই তাঁর রসূলকে হিদায়াত ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন যেন তিনি একে সকল ধর্মের ওপর জয়যুক্ত করে দেন।” (সূরা আস-সাফফ: ১০)

বাস্তবিকপক্ষে বর্তমানেও ইসলাম সকল ধর্মের ওপর জয়যুক্ত হয় নি। কিন্তু এর ধারা জারি আছে। যদি খিলাফত নামক খোদা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নেয়াম প্রবহমান না থাকত তাহলে কে গ্রহণ করত এই মহান কার্যোদ্ধারের কঠিন দায়িত্ব? সকল ধর্মের ওপর ইসলাম জয়যুক্ত হবার মানে হচ্ছে স্রষ্টার দর্শন লাভের উপযোগী আত্মা তৈরি হওয়া; খোদার সত্তার সামনে নিজেকে ইসমাইলের (আ.) মতো পেশ করে দেয়া। ফিরিশতাকূলকে প্রদত্ত আল্লাহ তা’লার বাণী বা চ্যালেঞ্জ বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত একথা বলা যাবে না যে ইসলাম জয়যুক্ত হয়েছে। ইসলাম শিক্ষা জয়যুক্ত হওয়া মানে ইসলামের জয়যুক্ত হওয়া। নয়তো অবস্থা হবে এমন, “গুনতিতে মোরা বাড়িয়া চলেছি—গরু ছাগলের মত।” (জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম)

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, “(প্রকৃত সত্য) এই, যে-কোনো ধর্ম বা দীন আল্লাহর নবীর হাত দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। খলীফাদের হাতে পরিচালনা পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। নতুবা আদেশ-নিষেধ তো নবীর ওপর আল্লাহ পূর্বেই নাযিল করেছেন। খলীফাগণ ধর্মের আদেশ-নিষেধ ও নিয়মাবলীর ব্যাখ্যা করেন ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি দেখিয়ে দেন, কিছু কিছু বিষয় যার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় সেগুলোর ব্যাখ্যা মানুষের সামনে তিনি বর্ণনা

করেন। এমন এমন পরিকল্পনা পেশ করেন যা দ্বারা ইসলাম ভবিষ্যতে গিয়ে উন্নতি লাভ করে।” (আল-ফযল, রাবওয়া, ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩৭)

আল্লাহ তা'লার দয়া ও কৃপা ব্যতীত এই গুরুভার বহনের শক্তি বা ক্ষমতা কারো নাই। খলীফা তাকে বলে যে পূর্বের এক ব্যক্তির কাজকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং খলীফা যার স্থলাভিষিক্ত হয় তার সম্পর্কে আল্লাহ তা'লা বলেছেন—

وَوَضَعْنَاكَ وَزْرَكَ ۝ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۝

(সূরা আল-ইনশিরাহ: ৩-৪)

অর্থাৎ, আর তোমার ওপর থেকে আমরা তোমার সেই বোঝা নামিয়ে দিয়েছি, যা তোমার কোমর ভেঙে ফেলার উপক্রম করেছিল। অতএব যখন আল্লাহ তা'লা বলেন, এই বোঝার কারণে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর পিঠ ভেঙে যাবার উপক্রম ছিল, আর কে আছে যে এই গুরুভার বহন করে নিরাপদ থাকতে পারে? কিন্তু সেই খোদা যিনি মহানবী (সা.)-এর বোঝা হালকা করেছিলেন এবং এ যুগেও তাঁর নিজ ধর্মের প্রচার-প্রসারের জন্য তিনি এক ব্যক্তিকে এই বোঝা বহনের তৌফিক (শক্তি) দিয়েছেন। তিনিই এই নবীর পর, তাঁর ধর্মের প্রচার-প্রসারকারীদের কোমর মজবুত করেন।

খলীফার মর্যাদা ও কাজ বিষয়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, খলীফার কাজ কী? খলীফার অর্থ কারো পরে এসে সে কাজই সম্পাদনকারী যা তার পূর্বের ব্যক্তি করত। যার কোনো খলীফা হবে তার পরিচয়ের জন্য তার মূলকে দেখা উচিত, সে কী কাজ করত। আল্লাহ তা'লা রসূলুল্লাহ (সা.)-এর যে কাজ বলেছেন তা হলো—

يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۚ

(সূরা আলে ইমরান: ১৬৫)

অর্থাৎ, (১) খোদার আয়াতসমূহ লোকদেরকে পড়ে শুনায়, (২) তাদের অন্তঃকরণ পবিত্র করে, (৩) তাদেরকে কিতাব শিখায়, (৪) তাদেরকে প্রজ্ঞা শিখায়। ... নবীর এই চারটি কাজ পৃথিবীর কোনো আঞ্জুমান (সংঘ) করতে পারে না। এটি সে ব্যক্তিই করতে পারে যাকে নবীর পর খোদা তা'লার পক্ষ থেকে নিযুক্ত করা হয় এবং যাকে খলীফা বলা হয়।” [বারাকাতে খিলাফত, আনোয়ারুল উলূম, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬০]

খিলাফতের গুরুত্ব সম্পর্কে একজন সাহাবী হযরত হানযালাহ (রা.) কয়েকটি পংক্তি লিখেছিলেন—

“আমি হযরানি বোধ করছি, লোকেরা কী বলছে? তারা চায় যে খিলাফত শেষ হয়ে যাক! এটি যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে তো সকল কল্যাণ থেকে আমরা দূরে সরে যাব। ইহুদী, খ্রিষ্টানদের মতোই আমরা হয়ে যাব; সত্যের পথ থেকে দূরে সরে যাব।” [তারিখ ইবনে আসির, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৩, আল-ফযল, রাবওয়া, ১৭ জুন ২০০৪]

খিলাফত প্রতিষ্ঠা কোনো মানবের কাজ নয়

কোনো মানুষ যেহেতু নবী বানাতে পারে না, তাই সেই ধারাক্রমে খিলাফত প্রতিষ্ঠাও কোনো মানবের দ্বারা সম্ভব নয়। হযরত আবু বকর (রা.) খলীফা হবার পর এক খুতবায় বলেছিলেন— “আমাকে আল্লাহ খলীফা বানিয়েছেন। তোমাদের মাঝে এর মাধ্যমে যেন ভালোবাসা সৃষ্টি হয় এবং তোমাদের ঐক্য সুদৃঢ় করা হয়।” [দায়েরাতুল মারিফ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৫৮]

হযরত উসমান (রা.)-এর সময় ফিতনা চরম আকার ধারণ করলে হযরত হানযালা কবিতাকারে বলেছিলেন— “বিদ্রোহীদের কথা শুনে আমি আশ্চর্য হই কারণ খিলাফতকে ভেঙে দিতে চায়। বাস্তবে এই খিলাফত ভেঙে গেলে মুসলমানরা সব মঙ্গল ও বরকত থেকে বঞ্চিত হবে এবং সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ও অপমানিত হবে। এমনকি ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের মতো হয়ে যাবে। বিপথগামিতার দিক দিয়ে সবাই সমান হয়ে যাবে।” [অনুবাদ: ইবনে কাসির, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৩]

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) শেষ যুগের প্রত্যাदिষ্ট পুরুষ হিসাবে আবির্ভূত হয়ে জগতের সামনে ঘোষণা করেন— “এ যুগে আল্লাহ তা’লার এটিই ইচ্ছা যে, সারা বিশ্বের সব ধর্মের ওপর ইসলামকে জয়যুক্ত করা হবে। আল্লাহ তা’লা এ উদ্দেশ্যেই আমাকে প্রেরণ করেছেন। যেভাবে পূর্বযুগে আল্লাহ ‘মামুর মিনাল্লাহ’ প্রেরণ করতেন, ঠিক সেই একইভাবে এ যুগেও “মামুর মিনাল্লাহ” অর্থাৎ আল্লাহর খাস উদ্দেশ্যে আল্লাহ কর্তৃক আদিষ্ট ব্যক্তি হিসাবেই আমি প্রেরিত হয়েছি”। [আল-হাকাম, ৩১ জানুয়ারি ১৯০৪]

তিনি (আ.) আরো বলেন, “আমি সেই বৃক্ষ, প্রকৃত বিশ্ব অধিপতি খোদা

তাঁলার যাকে স্বহস্তে রোপন করেছেন।” [তোহফায়ে গোলড়াবিয়া, যামিমা, পৃ. ৯]

তিনি (আ.) আরো বলেন, “তোমরা অবশ্যই স্মরণ রেখো এবং মন দিয়ে শ্রবণ করো যে, আমার রুহ ধ্বংস হবার রুহ নয়। আর আমার প্রকৃতিতে অকৃতকার্যতার লেশমাত্র চিহ্ন নাই। ঐ প্রকারের সাহস এবং এমন পর্যায়ের সত্যনিষ্ঠা দ্বারা আমাকে আশিসযুক্ত করা হয়েছে, যার সম্মুখে পর্বতও তুচ্ছ। আমি কারো পরোয়া করি না। আমি একা ছিলাম এবং এরূপ একা থাকতে আমি মোটেই নারাজ ছিলাম না। খোদা কি আমাকে বর্জন করবেন? কখনো না। তিনি কি আমাকে নিষ্ফল করে দিবেন? অবশ্যই নয়। দুশমন লাঞ্চিত হয়ে যাবে এবং হিংসুক লাঞ্চিত হবে; খোদা তাঁর নিজ বান্দাকে (অর্থাৎ থাকসারকে) প্রত্যেক ময়দানে বিজয় দান করবেন।” [আনওয়ারুল ইসলাম, রুহানী খাযায়েন, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২২]

হযরত হাফেয মির্যা নাসের আহমদ খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ সনের খুতবা জুমুআয় বলেছেন, “আল্লাহর ইচ্ছামত হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের পর নিয়ামে খিলাফত চালু হয়েছে। এই নিয়াম (ব্যবস্থাপনা বা প্রতিষ্ঠান) পৃথিবীর সকল মানুষকে উম্মতে ওয়াহিদা (একজাতি) বানাবার নিমিত্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।” [দৈনিক আল-ফযল, রাবওয়াহ, ২৬ মে ২০০০]

খিলাফতের ধারাক্রম

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওফাতের পর আল্লাহ তাঁলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। ৬৩২-৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত হযরত আবু বকর (রা.) প্রথম খলীফা হিসাবে মু'মিনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে উম্মাহকে পরিচালনা করেন। এরপর ৬৪৪ পর্যন্ত হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.), ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত হযরত উসমান (রা.) ও ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত হযরত আলী (রা.) আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থনপুষ্ট হয়ে খিলাফতের মসনদের সৌন্দর্যবৃদ্ধি করার সৌভাগ্য লাভ করেন। এখানেই খিলাফতে রাশেদার ধারা শেষ হয়ে যায় তবে এরপরই উমাইয়া বংশের আমীর মুয়াবিয়া কর্তৃক বাদশাহাত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তা জারি থাকে। উমাইয়া বংশের পতনের পর আব্বাসীয় বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা পায় এবং তা ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চলে। ৯০৯ সনে মিশরে

ফাতেমীয় বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে ১১৭১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রবহমান থাকে। ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্রিটিশ, ফ্রান্স, ওলন্দাজসহ বিভিন্ন উপনিবেশিক শক্তি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করে পরিচালনা করতে থাকে। এ সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বস্তুবাদি সমাজবাদ, সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব হয় এবং বস্তুবাদি দর্শন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ১৭৬০ থেকে ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপে শিল্প বিপ্লব ও যুগান্তকারী সব আবিষ্কারের ফলে নতুন বিশ্ব সভ্যতার উন্মেষ ঘটে। ইতিহাসে রেনেসাঁর সূচনা হয়। মানুষ অতিমাত্রায় দুনিয়াদারির প্রতি ঝুঁকে পড়ে। একদিকে বস্তুবাদিতার প্রকটতা অন্যদিকে আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধতার নিমিত্তে আল্লাহ তা'লার ওয়াদা মোতাবেক প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে আগমন করতে থাকেন মুজাদ্দিদগণ।

আহমদীয়া খিলাফত

আল্লাহ তা'লা সূরা নূরের ৫৬ নম্বর আয়াতে মুসলমান জাতির সাথে অঙ্গীকার করেছেন যে, তাদের পূর্ববর্তী জাতি বনী ইসরাঈলের মধ্যে যেভাবে হযরত মূসা (আ.)-এর মৃত্যুর পর তাঁর শরীয়তকে পরিচালিত করার জন্য খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ও পর্যায়ক্রমে বহু খলীফা হয়েছিলেন এবং তেরো শত বছর পর চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে বনী ইসরাঈলের চরম অধঃপতনের সময় তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য হযরত মূসা (আ.)-এর খলীফা হিসাবে হযরত ঈসা (আ.) আবির্ভূত হয়েছিলেন, অনুরূপভাবে 'কামা' (সদৃশ) শব্দে বর্ণিত সাদৃশ্য অনুযায়ী হযরত নবী করীম (সা.)-এর ইন্তেকালের পরও খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের মধ্যে পর্যায়ক্রমে খলীফা হতে থাকবে। এমনকি মুসলমান জাতির চরম অধঃপতন এবং খ্রিষ্টধর্মের কুপ্রভাবে মারাত্মক অবক্ষয়ের যুগে দীন ইসলামকে পুনর্জীবিত করার উদ্দেশ্যে এবং দুর্বলতা ও ভয় ভীতি দূর করে তাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তা দান করার জন্য এই উম্মত হতে ঈসা সদৃশ এক খলীফা মনোনীত হবেন এবং তাঁর পর নবুয়তের পদ্ধতিতে পুনরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। যেমন, হযরত নবী করীম (সা.) এরশাদ করেছেন:

হযরত নু'মান বিন বশীর জ্বায়েফা হতে বর্ণনা করেছেন যে, “হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘তোমাদের মধ্যে নবুয়ত ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'লা চাইবেন অতঃপর আল্লাহ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। এরপর নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে

এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ চাইবেন, অতঃপর আল্লাহ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন যুলুম, অত্যাচার ও উৎপীড়নের রাজত্ব কয়েক হবে। তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ চাইবেন, অতঃপর আল্লাহ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন তা অহংকার ও জবরদস্তিমূলক সাম্রাজ্যে পরিণত হবে এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ চাইবেন, অতঃপর আল্লাহ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন নবুয়তের পদ্ধতিতে (অর্থাৎ মাহদী মা'হুদ ও মসীহ মাওউদ আলাইহিস সালাম-এর আগমনের পর) পুনরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর হযরত আকদাস (সা.) নীরব হয়ে গেলেন।” (আহমদ; বায়হাকী)

উপরোক্ত হাদিসটি বিশ্লেষণ করে দেখলে আমরা বুঝতে সক্ষম হবো, আমাদের পূর্ববর্তী শতাব্দী জুড়ে ঘটমান সমস্ত ইতিহাস পূর্বেই মুহাম্মদ (সা.) বর্ণনা করে গেছেন। এ হাদিসটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা হলো:

হযরত আলীর (রা.) মৃত্যুর পর আমীর মুয়াবিয়া ও তাঁর পুত্র ইয়াজিদের আমল থেকে শুরু হয় বাদশাহাতের মোড়কে খিলাফতের ধারা। বাস্তবিকপক্ষে হযরত আলী (রা.)-এর পর মুসলিম উম্মাহ সত্যিকার খিলাফতের মর্যাদা হতে নিজেদেরকে বিচ্যুত করে ফেলে। মুসলিম রাজ্যসমূহের উত্থানপতনের ধারাবাহিকতায় কখনো এক আবার কখনো বা একাধিক শাখায় হয়ে খিলাফত যায় তুরস্কের জমিনে। ১৯০৮ সালে ওসমানী সাম্রাজ্যের সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের ক্ষমতাচ্যুতির সাথে সাথে তথাকথিত খিলাফতের অবসান ঘটে। যদিও সে সময় এ তথাকথিত খিলাফতের তেমন কোনো কার্যকারিতা ছিল না, তবুও খিলাফতের প্রয়োজনীয়তা সে সময় পর্যন্ত বিস্মৃত হয়ে যায় নি। তাইতো সমসাময়িক মুসলিম সুলতানরা সমসাময়িক খলীফাতুল মুসলিমীনের সনদ ও স্বীকৃতি আদায়ে তৎপর থাকত। তবে ঘটনা যাহোক এই এক হাজার বছরে নানা চড়াইউৎরাই পার করতে হয় মুসলমানদের। একক নেতৃত্বের অভাব তাদেরকে আকাশের চূড়া থেকে জমিনের অতলে পতিত করে। নবুয়তের পদ্ধতিতে পুনরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবার কথা বলে “মহানবী (সা.) যে চূপ হয়ে গেলেন” এ কথাটি রাবির বর্ণনা; হাদীসের অংশ নয়। এ নিয়ামত কিয়ামতকাল পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকবে। পৃথিবীর কোনো শক্তি একে ছিন্ন করতে পারবে না। তবে শর্ত হলো শুধু আমলে সালেহ বা

যুগোপযোগী সৎকর্ম। উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে খিলাফত কায়েমের যে অঙ্গীকার এবং স্বয়ং আল্লাহ তা'লা এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন— কোনো মানুষের কর্ম নয় যে, সে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করবে। কোনো ব্যক্তি বলতে পারবে না যে, খোদার অঙ্গীকার পরিপূর্ণ হয় নি।

“নিশ্চয় তুমি ভঙ্গ করো না অঙ্গীকার।”

হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন— মা কানাত নবুওয়াতুন কাততু ইল্লা তাবিআতহা খিলাফাতুন। অর্থাৎ— “কোনো নবী-ই এমন ছিলেন না যার পরবর্তীতে খিলাফত কায়েম হয় নি।” (কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১১৯)। তাই আজ দুনিয়ার বুকে প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.) এর জামা'তে খিলাফত প্রতিষ্ঠা এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, হযরত ইমাম মাহদী (আ.) মুহাম্মদের গোলামির চাদরে নবী (উম্মতি) ছিলেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, “তার আবির্ভাবের সংবাদ পাওয়া মাত্রই তার হাতে বয়আত করবে যদি বরফের ওপরে হামাঙুড়ি দিয়েও যেতে হয়; নিশ্চয় সে আল্লাহর খলীফা আল-মাহদী।” (সুনানে ইবনে মাজা, বাব খুরুজুল মাহদী)

অতএব খিলাফত প্রতিষ্ঠা নবুয়তের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করে। খিলাফতবিহীন কোনো নবুয়ত হতে পারে না। তাঁর (আ.) মৃত্যুর পর ১৯০৮ সনের ২৭ মে হযরত আলহাজ্জ হাজীউল হারমাইন হাফেয নূরুদ্দীন (রা.) খলীফাতুল মসীহ আউয়াল হিসাবে নির্বাচিত হন। তাঁর (রা.) মৃত্যুর পর ১৯১৪ সালের ১৪ মার্চ হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ ফযলে উমর ও মুসলেহ মাওউদ খলীফাতুল মসীহ আস সানী খিলাফতের মসনদে আসীন হন।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর মৃত্যুর পর হযরত হাফেয মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দের ৮ নভেম্বর তারিখে খলীফাতুল মসীহ সালেস নির্বাচিত হন।

তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৮২ সালে ১০ জুন তারিখে হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ রাবে হিসাবে নির্বাচিত হন এবং তাঁর মৃত্যুর পর ২০০৩ সনের ২২ এপ্রিল তারিখে হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) খলীফাতুল মসীহ আল-খামেস হিসাবে খিলাফতের আসন অলংকৃত করেন। এই ধারাক্রম কিয়ামতকাল অবধি চলমান থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

খিলাফতে রাশেদার কল্যাণরাজি

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, “মানুষ চিরস্থায়ী নয়। এজন্য খোদা তা’লা ইচ্ছা করেছেন— রসূলের সত্তা যা জগতের অপরাপর সকল সত্তা থেকে শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত তা যেন কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকে। সুতরাং এজন্য খোদা তা’লা খিলাফত ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছেন। যেন কোনো যুগ কখনও নবুয়তের বরকত থেকে বঞ্চিত না থাকে। নবীর অবর্তমানে নবীর প্রতিনিধিত্ব করেন খলীফা। এ কারণে নবীর প্রতিটি কাজে যেভাবে আল্লাহ তা’লা সাহায্য করেন, সফলতা দেন, ঠিক সেভাবে খলীফাকেও করে থাকেন।”

ইসলামের ইতিহাস এর জ্বলন্ত প্রমাণ। খিলাফতে রাশেদা মাত্র ৩০ বছর ছিল। এর কল্যাণে এই অল্প সময়েই ইসলামের মাঝে অসাধারণ উন্নতি ও বিজয় সাধিত হয়েছিল। চারিদিকের বিশৃঙ্খলা, বিদ্রোহ দমন। মদীনা রাষ্ট্রের সুরক্ষা বিধান, কুরআন সংরক্ষণ, মূল পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত, মূল পাণ্ডুলিপির অনুকরণে একাধিক পাণ্ডুলিপি তৈরি, সেগুলোকে দূরদূরান্তের রাজ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। নতুন নতুন জায়গায় মসজিদ নির্মাণ, ইসলাম ধর্ম ও ইসলামী সাম্রাজ্যকে আরব উপদ্বীপের বাইরে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার এক বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়া, এসব কাজ ঐ যুগেই সম্পন্ন হয়েছিল।

মাত্র ৩০ বছর আগে ফিরে গেলে দেখবেন তখন এ চিত্র ছিল না। তখন ভিন্ন এক চিত্র ছিল। মুসলমানরা তাদের প্রাণের চেয়েও প্রিয় নবী, প্রিয় নেতা মুহাম্মদ (স.)-এর ইন্তেকালের পর ছিল দিশেহারা, হতাশ। এমনকি তাদের অনেকে নিরাশ হয়ে মুরতাদও হয়ে গিয়েছিল। তারা ভেবে পাচ্ছিল না যে, এখন আমাদের কী হবে? অপরদিকে খারিজীদের উত্থান হয়, ভণ্ড নবীদের আবির্ভাব হয়। তারা মুসলমানদের ওপর একের পর এক আক্রমণ করতে থাকে। মুসলমানদের এক নাজুক অবস্থার সৃষ্টি হয়। চারিদিকে বিশৃঙ্খলা, বিদ্রোহ, হত্যাজ্ঞা। মদীনা রাষ্ট্র হুমকির সম্মুখীন। সেই পরিস্থিতিতে শোকে কাতর মুসলমানরা খলীফা হিসাবে, নেতা হিসাবে হযরত আবু বকর (রা.)-কে পেল। তাঁর হাতে বয়আত নিল। আল্লাহর মনোনীত খলীফা তাদের নেতা হলেন।

তখন উসামা বিন যায়েদের নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করছিল। সবাই খলীফাকে পরামর্শ দিলেন— চারিদিকে বিদ্রোহ, মদীনা

অরক্ষিত। এ অবস্থায় এ অভিযান বন্ধ রেখে মদীনার হিফাযতের ব্যবস্থা নেয়া হোক। আবু বকর তেজোদীপ্ত কর্তে ঘোষণা দিলেন, শত্রুগণ যদি মদীনা আক্রমণ করে তখনই করে দেয়, জঙ্ঘ জাণোয়ার যদি লাশ নিয়ে মদীনার অলি গলিতে টেনেহিঁচড়ে খেতে থাকে তারপরও আমি এ অভিযান বন্ধ করতে পারব না। বাহিনী যাবেই। বলা হলো, উসামা ছোটো বাচ্চা। যুদ্ধ পরিচালনায় অভিজ্ঞ বড়ো বড়ো সাহাবীরা আছেন, তাদেরকে এ বাহিনীর কমান্ডার নিযুক্ত করা হোক। যুদ্ধে জয়ের জন্য অভিজ্ঞতার খুবই প্রয়োজন। আবু বকর বললেন, আবু কুহাফার পুত্রের কী অধিকার আছে, কী সাধ্য আছে? যাকে আল্লাহর রসূল কমান্ডার নিযুক্ত করেছেন তাকে অপসারণ করে। বাহিনী শেষে উসামারা নেতৃত্ব যায় এবং বিজয়ী ও সফল হয়ে ফিরে আসে।

শুধু তাই নয়, খলীফা হিসাবে আবু বকর (রা.)-কে পাবার পর তাদের মাঝে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। সব বিশৃঙ্খলা, বিদ্রোহ, থেমে যায়। মুসলমানরা আবার ঘুরে দাঁড়ায়। শুধু ঘুরেই দাঁড়ায় নি বরং একটার পর একটা সফলতার সিঁড়ি ডিঙিয়ে, সমগ্র আরব উপদ্বীপ, মিশর, ইরাক, ইরানসহ ইউরোপের এক বিস্তীর্ণ এলাকা নিজেদের পদতলে নিয়ে আসে। অখ্যাত, অশিক্ষিত যাযাবর এক জাতি পৃথিবীর ইতিহাসে এক অনন্য সুসভ্য ও উন্নত জাতিতে পরিণত হয়ে যায়। এক বিশাল সাম্রাজ্যের মালিক হয়ে যায়। জগতের পরাশক্তিতে পরিণত হয়। কেউ নাই তাদের সামনে দাঁড়ানোর, কেউ নাই তাদের মোকাবিলা করার। এককথায় খিলাফতে রাশেদা ইসলামের উন্নতি ও বিজয়ের এক বিস্ময়কর চাবিকাঠি ছিল।

আহমদীদের দৃষ্টিতে খিলাফতের আধ্যাত্মিক কল্যাণরাজি

মুসলিম উম্মাহ একথাটি খুব ভালোভাবে জানে, এই উম্মতের অধঃপতন এবং পশ্চাদপদতার একমাত্র কারণ হলো, খিলাফত হতে বঞ্চিত থাকা আর এর আধ্যাত্মিক উন্নতি ও শ্রেষ্ঠত্বের রহস্য শুধু এবং শুধুমাত্র খিলাফত প্রতিষ্ঠার মাঝেই নিহিত। একথা স্বীকার করে আহলে হাদীস পত্রিকায় ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ সংখ্যায় লেখা হয়েছে যে, “জীবন সায়াহে পুনরায় যদি একবার নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফতের দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য হয়ে যায় তাহলে হতে পারে ইসলাম ধর্মের বিশৃঙ্খল অবস্থা শুধরে যাবে বা সুশৃঙ্খল হয়ে যাবে আর

অসম্ভব খোদা পুনরায় দয়াপরবশ হবেন। আর ঘূর্ণিপাকে নিপতিত ইসলামরূপী নৌকা হয়ত কোনোভাবে এই বিপদ থেকে রেহাই লাভ করে নিরাপদ তীরে পৌঁছে যাবে।” (কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত আল-বদর, ১০-১৭ মে ২০০৭ সংখ্যা)

জুলফিকার আলী শাহ বেরেলভী সাহেব ‘চেরাগ রাহনুমায়ে জাহাঁ’-তে লিখেন, “খলীফা যদি না থাকেন তাহলে বিশ্ববাসীর সংশোধন কে করবেন? তাই খলীফার উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ মানুষের জন্য শ্রেয় হলো, খোদার খলীফার সন্ধান করে (তঁার) আনুগত্য করা। সবসময় খলীফার উপস্থিতি আবশ্যিক।” (চেরাগ রাহনুমায়ে জাহাঁ, পৃ. ৪-৬)

অনুরূপভাবে শাহেদ বদর ফালাহী সাহেব সাপ্তাহিক ‘নতুন দুনিয়া’ পত্রিকায় লিখেন, “খিলাফত ছাড়া ধর্ম জয়যুক্ত হতে পারে না আর ন্যায়বিচার ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না এবং শিরকপূর্ণ ব্যবস্থাপনা নির্মূল হতে পারে না আর না-ই নামায পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। যাকাতের পুরো ব্যবস্থাপনা কার্যকর হতে পারে না আর আল্লাহর রসূলের পূর্ণ আনুগত্যও হতে পারে না এবং মুসলমানদের অবস্থারও সংশোধন হতে পারে না। খিলাফতবিহীন জীবন কাটানো অজ্ঞতার শামিল বরং বেঁচে থাকাও অর্থহীন। খিলাফত ছাড়া ইসলাম পঙ্গু, বিকলাঙ্গ ও খোড়া ও ল্যাংড়া।” (সাপ্তাহিক ‘নতুন দুনিয়া’, ১১ মার্চ, ১৯৯২)

আল্লামা ইকবাল লিখেন,

‘তা খিলাফত কি বিনা, দুনিয়া মে হো ফের ইসতোয়ার’

‘লা কাহিঁ সে চুনড কার আসলাফ কা কালব ও জিগার’

অর্থাৎ, নিজেদের প্রবীণ বা বুয়ূর্গদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাকে কোথা হতে খুঁজে বের করে আনো; যাতে পৃথিবীতে খিলাফত ব্যবস্থাপনা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

মোটকথা আজ আমাদের বিরোধীরাও একথা মানতে বাধ্য যে, খিলাফত প্রতিষ্ঠা ছাড়া মানবজাতির আধ্যাত্মিকতার পানে ফিরে আসা সম্ভব নয়। এ কারণেই উম্মতে মুসলিমা দীর্ঘকাল থেকে এই চেষ্টায় রত যে, কাকে খলীফা বানানো যায়। কিন্তু তারা একথাটি বুঝে না, মানুষ নয় বরং খোদা খলীফা বানান। এটি তাঁর প্রতিশ্রুতি যে, আমি খলীফা বানাবো। পরিতাপ হলো, খোদার প্রতিষ্ঠিত খিলাফত (এরা) মানে না বরং নিজেদের মনগড়া খলীফাকে

খোদাকে দিয়ে মানাতে চায়। ইতিহাস সাক্ষী, যতদিন পর্যন্ত মুসলমানরা খোদার মনোনীত খলীফার আনুগত্য করেছে ততদিন তারা সেসব কল্যাণের উত্তরাধিকারী হয়েছে যার প্রতিশ্রুতি খোদা দিয়েছেন আর যখনই তারা খোদার দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নেয়ার চেষ্টা করেছে তখন থেকেই অনবরত ব্যর্থতা আর অকৃতকার্যতার সম্মুখীন হয়েছে। এটিই সেই রহস্য যার প্রতি খোদা তা'লা মানবজাতির মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন,

لَيْسَ شُكْرُكُمْ لَازِيْدَتَكُمْ وَلَيْسَ كُفْرُكُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ ۝

(সূরা ইবরাহীম: ৮)

অর্থাৎ, যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও তাহলে আমি তোমাদেরকে আরো দান করব আর তোমরা যদি অকৃতজ্ঞ হও তাহলে অবশ্যই আমার শাস্তি বড়োই কঠোর। এ থেকে সুস্পষ্ট হয়, খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ততা এবং আনুগত্য যেখানে মানবের আধ্যাত্মিক ও দৈহিক উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করছে সেখানে খিলাফতের অস্বীকার এবং অকৃতজ্ঞতা খোদার শাস্তিকে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছে। এমন লোকদের সম্বোধন করেই হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) বলেন, “আমার শেষ বার্তা হলো, যুগ ইমামের কাছে মস্তক অবনত করো। খোদা যাকে প্রেরণ করেছেন, তাকে গ্রহণ করো। তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদের নেতৃত্বদানের যোগ্যতা রাখেন। খোদার প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বকে অস্বীকার করার পর তোমাদের জন্য নিরাপত্তা ও সফলতার কোনো পথ খোলা নাই। ...আমি তোমাদেরকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, ...আজ যদি তোমরা খোদার মনোনীত নেতৃত্বের সামনে মাথা নত করো তাহলে বিশ্বে ইসলামের নববিজয়ের এমন এক মহান আন্দোলন শুরু হবে যে, বিশ্বের কোনো শক্তিই এর মোকাবিলা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না।” (জুমুআর খুতবা, ৩ আগস্ট, ১৯৯০)

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) বলেন, “কুদরতে সানীয়া বা দ্বিতীয় কুদরত খোদার পক্ষ হতে অনেক বড়ো একটি নিয়ামত। যার উদ্দেশ্য হলো, জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা আর বিভেদ মুক্ত বা দলাদলি থেকে নিরাপদ রাখা। এটি সেই মালার মতো যাতে জামা'ত পুথি বা মুক্তার ন্যায় গ্রথিত থাকে। পুথি যদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে তাহলে সেগুলো সুরক্ষিতও থাকে না আর দেখতেও ভালো দেখায় না। একটি মালায় গাঁথা পুথিই খুব সুন্দর ও সুরক্ষিত থাকে। কুদরতে সানীয়া যদি না থাকে তাহলে ইসলাম কখনো উন্নতি

করতে পারে না। কাজেই এই কুদরতের সাথে পূর্ণ নিষ্ঠা, ভালোবাসা, বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতার সম্পর্ক বজায় রাখো আর খিলাফতের প্রতি আনুগত্যের প্রেরণাকে স্থায়ী রূপ দাও আর এর প্রতি ভালোবাসার প্রেরণাকে এতটা সমৃদ্ধ করো যেন এই ভালোবাসার মোকাবিলায় অন্য সকল সম্পর্ক তুচ্ছ মনে হয়। ইমামের সাথে নিবিড় সম্পর্ক বন্ধনের মাঝেই সকল কল্যাণ নিহিত। আর আপনাদের জন্য সব ধরনের নৈরাজ্য এবং বিপদাপদ মোকাবিলায় তিনি একটি ঢাল।... আমাদের সকল উন্নতির ভিত্তি বা রহস্য খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ততার মাঝেই নিহিত।” (রাবওয়াহ থেকে প্রকাশিত দৈনিক আল ফযল, ৩ মে, ২০০৩)

খিলাফত এক ঐশী রাজত্ব

খিলাফত এক ঐশী রাজত্ব, জাগতিক কোনো রাজাবাদশাহর সাথে এর তুলনা চলে না। কাজেই, আমরা যখন খিলাফতের মাধ্যমে ইবাদত প্রতিষ্ঠার কথা বলি তখন এর অর্থ কেবল লোকদেখানো নামায, রোযা এবং যাকাত প্রতিষ্ঠা নয় বরং ইবাদতের সত্যিকার চেতনা অনুসারে তা প্রতিষ্ঠা করাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রত্যেক সে কাজের নাম ইবাদত যা খোদার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে করা হয়। এমনকি মহানবী (সা.) বলেছেন, একজন স্বামী যদি খোদার সন্তুষ্টির খাতিরে তার স্ত্রীর মুখে একটি লোকমা বা এক গ্রাস খাবারও তুলে দেয় তাহলে সেটিও ইবাদত। মোটকথা, ধর্ম, বর্ণ ও জাতি নির্বিশেষে সব মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা আর মানুষের কল্যাণ ও হিত কামনায় রত থাকা, এতিম, মিসকিন, বিধবা ও দরিদ্রদের প্রতি যত্নবান থাকা ইবাদতের একটি লাযেমী বা অপরিহার্য অংশ। এগুলো ছাড়া নামায-রোযাও সম্পূর্ণ হয় না। বরং মানবের প্রতি সহানুভূতিহীন নামায সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তা মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহ তা'লা বলেন,

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَكْذِبُ بِالْدِّينِ ○ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ
وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ○ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ
الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ○ الَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ○
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ○

অর্থাৎ, তুমি কি সে ব্যক্তিকে দেখেছ যে দীনকে মিথ্যা বলে অস্বীকার করে, বস্তুত সে-ই ঐ ব্যক্তি যে এতিমদের তাড়িয়ে দেয় আর মিসকীনদের অনু দানে (লোকদের) উৎসাহিত করে না। অতএব এমন নামাযীর জন্য ধ্বংস যারা তাদের নামাযের মর্ম সম্পর্কে উদাসীন এবং লোকদেখানো কাজ করে। এবং যারা দৈনন্দিন ব্যবহার্য সামগ্রীও (লোকদের) দিতে নিষেধ করে। (সূরা আল-মাউন)

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এই সূরার ব্যাখ্যায় বলেন, “ইসলামী আইন বা সংবিধান খিলাফতের সাথে সম্পর্কিত আর খিলাফতের অর্থ হলো, সকল মুসলমান যেন এর অধীনস্থ হয়ে যায়। ... আল্লাহর রাজত্ব মূলত আরশে অধিষ্ঠিত, পৃথিবীতে শুধু তার ছায়া বিরাজমান। আর পবিত্র কুরআনে এই প্রতিশ্রুতি রয়েছে, প্রতিটি আক্রমণ, যা তাঁর রাজত্বের ওপর হবে, তা মূলত আমাদের ওপর হবে। আর প্রত্যেক শত্রু, যে তাঁর ওপর আক্রমণ করবে, সে আমাদের শত্রু হবে আর আমরা স্বয়ং তার মোকাবিলা করব। এই খিলাফত যখনই প্রতিষ্ঠিত হবে তা আধ্যাত্মিক হবে, যেভাবে আমি স্বয়ং নিজেকে খলীফা বলি। এটি জানাকথা, আমার খিলাফতের অর্থ জাগতিক খিলাফত নয়। ... আমি যদি আমার এই দাবিতে মিথ্যা হই তাহলে খোদা স্বয়ং আমাকে শাস্তি দিবেন। আর আমি যদি সত্য হই তাহলে মানুষের বিরোধিতা আমার কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। যাহোক, খিলাফত ব্যবস্থাপনা ছাড়া পৃথিবীতে কোনোভাবেই ঐশী রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কিন্তু যদি এটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তাহলে পৃথিবীতে এর চেয়ে উত্তম রাজত্ব আর হতে পারে না। (এ আয়াতগুলোতে) আল্লাহ তা’লা এর উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, তোমরা ঐশী রাজত্বের অস্বীকারকারীকে দেখেছ কি? এমন মানুষ কখনোই উন্নত নৈতিক জীবনযাপন করতে পারে না সে অপকর্মে জর্জরিত থাকে আর প্রবৃত্তির তাড়নায় জর্জরিত থাকে। (আল-মাউন, তফসীরে কবীর, ১০ম খণ্ড)

এখন খোদা বলেছেন, সত্যিকার ইবাদত প্রতিষ্ঠা মূলত বিশ্ব খিলাফত ব্যবস্থার মাধ্যমে হবে আর উক্ত আয়াত বলছে, ইবাদতের মধ্যে গোটা বিশ্বের এতিম ও মিসকীনদের প্রতি যত্নবান থাকাও অন্তর্ভুক্ত। অতএব জানা গেল, খিলাফত ব্যবস্থাপনার বিরোধী সত্যিকার অর্থে নামায-রোযারই বিরোধী নয়, সে এতিমদের তাড়িয়ে দেয় আর মিসকীনদের ক্ষুধার জ্বালায় মারে। এরা এতিম ও মিসকীনদের জন্য যাকাত প্রদান করে না। দিলেও তাদের শাসকরা তা

মেরে খায়। অন্যায়ভাবে মিসকীনদের সম্পদ হরণ করে। এরা স্বার্থপর মানুষ। এরা যদি দরিদ্রদের সাহায্য করে তবে তা শুধুমাত্র লোকদেখানোর জন্যই করে। তাদের ইবাদত কোনো কাজে আসে না বরং এগুলো লোকদেখানো ইবাদত। যার ভিত্তিই অন্যায়ের ওপর তা তাদেরকে আরো ধ্বংস বা দুর্ভোগের দিকে নিয়ে যাবে।

খিলাফতের মাধ্যমে পৃথিবীতে তওহীদ প্রতিষ্ঠিত হয়

আধ্যাত্মিক জীবনের উৎস হলো আল্লাহ তা'লার সন্তা। নবীগণ পৃথিবীতে খোদা তা'লার বৈশিষ্ট্যাবলীর বিকাশস্থল হিসাবে আবির্ভূত হন। তাঁদের পর খিলাফতও সেভাবেই ঐশী গুণরাজির বিকাশস্থল হন। আর খিলাফতের সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রক্ষাকারীরাও হাবলুল্লাহ বা আল্লাহর রজ্জুর রং ধারণ করে, তারা শুধুমাত্র মৌখিকভাবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে বুলিসর্বস্ব তৌহিদের দাবি করে না বরং খিলাফতের কল্যাণে তারা এক দেহতুল্য হয়ে মর্তমান তৌহিদের বিকাশস্থল হয়ে যায়। নবীর পর যুগ খলীফার নেতৃত্বে পুরো জামা'ত এক দেহে পরিণত হয়। যেমনটি মহানবী (সা.) বলেছেন, মু'মিনদের দৃষ্টান্ত এক দেহের মতো, এর এক অংশে বেদনা হলে পুরো দেহ-ই সেই বেদনা অনুভব করে। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল আদব)

মোটকথা, কলেমা তৈয়্যবার অর্থ শুধুমাত্র মৌখিকভাবে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলা নয় বরং খোদার তৌহিদ বা একত্ববাদের ব্যবহারিক প্রদর্শন করা। আর তৌহিদ বা একত্ববাদের ব্যবহারিক প্রদর্শন “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”-এর সাথে “মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ” বলা ছাড়া অর্থাৎ তাঁর শিক্ষার ওপর আমল করা ছাড়া সম্ভব নয়। যেমনটি আল্লাহ তা'লা আয়াতে ইন্তেখলাফে মুসলমানদের সামনে সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, শিরকের মূলোৎপাটন আর মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা মোতাবেক খিলাফতের নেতৃত্বে, এক দেহে পরিণত হয়ে আমল করা ছাড়া ঐশী ইবাদত প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তোমরা যদি খিলাফতের নেতৃত্বে এক দেহে পরিণত হয়ে কাজ না করো এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ঘৃণাবিদ্বেষ ছড়াতে থাকো আর নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে থাকো তাহলে শুধু মৌখিকভাবে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ” বলায় কোনো লাভ হবে না। মৌখিকভাবে যদি তৌহিদ বা একত্ববাদের ঘোষণা দাও তাহলে সেই শিক্ষার প্রতি ঈমান এনে সংকর্ম করো আর এক খোদার খলীফার নেতৃত্বে এক দেহে

পরিণত হয়ে যাও। যার প্রতিটি অঙ্গ অপর অপের প্রতি যত্নবান থাকে। অপর অংশের বেদনা অনুভব করে আর তা দূর করতে সচেষ্ট থাকে।

এটি হলো সেই খিলাফত, যার হাতে খোদা তা'লা পুরো বিশ্বকে এক দেহে পরিণত করে ব্যবহারিক তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করতে চান। নিঃসন্দেহে বিভিন্ন জাতি জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিজ নিজ রাষ্ট্র পরিচালনা করে গেছে কিন্তু আধ্যাত্মিকভাবে যখন গোটা বিশ্বের একজন খলীফা হবেন, যিনি পূর্ব-পশ্চিম এবং উত্তর-দক্ষিণের সকল মানুষের বেদনা অনুভব করবেন, তাদের জন্য দোয়া করবেন, তখন খোদার সত্যিকার তৌহিদ প্রতিষ্ঠিত হবে। তা কলেমা তাইয়েবার মূর্তিমান চিত্র হবে। বিশ্ব আধ্যাত্মিকভাবেও উন্নতি করবে আর জাগতিকভাবেও। এভাবে গোটা বিশ্বে যেখানে এক খোদার সত্যিকার ইবাদত প্রতিষ্ঠিত হবে সেখানে শিরকও নির্মূল হবে। এরপর তারা খোদার ওপর ভরসাকারী হবে আর পৃথিবীর মিথ্যা উপাস্যদের প্রতি দ্রষ্টব্যহীন হয়ে যাবে। আর হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর ভাষায় খিলাফত এতিমদের পিতা হবে। বিধবাদের সোহাগ হবে, নিরপরাধ ও মিসকীনদের সহায়ক হবে। খিলাফত প্রতিষ্ঠা ছাড়া মানুষের এই উন্নতি কখনোই সম্ভব নয়। এমন খিলাফত থেকে যে পৃথক হয়ে যাবে সে মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ মোতাবেক অঙ্গতার মৃত্যুবরণ করবে।

কিছুটা চিন্তা করে দেখুন! খিলাফতের জন্য শর্ত হলো ঈমান ও সৎকর্ম। অবস্থা অনুযায়ী কর্মকে সৎকর্ম বলে। আর যে কর্ম অবস্থা অনুযায়ী নয় তাকে যুলুম বা অন্যায় বলা হয়। আরবী অভিধানে আছে, “ওয়াযউশ শাইয়ি ফি গাইরি মাহাল্লিহি যুলুমুন” অর্থাৎ কোনো বস্তুকে তার উপযুক্ত স্থানে না রাখা, কোনো কাজকে যথার্থরূপে না করাকে যুলুম বলা হয়। মোটকথা সৎকর্মের বিপরীত হলো, যুলুম বা অন্যায়।

আল্লাহ তা'লা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আমি তোমাকে ইমাম (অর্থাৎ নবী) বানাতে যাচ্ছি। তিনি নিবেদন করেন, আমার সন্তানদের মধ্য হতেও কি? আল্লাহ বলেন, (নিশ্চয় কিন্তু) যে যালেম হবে অর্থাৎ সৎকর্ম না করবে সে আমার এই প্রতিশ্রুতিভুক্ত নয়। এরপর কাবাগৃহকে পুরো বিশ্বের কেন্দ্র বানানোর উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ তা'লা বলেন,

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

(সূরা আল বাকারা: ১২৬)

অর্থাৎ, মাকামে ইবরাহীম-কে নামাযের স্থান বানাও। অর্থাৎ, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মতো আনুগত্য ও বিশ্বস্ততাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করো তাহলে তোমরা ইমামতের কল্যাণরাজি লাভ করবে। সেই কল্যাণ- যার কেন্দ্র হলো, কাবাগৃহ। যা মূলত আধ্যাত্মিক জীবনের উৎস বা প্রস্রবণ।

এই আধ্যাত্মিক জীবনের উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, “যেভাবে মসজিদ কাবাগৃহের স্মরণ বা স্মৃতিকে অল্লান রাখে অনুরূপভাবে খিলাফত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্মরণকে অল্লান রাখে। এটি সেই নির্দেশ যা আল্লাহ তা’লা এই আয়াতে দিয়েছিলেন,

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

(সয়ারে রুহানী, পৃ. ১৫৪)

কাজেই, সৎকর্মের দাবি হলো, আজ আমরাও খিলাফতের সাথে বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে ইবরাহীমের আদর্শকে অবলম্বন করি। আর মাকামে ইবরাহীম হলো, “আসলামতু লিরাব্বিল আলামীন” (অর্থাৎ, আমি তো বিশ্বজগতের প্রভুর সমীপে আত্মসমর্পণকারী) এর ধ্বনি উচ্চকিত করার নাম। এই উদ্দেশ্যেই কাবাগৃহের ভিত্তি রচনা করা হয়েছিল। যার জন্য হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-কে প্রেরণ করা হয়েছে আর এরপর তাঁর নিষ্ঠাবান দাসের মাধ্যমে আহমদীয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির রহস্য এতেই নিহিত যেন (আমরা) সেই খিলাফতের হাত ও বাহু হয়ে বিশ্বে এক ও অদ্বিতীয় খোদার তৌহিদ প্রচারকারী হই। যাতে গোটা বিশ্ব এক খোদার ঐশী রাজত্বের অধীনে এসে যায় আর এক নবীর শরীয়ত অনুযায়ী কাবাগৃহকে নিজেদের তৌহিদের কেন্দ্র বানিয়ে এথেকে উৎসারিত প্রকৃত শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত হয়। যেখানে ধনী-দরিদ্র, বাদশাহ-ফকির আর রাজা-প্রজা সবাই খোদার দৃষ্টিতে একই কাতারে দণ্ডায়মান আর বিশ্ববাসী নিজ জীবনের মূল লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়।

যেমনটি বলা হয়েছে, খোদা তা’লা বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলদের সাথে খিলাফতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আরো বলেছেন, ‘ইন্নালাহা লা ইউখলিফুল

মিয়াদ' অর্থাৎ, আল্লাহ তা'লা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। এই নীতিকে দৃষ্টিতে রেখে পবিত্র কুরআনের প্রতি দৃষ্টি দিলে যেখানে যেখানে 'আল্লাহীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাতি'-এর উল্লেখ রয়েছে সেখানে মূলত নবুয়তের পাশাপাশি খিলাফতেরও উল্লেখ রয়েছে। পবিত্র কুরআনের আরো অনেক স্থানে আধ্যাত্মিক জীবনকে খিলাফতের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'লা বলেন,

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝
(সূরা আত-তীন: ৫-৬)

অর্থাৎ, মানব ইতিহাস সাক্ষী যে, আমরা মানুষকে বিবর্তনের সর্বোত্তম প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করেছি। এরপর (তার নিজের অপকর্মের কারণে) আমরা তাকে আসফালা সাফেলীন বা হীন থেকে হীনতর অবস্থায় নামিয়ে দিয়েছি। তারা অতল গহ্বরে নিপতিত হয়েছে। এরপর বলেছেন,

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝
(সূরা আত-তীন: ৭)

অর্থাৎ, কেবল তারা ছাড়া যারা ঈমান আনে আর সৎকর্ম করে, অর্থাৎ যারা খিলাফতের সাথে যুক্ত আছে। তারা আসফালা সাফেলীন বা হীন থেকে হীনতর অবস্থায় নিপতিত হওয়া থেকেই কেবল রক্ষা পাবে না বরং বলা হয়েছে,

فَمَا يَكْذِبُكَ بَعْدَ الدِّينِ ۝
(সূরা আত-তীন: ৮)

অর্থাৎ, তাদের জন্য অফুরন্ত প্রতিদানও রয়েছে। খোদা তা'লা তাদের আধ্যাত্মিক জীবন প্রতিষ্ঠিত থাকার নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন।

একইভাবে অন্য আরেকটি সূরায় আল্লাহ তা'লা বলেন,

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَّاصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَّاصُوا بِالصَّبْرِ ۝
(সূরা আল-আসর: ২-৪)

অর্থাৎ, যুগের কসম! নিশ্চয় মানুষ এক বড়ো ক্ষতির মাঝে রয়েছে। সেসব লোক ছাড়া যারা ঈমান আনে আর সৎকর্ম করে আর পরস্পরকে সত্য কথা ও ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়।

এই সূরাতে আল্লাহ তা'লা বলে দিয়েছেন, শেষ যুগে সকল মানুষ— সে মুসলমান হোক বা অমুসলমান, সবাই ক্ষতির মাঝে থাকবে, কেননা সবাই ঈমান ও সৎকর্মহীন থাকবে। মুসলমানদের হৃদয় থেকে আশার কিরণ নিভে যাবে। তারা শক্তিদ্বর জাতিসমূহের প্রভাব-প্রতিপত্তিতে প্রভাবিত হবে। কিন্তু একটি দল ব্যতীত যারা ঈমান ও সৎকর্মরূপী সম্পদের প্রাচুর্যে ভরপুর থাকবে আর খোদার প্রতিশ্রুতি অনুসারে খিলাফতের সাথে যুক্ত থাকবে। বরং খিলাফতের কল্যাণে তারা নিজেরাও সত্যকথার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে আর অন্যদেরকেও সত্যের তবলীগ করতে বা উপদেশ দিতে থাকবে। (সূরা আল-আসর, তফসীরে কবীর, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৫৪৭)

তাদের ওপর বিপদাপদ আসবে, দুঃখকষ্টের প্লাবন বইতে থাকবে। তাদের জীবন দুর্বিষহ করে তোলার চেষ্টা করা হবে। তাদেরকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে বাঁধা দেওয়া হবে। শিরক করতে বাধ্য করা হবে। তাদের জন্য ইবাদতের দ্বার রুদ্ধ করা হবে। কিন্তু তারা এসব কষ্ট ও কাঠিন্য হাসিমুখে সহ্য করবে। নিজেরাও সহ্য করবে আর অন্যদেরকেও ধৈর্যের উপদেশ দিবে। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, “এসব আয়াত থেকে এসত্য কথাটি সুস্পষ্ট হয়, মু'মিনদের ধর্ম— জাতীয় হয়ে থাকে, তার পবিত্র বাসনা শুধুমাত্র তার ব্যক্তিসত্তা পর্যন্তই সীমিত থাকে না বরং গোটা মানবজাতি পর্যন্ত প্রস্তুত হয়ে যায়। সে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের এক শক্তিশালী সাহায্যকারী হয় এবং সকল ছোটো ও বড়োকে এক জামা'তভুক্ত করতে চায়। সে শুধু নিজেই পুণ্যবান হতে চায় না বরং এটিও চায়, আমার সঙ্গীও যেন নেক বা পুণ্যবান হয় আর পৃথিবীতে শান্তি ও ঐক্যের ভিত্তি এরূপ সুদৃঢ় হয় যে, কোনো ভূমিকম্প এতে কাঁপুনি ধরাতে না পারে। ... যে জাতির লোকদের মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় সেই জাতিকে কেউ ধ্বংস করতে পারে না। তারা অবশ্যই জয়যুক্ত হয়।” (সূরা আল আসর, তফসীরে কবীর, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৬)

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) খোদার সেসব অধম বান্দার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, “খোদা তাদের প্রতি সবচেয়ে বেশি বিপদাপদ নাযিল করেন, কিন্তু এই

উদ্দেশ্যে নয় যে, তারা ধ্বংস হয়ে যাবে বরং এ জন্য যাতে তারা আরো বেশি ফুলেফলে সুশোভিত হয়। তাদেরকে চরম ঘূর্ণাবর্তে নিক্ষেপ করা হয় কিন্তু নিমজ্জিত করার জন্য নয় বরং এই জন্য যাতে তারা সেসব মণিমাণিক্যের উত্তরাধিকারী হয় যা তৌহিদ বা একত্ববাদরূপি সমুদ্রের গভীরে বা পাতালে রয়েছে। তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয় কিন্তু ভস্মীভূত করার জন্য নয় বরং এজন্য যাতে খোদা তা'লার কুদরত বা মহিমারাজি প্রকাশিত হয়। তাদের সঙ্গে ঠাট্টাবিদ্রূপ করা হয় এবং অভিসম্পাত করা হয় আর তাদেরকে সকল প্রকার কষ্টযাতনা দেয়া হয় এবং দুঃখ দেয়া হয় আর বিভিন্ন প্রকার অপলাপ তাদের সম্পর্কে করা হয়, আর কুধারণা বৃদ্ধি পায়... যে ব্যক্তি তাকে দুঃখ দেয় এবং অভিসম্পাত বর্ষণ করে সে আপন মনে খেয়াল করে, অনেক পুণ্যের কাজ করছে ...অতএব সে ধৈর্য ধারণ করতে থাকে, এমনকি নির্ধারিত বিষয় স্বীয় নির্ধারিত সীমায় পৌঁছে যায় তখন ঐশী আত্মাভিমান সেই গরীব বা অসহায়ের জন্য জাগ্রত হয় আর একটি মাত্র ঝটকায় এসব শত্রুকে টুকরো টুকরো করে ফেলে।” (আনওয়ারুল ইসলাম, রুহানী খাযায়েন, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৫২-৫৩)

গালিগালাজ শুনে দোয়া করো আর কষ্ট পেয়ে আরাম

বা স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করো

অহমিকার অভ্যাস দেখে তুমি বিনয় প্রদর্শন করো

মানুষের রাগ ও ক্রোধ দেখে তুমি কোনো দুঃখ করো না

(মনে রেখো!) বৃষ্টির স্বাদ পেতে হলে গরমের তীব্রতা তো সহ্যেই হবে।

আজ যেখানে অন্যান্য জাতি নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অন্যের ওপর অবিচার চালায় বা অন্যায়ভাবে অপরের ধনসম্পদ হরণের চেষ্টা করছে, সেখানে আহমদীয়া খিলাফত— বিরোধীদের পক্ষ হতে নিজ অনুসারীদের দেয়া সকল প্রকার দুঃখকষ্ট সত্ত্বেও, সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে আর নিজ জামা'তকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়ে, সকল মানুষের দুঃখবেদনা ভাগ করে নেয়ার এবং তাদেরকে শান্তি প্রদানের আর ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অবিরাম চেষ্টারত। যা একথার বাস্তব প্রমাণ বহণ করে, ভবিষ্যতে মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের নিশ্চয়তা আমেরিকাও দিতে পারে না, রাশিয়া এবং চীনও দিতে পারে না, জাপান, ইউরোপ এবং এশিয়াও দিতে পারে না, পৃথিবীর অন্য কোনো

দেশ বা পরাশক্তিও দিতে পারে না। বরং কেবলমাত্র খোদা তা'লা-ই এই নিশ্চয়তা দিতে পারেন। আর আজ এর জন্য কেবল একটিই মাধ্যম খোদা তা'লা সৃষ্টি করেছেন আর তা হলো, এই শেষ যুগে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে খোদার মনোনীত 'খিলাফত'। যে এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে খোদা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় আর স্বয়ং নিজের মৃত্যু নিজেই ডেকে আনে।

আধ্যাত্মিক উন্নতি খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত

আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি আজ শুধুমাত্র ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত আর ইসলামের পুনর্জীবন হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর কল্যাণে আর এর পূর্ণতা খিলাফতের মাধ্যমে নির্ধারিত। এখন ঐশী খিলাফতের নেতৃত্বে এই আধ্যাত্মিক মিশন সম্পন্ন হবার সংবাদ দিতে গিয়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, “(আল্লাহ ছাড়া) অন্য সব উপাস্য ধ্বংস হবে। আর মিথ্যা খোদা স্বীয় ঈশ্বরত্বের সত্তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আর সেসব মন্দ শক্তিও মরবে যারা সেসব মিথ্যা উপাস্যকে গ্রহণ করত। নতুন পৃথিবী সৃষ্টি হবে আর নতুন আকাশ হবে। এখন সেদিন সন্নিহিত যখন সত্যের সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। আর ইউরোপ সত্য খোদা সম্পর্কে জ্ঞাত হবে। এরপর তওবার দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে, কেননা প্রবেশকারীরা বড়ো জোরের সাথে এতে প্রবেশ করবে আর তারাই বাদ পড়ে যাবে প্রকৃতিগতভাবে যাদের হৃদয়ের দরজা বন্ধ আর যারা জ্যোতি নয় বরং অন্ধকারকে ভালোবাসে। অচিরেই সকল ধর্ম ধ্বংস হবে কেবল ইসলাম ছাড়া। আর সকল অস্ত্র ভেঙে যাবে কেবল ইসলামের ঐশীঅস্ত্র ব্যতিরেকে। যতক্ষণ পর্যন্ত তা দাজ্জালিয়াতকে টুকরো টুকরো না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা ভাঙবে না আর ভোঁতাও হবে না। সেসময় সন্নিহিত, যখন খোদার সত্য বা খাঁটি তৌহিদ যা অরণ্যে বসবাসকারী আর সকল শিক্ষা থেকে বঞ্চিতরাও নিজেদের ভিতর অনুভব করবে, তা সকল সকল দেশে ছড়িয়ে পড়বে। সেদিন না কোনো কল্পিত কাফফারা বা প্রায়শ্চিত্ত আর না কোনো কল্পিত উপাস্যের অস্তিত্ব থাকবে। আর খোদার একটি হাতই কুফরীর সকল চেষ্টাপ্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিবে কিন্তু কোনো তরবারি দ্বারা নয় আর না কোনো বন্দুক দ্বারা। বরং চেষ্টারত আত্মাদের জ্যোতি দান করার মাধ্যমে আর পবিত্র হৃদয়সমূহের ওপর নূর বা জ্যোতি অবতীর্ণ করার মাধ্যমে। তখন আমি যা বলছি সেসব কথা সহজেই বুঝতে পারবে।” (মজমুয়া ইশতিহারাত, ২য় খণ্ড)

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, “হে লোকসকল, স্মরণ রেখো! তাদের শত্রুতায় ইসলামের কোনো ক্ষতি হতে পারে না। তারা পোকামাকড়ের মতো আপনা-আপনিই মরে যাবে। ইসলামের নূর বা জ্যোতি প্রতিন্যাত উন্নতি করবে। খোদা তা’লা বিশ্বজুড়ে ইসলামের জ্যোতিকে বিস্তৃত করতে চেয়েছেন, খোদা তা’লা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, আমি তোমাকে সম্মান দান করব আর তোমার কর্মকাণ্ডে কল্যাণ সৃষ্টি করব, এমনকি রাজাবাদশাহও তোমার বস্ত্র হতে কল্যাণ অন্বেষণ করবে। এখন হে মোল্লার দল! হে কৃপণের দল! যদি শক্তি থাকে তাহলে খোদা তা’লার এই ভবিষ্যদ্বাণীসমূহকে অকার্যকর বা ব্যর্থ করে দেখাও। সব ধরনের চেষ্টাপ্রচেষ্টা করো, কোনো প্রকার প্রতারণা করতে বাকি রেখো না তারপর দেখ! খোদার হাত বিজয়ী হয় নাকি তোমাদের হাত।” (তবলীগে রিসালত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯২)

এরপর তিনি (আ.) আরো বলেন, “আমি জোরালো দাবি ও দৃঢ়তার সাথে বলছি, আমি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত আর খোদা তা’লার কৃপায় এক্ষেত্রে আমার জয় সুনিশ্চিত। আর যতটুকু দূরদৃষ্টির ভিত্তিতে আমি দেখছি, তাতে গোটা বিশ্বকে আমার সত্যতার অনুবর্তী দেখতে পাচ্ছি। আর অচিরেই আমি এক মহান বিজয় লাভ করব, কেননা আমার কথার সমর্থনে অন্য আরেকটি মুখ কথা বলছে এবং আমার হাতকে শক্তিশালী করার জন্য অন্য আরেকটি হাত কার্যকর, বিশ্ব তাকে দেখতে পায় না, কিন্তু আমি দেখছি। আমার ভিতর এক ঐশীসত্তা কথা বলছে, যে আমার প্রতিটি শব্দে এবং অক্ষরে অক্ষরে প্রাণ সঞ্চার করছে আর ঊর্ধ্বলোকে একটি প্রাণচাঞ্চল্য ও আবেগ-উচ্ছাস সৃষ্টি হয়েছে। যিনি একটি পুতুলের ন্যায় মাটির এই ঢেলাকে দণ্ডায়মান করেছেন। প্রত্যেক সে ব্যক্তি যার জন্য তওবার দ্বার রুদ্ধ হয় নি, সে অচিরেই দেখতে পাবে, আমি আমার নিজের পক্ষ থেকে নই।” (ইয়ালেয়ে আওহাম, রুহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০৩)

‘খিলাফতে আহমদীয়ার’ অফুরন্ত কল্যাণরাজির একঝলক

খিলাফতে আহমদীয়া চিরপ্রবহমান এক কল্যাণধারার নাম। অব্যাহত ধারায়প্রবাহিত শ্রোতস্বিনীর নাম। যাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে, যাঁর পবিত্র ছায়াতলে ১১০ বছর কাটিয়ে আমরা লাভ করেছি অনেক বিরল প্রাপ্তি। যা আমরা কখনো গুণে শেষ করতে পারব না। এর এক কিঞ্চিৎ ঝলকমাত্র উপস্থাপন করছি:

১. খিলাফতের নেতৃত্বে আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলামের ভিত ২২০টি দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
২. আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলামের পতাকাতলে ২০ কোটি মানুষ একত্রিত হয়েছে।
৩. বিশ্বব্যাপী ৭৬ টি ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।
৪. বিশ্বব্যাপী প্রায় ২০ হাজার মিশন হাউজ নির্মিত হয়েছে।
৫. বিশ্বব্যাপী প্রায় ১৮ হাজার মসজিদ নির্মিত হয়েছে।
৬. প্রতি বছর কোটি কোটি বইপুস্তক, পত্রপত্রিকা ইসলাম প্রচারের জন্য প্রকাশ ও বিতরণ হচ্ছে।
৭. ১৫টি জামেয়া প্রতিষ্ঠা, যা থেকে প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের জন্য শত শত মুবাল্লেগ তৈরি হচ্ছে।
৮. ওয়াকফে জাদীদ ও তাহরীকে জাদীদ প্রতিষ্ঠা করে আহমদীয়াতকে বিশ্বব্যাপী সম্প্রসার ও সমৃদ্ধকরণ।
৯. ওয়াকফে নও স্কিম প্রতিষ্ঠাতা যার অধীনে এ শতাব্দীতে লক্ষ লক্ষ ধর্মের নিবেদিত প্রাণ সেবক তৈরি হবে।
১০. বিশ্বব্যাপী (বিশেষকরে পাশ্চাত্যে) ইসলামকে শান্তির ধর্ম হিসাবে পরিচিত করা।
১১. বিশ্বব্যাপী শতাধিক অমুসলিম দেশে সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণের সুযোগ লাভ করা।
১২. বিশ্বব্যাপী শত শত অমুসলিম অধ্যুষিত শহরে মসজিদ নির্মাণ করা।
১৩. বিশ্বব্যাপী ২৪ ঘণ্টা ইসলামী অনুষ্ঠান সম্প্রচারকারী এক টিভি চ্যানেল 'এমটিএ' উপহার দেয়া।
১৪. ইন্টারনেটকে ইসলাম প্রচারের কাজে সুচারুভাবে ব্যবহার করা।
১৫. হিউম্যানিটি ফাস্ট নামে আন্তর্জাতিক এক মানবতার সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান উপহার দেয়া। যার মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষ সেবা পাচ্ছে।
১৬. নুসরাত জাহাঁ স্কিম উপহার দেয়া যার মাধ্যমে আফ্রিকার কোটি কোটি হতদরিদ্র মানুষ শিক্ষা, অন্ন, বস্ত্র, বিশুদ্ধ পানি, বাসস্থান, চিকিৎসা, বিদ্যুৎসহ অনেক সুবিধা পাচ্ছে।

১৭. বিশ্ববাসীকে শান্তিপ্ৰিয়, সুশৃঙ্খল, সম্ভ্রাসমুজ্জ, মানবতাবাদী, ধার্মিক, সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারকারী ও খাটি এক ইসলামী সংগঠন উপহার দেয়া। যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের খাতিরে ইসলাম প্রচারের জন্য নিজেদের উপার্জনের ষোল ভাগের এক ভাগ থেকে নিয়ে তিন ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত অবলীলায় স্বেচ্ছায় আমৃত্যু দান করে থাকে, এমনকি স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিও।

১৮. সর্বোপরি খলীফাও জগদ্বাসীর জন্য এমন এক ঐশী নেতা যিনি জগত থেকে শিরক ও বেদাত মিটানোর জন্য, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মর্যাদাকে সমুল্লত রাখার জন্য এক অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় কাজ করে যাচ্ছেন।

ইসলামের প্রচার ও প্রসারে বৈপ্লবিক কাজ সম্পাদন

খিলাফতে রাশেদার যুগে যেভাবে বিশ্বের এক বিস্তৃত এলাকায় ইসলামের বিস্তার ঘটানো হয়েছে তদ্রূপ খিলাফতে আহমদীয়া বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় কাজ করে যাচ্ছে। গুরুত্রে আহমদীয়াত শুধুমাত্র ভারতবর্ষে সীমাবদ্ধ ছিল। যা বর্তমানে খিলাফতে আহমদীয়ার কল্যাণে ২২০টি দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এর ফলে পৃথিবীর অনেক দেশ এমন রয়েছে যেখানে প্রথমবারের মতো ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছে। লোকেরা ইসলাম গ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ৭০টি দেশ রয়েছে যেখানে অআহমদী মুসলমান রয়েছে। পক্ষান্তরে আহমদীয়াত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ২২০টি দেশে। অর্থাৎ বর্তমানে ১৪০টির অধিক অমুসলিম অধ্যুষিত দেশে খিলাফতে আহমদীয়ার কল্যাণে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আহমদীয়া খিলাফতের অধীনে বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ২০,০০০ স্থানে ইসলামের তবলীগ কেন্দ্র চালু রয়েছে যেখান থেকে দিনরাত ইসলাম প্রচার করা হচ্ছে।

গণ্ডগ্রাম কাদিয়ানে আজ থেকে ১৩৪ বছর পূর্বে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করে ৪০ জন পবিত্র ব্যক্তিত্বের যে ক্ষুদ্র দলটি আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছিল, বর্তমানে খিলাফতের কল্যাণে তাদের সংখ্যায় ২০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। তারা বিশ্বের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

আজ থেকে ১০০ বছর পিছনে যদি চলে যান তাহলে দেখবেন, একটা সময়

ছিল যখন খ্রিষ্টান পাদ্রীরা দোদগ্ধতা ও মহাবিক্রমে সারা দুনিয়া চষে বেড়াতো। সর্বত্র তাদের আনাগোনা ও জয়জয়কার ছিল। এতো ব্যাপক ভাবে ত্রিত্ববাদের প্রচার কাজে নিয়োজিত ছিল, তাদের সাথে মোকাবিলা করার কেউ ছিল না। তারা খালি মাঠে গোল দিয়ে যাচ্ছিল। তখন তাদের শতশত মিশনারী স্কুল ও কলেজ থেকে প্রশিক্ষিত হাজার হাজার মিশনারী বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি মানুষকে খ্রিষ্টান বানাচ্ছিল। তখন এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকাতে কোটি কোটি মুসলমান খ্রিষ্টান হয়েছে। শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই তখন ২৯ লক্ষ মুসলমান খ্রিষ্টান হয়েছে। এসব কারণে খ্রিষ্টানরা তখন সদর্পে ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছিল, সমগ্র বিশ্বকে খ্রিষ্টান বানানোটা এখন শুধু সময়ের ব্যাপার।

এ বিষয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) বলেন, “আমি ইউরোপকে বলে দিয়েছি, আমরা বিজয়ী হবে। পরিশেষে বিজয় আমাদের হবে। আগামী শতাব্দীর মধ্যেই সারা বিশ্বের ধর্ম ইসলাম হবে। ইসলাম বিজয় লাভ করবে।”

বর্তমানে আমরা এই বিজয়ের শতাব্দীতে আছি। ইনশাআল্লাহ এই বিজয় আমরা দেখব। ইতিমধ্যে এটা দৃষ্টিগোচর হতেও শুরু করেছে।

বিশ্বব্যাপী মসজিদ নির্মাণ

বিশ্বব্যাপী মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রেও খিলাফতে আহমদীয়ার অবদান অতুলনীয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে খিলাফতের তত্ত্বাবধানে ইসলাম নতুন নতুন দেশে বিস্তার লাভ করেছে। এরপর ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার বিস্তৃত এলাকাতে মসজিদ নির্মাণ করেছে। তারপর একটা সময় এমন এসেছে যখন একদিকে মুসলমানরা ইউরোপের এসব মসজিদ ফেলে দিয়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। তখন অপরদিকে খ্রিষ্টান পাদ্রীরা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়েছে। পৃথিবীর আনাচে কানাচে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় হাজার হাজার গির্জা বানিয়েছে। এ ক্ষেত্রে তাদের সাথে পাল্লা দেয়ার কেউ ছিল না।

কিন্তু বর্তমানে খিলাফতে আহমদীয়ার কল্যাণে ইসলাম তার হারানো সেই গৌরব ফিরে পেয়েছে। আহমদীয়া জামা'ত এখন পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী ১৮ হাজারের বেশি মসজিদ নির্মাণ করেছে। অমুসলিম দেশগুলোতে এবং বিশ্বের বড়ো বড়ো বিখ্যাত অমুসলিম শহরগুলোতে মসজিদ নির্মাণ করে চলেছে।

বার্লিন, লন্ডন, কোপেনহেগেন, ব্রাসেলস, হামবুর্গ, ফ্রাঙ্কফুট, হেগ, গুটেনবার্গ, জুরিখ, ওকল্যাণ্ড, অসলো, ক্যালিফোর্নিয়া, পোল্যাণ্ড, আরিজোনা, ব্রিনিদাদ, সুরিনাম, নাসপিট, রিও দি জেনেইরো প্রভৃতি শহরে আহমদীরাই সর্বপ্রথম মসজিদ বানিয়েছে। জার্মানী, ইংল্যান্ড ও ইউরোপের দেশগুলোতে আহমদীয়া জামা'ত আজ শত শত মসজিদ ইতিমধ্যে নির্মাণ করেছে।

অসংখ্য গির্জা ক্রয় করে আজ সেখানে মসজিদ বানানো হচ্ছে। খিলাফতের কল্যাণে আহমদীরা আজ লন্ডনে পশ্চিম ইউরোপের সবচেয়ে বড়ো মসজিদ বায়তুল ফুতুহ নির্মাণ করেছে। প্রায় ১০ হাজার লোক এতে নামাজ পড়তে পারে। ৭৫০ বছর পূর্বে যে স্পেন থেকে মুসলমানদেরকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল, মসজিদগুলোকে গির্জা ও মিউজিয়াম বানানো হয়েছিল, সেই স্পেনেও আবার আহমদীয়া খিলাফত প্রথম মসজিদ বানিয়েছে। এমনকি ইতিমধ্যে একাধিক মসজিদ বানিয়ে ফেলেছে। সম্প্রতি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ঘোরতর বিরোধী আলেকজান্ডার ডোই-এর যায়ন শহরে ঐতিহাসিক 'ফাতহে আযীম' (মহান বিজয়) মসজিদ উদ্বোধন করেন আমাদের প্রাণপ্রিয় খলীফা (আই.)।

কুরআনের অতুলনীয় সেবা

খিলাফতে রাশেদার যুগে কুরআনের অতুলনীয় সেবা করা হয়েছে। হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগে বিভিন্ন যুদ্ধে হাজার হাজার হাফেজে কুরআন শহীদ হন। তখন আশঙ্কা দেখা দেয় এভাবে হাফেজে কুরআনরা শহীদ হলে কুরআন সংরক্ষণ কীভাবে হবে? হযরত উমর (রা) হযরত আবু বকর (রা.)-কে পরামর্শ দেন কুরআনকে এক সাথে একত্র করে পুস্তক আকারে সংকলনের জন্য। প্রথমে হযরত আবু বকর (রা.) অসম্মতি জানান। বলেন, যে কাজ আল্লাহর রসূল করেন নি তা আমি কীভাবে করি। পরে সম্মত হন। আল্লাহর রসূলের যুগে যারা নাযিলকৃত ওহী সাথে সাথে লিখার দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন তাদের তিনজনকে এ দায়িত্ব দেয়া হয়।

পরবর্তীতে দেখা যায় পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় নতুন নতুন যারা মুসলমান হচ্ছিল তারা আঞ্চলিক উচ্চারণে কুরআন পাঠ করছে। ফলে ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা.) এই মূল কপি়র অনুকরণে আরো নয়টি কপি করে সেটা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পাঠান।

তদ্রূপ কুরআনের জ্ঞান উন্মোচন, কুরআনের প্রচার, কুরআনের অনুবাদ প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রেও খিলাফতে আহমদীয়ার অবদান স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো। খিলাফতের কল্যাণে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত এখন পর্যন্ত ৭৬টি ভাষায় কুরআনের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশ করেছে। আরও প্রায় অর্ধশত ভাষায় অনুবাদ প্রকাশের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া ১২০টি ভাষায় কুরআনের নির্বাচিত অংশের অনুবাদ প্রকাশ করেছে। বিগত ১৪শত বছরে অর্থাৎ ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম জাহান মাত্র ১৪টি ভাষায় কুরআনের অনুবাদ প্রকাশ করেছে। আর ১৯৩৬ সাল থেকে ২০১৮ পর্যন্ত মাত্র ৮২ বছরে আহমদীয়া জামা'ত ৭৬টি ভাষায় অর্থাৎ পূর্বের চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি ভাষায় কুরআন অনুবাদ প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছে।

এছাড়া আমাদের প্রাণপ্রিয় খলীফাগণ আমাদের ধরে ধরে কুরআন শিখিয়েছেন। কুরআনের গুপ্ত ভাণ্ডার, নতুন নতুন জ্ঞান আমাদের সামনে উন্মোচন করেছেন। প্রথম খলীফার তফসীর হাকায়েকুল ফুরকান, দ্বিতীয় খলীফার তফসীরে কবীর ও সগীর, আনওয়ারুল উলুম নামে প্রায় সাড়ে চারশ বইয়ের সংকলন। চতুর্থ খলীফার তফসীরে কুরআন, দরসুল কুরআন। এছাড়া প্রত্যেক খলীফার জুমুআর খুতবা পবিত্র কুরআনের এক বিস্ময়কর জ্ঞান ভাণ্ডার। এর চেয়ে সমৃদ্ধ ও যুগ উপযোগী তফসীর আর কেউ দেখাতে পারবে না।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মর্যাদাকে সম্মান রাখা

খাতামান্নাবীঈন, সাইয়েদুল মুরসালিন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মর্যাদাকে সম্মান রাখা, তাঁর প্রতি যে-কোনো ধরনের আক্রমণ প্রতিহত করা, তাঁর মহান শিক্ষা ও আদর্শকে জগতের সামনে তুলে ধরার ক্ষেত্রে আহমদীয়া খিলাফত সদা সোচ্চার। এ ক্ষেত্রে তাঁরা অতদূর প্রহরীর ন্যায় কাজ করে যাচ্ছেন।

আমাদের দ্বিতীয় খলীফার যুগে মহানবী (সা.)-এর অবমাননা করে ‘রঙিলা রসূল’ নামে একটি প্রবন্ধ লেখা হয়। হুযূর (রা.) তখন রসূল (সা.)-এর জীবনী ব্যাপকভাবে আলোচনার জন্য সীরাতুল্লাহী (সা.) জলসার প্রবর্তন করেন। ১৭ জুন ১৯২৮ সালে সমগ্র ভারতবর্ষে সীরাতুল্লাহী (সা.) জলসা উদ্‌যাপন করেন।

খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর যুগে সালমান রুশদী ‘সেটানিক ভার্সেস’

নামে এক নোংরা পুস্তক লিখে। হযূর (রাহে.) তার প্রতিবাদে জুমুআর খুতবা প্রদান করেন, পুস্তক লিখেন আর সেখানে দাঁতভাঙা জবাব দেন।

খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর যুগে ২০০৬ সালে পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট রসূল (সা.)-কে কটাক্ষ করেন। একই বছর ডেনমার্কের একজন কার্টুনিষ্ট রসূল (সা.) নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র আঁকে। হযূর (আই.) এর প্রেক্ষিতে ৫টি জুমুআর খুতবা প্রদান করেন। আহমদীদের সংশ্লিষ্ট পত্রিকাগুলোতে গণসংযোগ করতে, প্রবন্ধ লিখতে নির্দেশ দেন। ডেনমার্কের মুবাল্লেগ সাহেব সেই পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে পাঠান। প্রবন্ধ ছাপা হয়। পরবর্তীতে মোবাল্লেগ সাহেবকে সাংবাদিকদের আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি সেখানে তাঁর জোরালো বক্তব্য তুলে ধরেন। কার্টুনিষ্ট বলতে বাধ্য হয়, এমন আলোচনা পূর্বে হলে আমি কার্টুন আঁকতাম না।

২০১২ সালে The Innocence of Muslims নামে একটি নোংরা সিনেমা বানানো হয়। হযূর (আই.) ২১ সেপ্টেম্বর তাঁর জুমুআর খুতবায় এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। বিভিন্ন গণমাধ্যমে এর প্রতিবাদ করেন। হযূর (আই.) আহমদীদেরকে রসূল (সা.)-এর আদর্শ বেশি বেশি বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার আহবান জানান।

তথ্যপ্রযুক্তিকে ইসলামের কাজে ব্যবহার

তথ্যপ্রযুক্তিকে ইসলামের কাজে ব্যবহার এটাও আহমদীয়া খিলাফতের এক বিশেষ কল্যাণ। এ ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য ভূমিকা রেখেছে এমটিএ (মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া)। বিভিন্ন ভাষাভাষীদের জন্য মোট ৮টি চ্যানেল সংবলিত এই টিভি চ্যানেলটি ২৪ ঘণ্টা বিরামহীনভাবে সারা বিশ্বে খাঁটি ইসলামের বাণী প্রচার করে যাচ্ছে। এর ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিনিয়ত ইসলামের বাণী জানার, বুঝার ও মানার সুযোগ পাচ্ছে। আজ পৃথিবীর এমন কোনো জায়গা নাই যেখানে ইসলামের বাণী পৌঁছাচ্ছে না।

এমটিএ এই কাজের পাশাপাশি আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে যাচ্ছে। আর তা হলো—আপনারা সবাই জানেন, পাকিস্তানে আহমদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধে ১৯৭৪ ও ১৯৮৪ সালে জঘন্যতম ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। যে কারণে অবশেষে বাধ্য হয়ে আমাদের প্রাণপ্রিয় খলীফাকে হিজরত করতে

হয়েছিল। এতে বিরুদ্ধবাদীরা সেদিন খুবই খুশি হয়েছিল। তারা মনে করেছিল আহমদীদেরকে তারা খলীফা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পেরেছে। কিন্তু এমটিএ-এর কল্যাণে এ ষড়যন্ত্র সফল হয় নি। তাদের আশা নিরাশায় পর্যবসিত হয়েছে। আজ প্রতিনিয়ত আহমদীরা তাদের খলীফাকে দেখছে এবং তাঁর কথা শুনতে পাচ্ছে। ঘরে বসেই তাৎক্ষণিক দিকনির্দেশনা সরাসরি পেয়ে যাচ্ছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে আফ্রিকার দেশগুলোতে রেডিও-এর মাধ্যমেও আহমদীয়া জামা'ত ইসলামের তবলীগ করে যাচ্ছে। এসব দেশে রেডিও অনুষ্ঠানগুলো ইতিমধ্যে বেশ জনপ্রিয়তাও লাভ করেছে। অনুরূপভাবে ইন্টারনেটের কল্যাণে ইউটিউব, ফেইসবুক, স্কাইপের মাধ্যমেও খিলাফতের কল্যাণে আহমদীরা ইসলাম প্রচারের কাজ করে যাচ্ছে। শুধুমাত্র www.alislam.org ওয়েবেই মূল ইংরেজী ছাড়াও আরো ৩২টি ভাষায় ব্রাউজিং করার সুযোগ পাচ্ছে। এ ছাড়া প্রত্যেক দেশের অঙ্গসংগঠনগুলোর আলাদা আলাদা ওয়েবসাইট তো রয়েছেই। বাংলাদেশ তথা বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য যে ওয়েবসাইট রয়েছে তা হলো: www.ahmadiyyabangla.org যেখানে শত শত বাংলা পুস্তক দেয়া আছে। আর এখান থেকেও অনেক মানুষ কল্যাণমণ্ডিত হচ্ছে।

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি

খিলাফতে আহমদীয়ার কল্যাণে আজ জামা'তে আহমদীয়া অর্থনৈতিকভাবেও সমৃদ্ধ। আজ থেকে প্রায় একশ বছর পূর্বে যখন লাহোরী জামা'তের সদস্যরা বায়তুল মালের সমস্ত অর্থ নিয়ে লাহোরে চলে যায়, তখন খলীফার হাতে, বায়তুল মালে মাত্র ১৪ আনা ছিল। আর ১৮ হাজার রুপি ঋণের বোঝা ছিল। আজ আমাদের পঞ্চম খলীফার অধীনস্থ বায়তুল মালে প্রতি বছর হাজার কোটি টাকারও বেশি জমা হচ্ছে।

আজ থেকে ৩৪ বছর পূর্বে পাকিস্তানের একজন স্বৈরশাসক অত্যন্ত দাঙ্কিতার সাথে ঘোষণা দিয়েছিল— আমরা আহমদীয়া খলীফার হাতে ভিক্ষার ঝুলি ধরিয়ে দিব। রাবওয়াবাসীরা ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে রাবওয়ার অলিগলিতে ঘুরে বেড়াবে। কিন্তু আজ ৩৪ বছর পর খিলাফতের কল্যাণে আহমদীয়াতের বর্তমান যে অবস্থান তা দেখার মতো। বর্তমানে রাবওয়া পাকিস্তান সরকার কর্তৃক

পাকিস্তানের সবচেয়ে ধনী শহর হিসাবে স্বীকৃত, সবচেয়ে শিক্ষিত শহর হিসাবে স্বীকৃত, সবচেয়ে শান্তিপ্রিয় শহর হিসাবে স্বীকৃত। তৃতীয় বিশ্বের দেশ পাকিস্তানের শহর হওয়া সত্ত্বেও সেখানে সদকা দেয়ার জন্য লোক খুঁজে পাওয়া যায় না। অন্যদিকে পাকিস্তানের চলতে হয় অন্যের সাহায্য নিয়ে, ঋন নিয়ে, ভিক্ষা নিয়ে। নিজেদের দেশ চালানোর জন্য অন্যের সাহায্যের ওপর, ভিক্ষার ওপর নির্ভর করতে হয়। ২০১৩ সনের এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী তাদের দেশের প্রত্যেক নাগরিকের ওপর গড়ে ১,১৫,০০০ টাকার ঋণের বোঝা রয়েছে। ২০১৭ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে পাকিস্তানের প্রত্যেকটি শিশু ১,১৫,০০০ টাকা ঋণের বোঝা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। পক্ষান্তরে খিলাফতের কল্যাণে আজ শুধু পাকিস্তানে নয় বরং বিশ্বের কোথাও আহমদীদের ক্ষুধার্ত দিন কাটাতে হয় না। কোথাও আহমদী কোনো ভিক্ষুক নাই। টাকার অভাবে গরীব ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা বন্ধ করতে হয় না, গরীব মেয়েদের বিয়ে আটকে থাকে না। বস্ত্র, বাসস্থানহীন অবস্থায় দিনের পর দিন কাটাতে হয় না।

খিলাফতের এ কল্যাণ আজ শুধু আহমদীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আফ্রিকা ও বিশ্বের অন্যান্য জায়গার অনেক গরীব মানুষ প্রতিনিয়ত খিলাফতের কল্যাণ ভোগ করছে। খিলাফতের অধিনে আফ্রিকা মহাদেশে নুসরত জাঁহা স্কীমের আওতায় গরীব মানুষের পড়ালেখার ব্যবস্থা করার জন্য ৫১০টি স্কুল কাজ করে যাচ্ছে। ১২টি দেশে ৪২টি হাসপাতাল লক্ষ লক্ষ মানুষকে চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও তাদের জন্য পানি, বিদ্যুৎ, খাদ্য ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। হিউম্যানিটি ফার্স্ট খিলাফতের আরেক কল্যাণের নাম। যেখানে মানবতা বিপন্ন হয়, মানুষ দুর্যোগ ও দুর্ভোগের শিকার হয়। সেখানে দুর্গতের পাশে সাহায্যেও জন্য গিয়ে দাঁড়ায় হিউম্যানিটি ফার্স্ট। এক্ষেত্রে ধনী-গরীব কোনো বাধবিচার করা হয় না। অতি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যখন আমেরিকা ও কানাডাতে ঘূর্ণিঝড় ক্যাটরিনা ও সানডি, জাপানে ভূমিকম্প ও সুনামী, পাকিস্তানে ভূমিকম্প ও ভয়াবহ বন্যা, হাইতিতে ভূমিকম্প, ইন্দোনেশিয়াতে সুনামী, বাংলাদেশে আইলা ও সিডর আঘাত হানে তখন ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দাঁড়ায় হিউম্যানিটি ফার্স্ট। এছাড়াও বসনিয়া, নাইজার, নাইজেরিয়া ও সিরিয়া প্রভৃতি দেশের অধিবাসীরা যখন জাতিগত সহিংসতায় বিপর্যস্ত তখন হিউম্যানিটি ফার্স্ট তাদের পাশেও গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের পর্যন্ত ব্যাপক খাদ্য ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

খিলাফতে আহমদীয়া আমাদের জন্য এক নিরাপদ ও সুরক্ষিত দুর্গ

খিলাফতে আহমদীয়া আমাদের জন্য এক নিরাপদ আশ্রয়, এক সুরক্ষিত দুর্গ। মুরগীছানা যেমন বিপদের সময় মা মুরগীর ডানার নিচে আশ্রয় নিয়ে নিজেদের সুরক্ষিত রাখে, তেমনি খিলাফতে আহমদীয়ার ছায়াতলে আমরা প্রতিটি কঠিন থেকে কঠিনতর বিপদেও সুরক্ষিত রয়েছি।

১৯১৪ ও ১৯৩৯-৪৫ সালে দুটি বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে। বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি মানুষের প্রাণহানী ও ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছে। কিন্তু আমরা আহমদীরা সুরক্ষিত রয়েছি। জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে বিশ্বের কোনো না কোনো স্থানে সংঘর্ষ, যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই রয়েছে। আহমদীরা এসবের মধ্যেও নিরাপদ রয়েছি। আজ মুসলমানরা ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়া, সিরিয়া ও পাকিস্তানে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ করে মরছে। অপরদিকে পশ্চিমাদের কাছে সন্তাসী হিসাবে চিহ্নিত হয়ে মার খাচ্ছে। কোথাও তাদের শান্তি নাই। কিন্তু আমরা সব জায়গায় নিরাপদ রয়েছি।

অপরদিকে আহমদীয়াতের শত্রুরাও নিরবে বসে নাই। তারা অবিরাম আহমদীয়াতের ক্ষতি করার চেষ্টা করছে। ১৯৩৪ সালে মজলিসে আহরার, ১৯৫৩ সালে মওদুদীর নেতৃত্বে জামা'তে ইসলামী আমাদের মিটানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে। ১৯৭৪ সালে জুলফিকার আলী ভূট্টো, ১৯৮৪ সালে জেনারেল জিয়াউল হকও জামা'তকে ধ্বংস করার শেষ চেষ্টা করেছে। রাষ্ট্রীয় শক্তি ও ক্ষমতাকে ব্যবহার করেছে। কিন্তু এরপরও তারা ব্যর্থ হয়েছে। খিলাফতের গায়ে আঁচ পর্যন্ত লাগাতে পারে নি। আহমদীয়া জামা'তের অগ্রগতিকে থামাতে পারে নি।

খলীফা দোয়ার এক জীবন্ত ভাণ্ডার

আজ পৃথিবীর বুকে আহমদীয়া জামা'ত ছাড়া অন্য কেউ এই দাবি করতে পারে না যে, আমাদের মাঝে এমন এক আধ্যাত্মিক নেতা আছেন যিনি আমাদের বেদনায় বিধুর হন। বিশ্বের সকল প্রান্তে বসবাসকারী মু'মিনদের চিন্তা যাকে ব্যতিব্যস্ত বা অস্থির করে তোলে। যিনি পুরো রাত আমাদের জন্য

তার প্রভুর সকাশে সিজদায় পড়ে থাকেন। এই ব্যাকুলতা আর ভালোবাসার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন,

‘‘تمہارے لئے ایک شخص تمہارا درد رکھنے والا‘‘ تمہاری محبت رکھنے والا
‘‘تمہارے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے والا‘‘ تمہاری تکلیف کو اپنی تکلیف جاننے والا
تمہارے لئے خدا کے حضور دعائیں کرنے والا ہے

‘‘তোমাদের জন্য এক ব্যক্তি আছেন যিনি তোমাদের বেদনায় বিধুর, তিনি তোমাদের ভালোবাসেন, তিনি তোমাদের দুঃখকে নিজের দুঃখ মনে করেন, তোমাদের কষ্টকে নিজের কষ্ট বলে জ্ঞান করেন, তোমাদের জন্য খোদার সমীপে দোয়ারত থাকেন।’’ [বারাকাতে খিলাফত, আনোয়ারুল উলুম, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৮]

চৌধুরী হাকীম দীন সাহেব বর্ণনা করেন। আমার স্ত্রী তার প্রথম বাচ্চা জন্মের সময় খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন। সেই কষ্টকর পরিস্থিতিতে রাত ১২টার সময় আমি খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.)-এর বাসায় গিয়ে দরজায় কড়া নাড়ি। শব্দ শুনে হযূর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন কে? আমি অনুমতি নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে পুরো ঘটনা বলি ও দোয়ার আবেদন করি। হযূর (রা.) তৎক্ষণাৎ উঠে গেলেন। ভেতর থেকে একটি খেজুর আনলেন, দোয়া করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, ‘‘এটা তোমার স্ত্রীকে খাওয়াবে। বাচ্চা যখন হবে তখন আমাকে জানাবে। তিনি বলেন, আমি ফেরত এসে স্ত্রীকে খেজুর খাইয়ে দেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাচ্চা হয়ে যায়। অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। আমি ভাবলাম, এত রাত হয়েছে এখন হযূর (রা.)-কে গিয়ে জাগানো ঠিক হবে না। আমি ঘুমিয়ে পড়ি। ফজরের নামাজের সময় উপস্থিত হয়ে হযূর (রা.)-কে সংবাদ দেই। হযূর (রা.) বলেন— মিয়া হাকীম দীন! তুমি তোমার স্ত্রীকে খেজুর খাইয়ে দিয়েছ, তোমার স্ত্রীর বাচ্চা প্রসব হয়ে গেছে। তোমরা দু’জন আরামে ঘুমিয়ে গেছ। আমাকে যদি সংবাদ পাঠাতে তাহলে আমিও আরামে ঘুমাতে পারতাম। আমি তো সারারাত জেগে তোমার স্ত্রীর জন্য দোয়া করেছি।’’

এই হলো খলীফার দৃষ্টান্ত যা কেবল আহমদীয়া জামা’তেই বিদ্যমান। এরকম ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত বিদ্যমান।

আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) একবার স্বীয় অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, “আহমদীয়া জামা’তের সদস্যরাই সেই সৌভাগ্যবান, যুগ খলীফা যাদের জন্য চিন্তিত থাকেন যেন তারা সুশিক্ষা গ্রহণ করে। তাদের স্বাস্থ্যের জন্য যুগ খলীফা চিন্তিত থাকেন। বিশেষাঙ্গির সমস্যা আছে, মোটকথা পৃথিবীতে আহমদীরা যে-কোনো সমস্যাতেই জর্জরিত থাকুক না কেন, তা ব্যক্তিগত হোক বা জামা’তী- এমন নয় যে, এর প্রতি যুগ খলীফার দৃষ্টি নাই আর এর সমাধানের জন্য তিনি ব্যবহারিক চেষ্টা ছাড়াও আল্লাহ তা’লার দরবারে সমর্পিত না হন, তাঁর কাছে দোয়া বা প্রার্থনা না করেন, আমিও এবং আমার পূর্বের খলীফাগণও এমনটিই করে গেছেন।”

তিনি (আই.) আরো বলেন, “পৃথিবীর এমন কোনো দেশ নাই যেখানে আমি রাতে ঘুমানোর পূর্বে কল্পনার চোখে পৌঁছে না যাই আর ঘুমানোর পূর্বেও এবং জাগ্রত হবার সময়ও দোয়া না করি।” [জুমুআর খুতবা, ৬ জুন, ২০১৪]

কিন্তু অপরদিকে মুসলমান হোক বা অমুসলমান, বিশ্বের সর্বত্র দরিদ্রদের সম্পদ তারা কীভাবে ভক্ষণ করছে আর তাদের ওপর কীরূপ অন্যায়-অবিচার চালাচ্ছে। এগুলো বর্ণনা করার কোনো প্রয়োজন নাই। যাহোক, এরা যে ধর্মের সাথেই সম্পর্ক রাখুক না কেন, তাদের ইবাদত প্রকৃত ইবাদত বলে গণ্য হতে পারে না। বরং আজ ইবাদত প্রতিষ্ঠাকারী হলো, একমাত্র খোদার মনোনীত খিলাফত, যা ন্যায়বিচার ও সুবিচারের ভিত্তিতে সবার অধিকার সুনিশ্চিত করার কথা বলে আর গোটা বিশ্বের নেতৃবৃন্দকে অবিরাম নেকি বা পুণ্যের পানে আহ্বান করে। আজ নয়তো কাল বিশ্বকে এই খিলাফতের ছায়াতলে আসতেই হবে, কেননা এখন এছাড়া নিরাপত্তার কোনো দুর্গ নাই।

আমাদের খলীফা সমগ্র জগতের আস্থাবান নেতা

আল্লাহর খলীফাগণ কেমন হয়ে থাকেন দেখুন! তারা সমগ্র বিশ্বের জন্য কল্যাণের উৎস হন। মুসলিম অমুসলিম সবার আশা আকাজ্জার কেন্দ্রস্থল হন। সবার আরাধনার বস্তু হন। শান্তির দূত হন। তারা যেখানে যান সেখানে শান্তির বাণী নিয়ে যান। খিলাফতের ছায়া পেলে মুসলিম অমুসলিম সবাই স্বস্তি পায়, আনন্দিত হয়। হাত তুলে খোদার কাছে, ঈশ্বরের কাছে তার উন্নতি কামনা করে তার জন্য মন উজাড় করে দোয়া করে।

আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগে খিলাফতে রাশেদার যুগ দেখুন! বিদ্রোহ, উস্কানী ইত্যাদির কারণে হযরত উমর (রা.)-এর যুগে পারস্যে অভিযান প্রেরণ করতে হয়েছিল। সেনাপতি একটা বিশাল অংশ দখল করার পর হযরত উমর (রা.)-কে বার্তা পাঠালেন আমাদের সামনে একটি নদী রয়েছে। আপনি অনুমতি দিলে নদী পার হয়ে বাকি অংশটাও জয় করে নিতে পারি। হযরত উমর (রা.) বলে পাঠালেন আর নয়। এই নদী যেন আমার আর পারস্যবাসীদের মাঝে আগুনের প্রাচীররূপে বাধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমরা আর দখল চাই না, আমরা মানুষের রক্ত চাই না, আমরা শান্তি চাই।

আরেকবার ফিলিস্তিনে যুদ্ধ হচ্ছে। শত্রুপক্ষ খ্রিষ্টানরা কেল্লার ভিতরে আশ্রয় নিয়েছে। পরাজিত করা যাচ্ছিল না। তারা সংবাদ পাঠালো আমরা আত্মসমর্পণ করব যদি খলীফা উমর (রা.) নিজে আসেন। সংবাদ পেয়ে খলীফা ছুটে আসলেন। রক্তপাতহীন বিজয়ের পথটাকে বেছে নিলেন।

নামাযের সময় হলে খ্রিষ্টানরা তাকে তখন তাদের ‘হ্যায়কেলে সুলায়মান’ অর্থাৎ টেম্পলের ভিতরে নামায পড়তে অনুরোধ করে। তিনি সেখানে পড়েন নি। বরং তিনি এর চারপাশের বাউন্ডারিরও বাহিরের একটি জায়গা যেখানে ময়লা ফেলা হতো সেটা পরিষ্কার করান এবং সেখানে নামায পড়েন। তার ভয় ছিল এখন আমি এখানে নামায পড়লে পরে মুসলমানরা এই অজুহাত দিয়ে মন্দির ভেঙে মসজিদ বানিয়ে ফেলবে। আর তার এ আশঙ্কা পরে সত্য হয়েছে। তিনি যেখানে নামায পড়েছেন সেখানে ‘মসজিদে উমর’ নামে একটি মসজিদ বানানো হয়েছে। যেটির অবস্থান হ্যায়কেলের প্রাচীর ঘেষে।

হযরত উমর (রা.)-এর যুগে জেরুজালেমেরই একটি এলাকা ছেড়ে মুসলমানদেরকে চলে আসতে হয়। তখন উমরের নির্দেশে তাদের নিরাপত্তার জন্য যে জিযিয়া কর নেয়া হয়েছিল। এটা ফেরত দেয়া হয়। তারা খ্রিষ্টান ছিল। তারা জিজ্ঞেস করে এ টাকা কেন ফেরত দিচ্ছ? বলা হলো— আমরা তোমাদের নিরাপত্তা দেয়ার শর্তে টাকা নিয়েছিলাম। কিন্তু এখন যেহেতু তোমাদের নিরাপত্তা দিতে পারছি না তাই আমাদের খলীফার নির্দেশে এটা আমরা ফেরত দিচ্ছি। তারা অবাক হলো। কোনো বাদশাহ টাকা নিলে ফেরত দেয় এটা তো দেখি নি। এমনকি আমাদের স্বজাতির লোকেরা এটা কখনও করে না। তখন আবেগে তারা কাদল। আর হাত তুলে দোয়া করল। হে

ঈশ্বর! তুমি এদের মঙ্গল করো। এদের মতো শাসককে তুমি অচিরেই আমাদের মাঝে ফিরিয়ে নিয়ে আসো।

ইসলামের খলীফার, আব্দুল্লাহর মনোনীত খলীফার মঙ্গল বিধর্মীরাও চায়। তারা তার উন্নতির জন্য দোয়া করে। তারা তার দাসত্ব বরণে আনন্দিত হয়।

এই দৃশ্যটিকে সামনে রাখুন! আর আইসিস-এর স্বঘোষিত রক্তপিপাসু খলীফা এবং জামা'তে আহমদীয়ার খলীফাকে দেখুন। তাহলেই সহজে বুঝতে পারবেন কে আব্দুল্লাহর খলীফা?

আবু বকর আল বাগদাদী ও তার বাহিনী যেখানে যাচ্ছে রক্তের বন্যা বহাচ্ছে। ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করছে। লাইন ধরে দাঁড় করিয়ে পুরুষ মহিলাকে হত্যা করছে, পুরিয়ে মারছে, দেশান্তরিত করছে, মহিলাদের ওপর পাশবিক নির্যাতন করছে। ফলে স্বজাতি বিজাতি সব মানুষ তাদের খিঙ্কার জানাচ্ছে। তাদের ধ্বংস কামনা করছে। ধ্বংস করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সবাই বিশ্বশান্তির জন্য তাদেরকে হুমকি মনে করছে।

পক্ষান্তরে আহমদীয়া খিলাফতের বিষয়টি দেখুন! প্রাশ্চাত্য, যারা সমগ্র বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করে। যারা সারা বিশ্বের পলিসি মেকার, নীতিনির্ধারক। যারা তৃতীয় বিশ্বের লোকদের মানুষই মনে করে না। যারা নিজেদেরকে পৃথিবীর হর্তাকর্তা মনে করে। তারা অর্থাৎ এই পশ্চিমা জগৎ যখন অর্থনৈতিক মন্দায় জর্জরিত হয়ে এবং আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের জন্ম দিয়ে অথবা এই সন্ত্রাসের শিকার হয়ে, বিশ্বশান্তি বজায় রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে আর তারা এ থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পাচ্ছে না। তখন এই অবস্থা থেকে নিজেদেরকে উত্তরণের জন্য, মুক্তির জন্য এ বিষয়ে দিকনির্দেশনা লাভের জন্য- তারা আমাদের প্রাণপ্রিয় খলীফা হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.)-কে রাষ্ট্রীয় সম্মান দিয়ে, তারা তাদের পার্লামেন্টে বক্তব্য রাখার আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যার ফলে হুযূর (আই.) গত ৩০ মে ২০১২ সনে জার্মানীর মিলিটারী হেডকোয়ার্টারে, ২৭ জুন ২০১২ সনে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটাল হিলে, ৪ ডিসেম্বর ২০১২ সনে ইউরোপীয়ান পার্লামেন্টে ৩০টি দেশের ৩৫০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে এবং ১১ জুন ২০১৩ সনে যুক্তরাজ্যের হাউজ অব পার্লামেন্টে বক্তব্য রেখেছেন।

হুযূর (আই.) তাঁর বক্তব্যে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও জোরালোভাবে তাদের চোখে আঙুল দিয়ে তাদের ভুল ও ত্রুটিপূর্ণ নীতিগুলো দেখিয়ে দিয়েছেন। প্রাশ্চাত্যের

ডাবল স্ট্যান্ডার্ড অর্থাৎ দ্বৈতনীতির কড়া সমালোচনা করেছেন। বিশ্বশান্তির জন্য, তাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্য ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষাগুলোকে তুলে ধরে এগুলোকে গ্রহণ করার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।

হুযূর (আই.)-এর বক্তৃতা চলাকালে, বক্তৃতার শেষে তারা করতালি বাজিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে। তারা পিনপতন নিরবতায় হুযূর (আই.)-এর বক্তব্য মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শুনেছে। হুযূর (আই.)-এর বক্তৃতার শেষে তাদের অভিব্যক্তি বর্ণনায় তারা হুযূর (আই.)-এর বক্তৃতার উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করেছে। অকপটে মেনে নিয়েছে— এই বক্তব্যের শিক্ষাই সর্বোত্তম শিক্ষা। এটাই তাদের নীতি হওয়া আবশ্যিক। পাশ্চাত্যের মানুষ, মিডিয়া হুযূর (আই.)-কে ‘ম্যান অব পিস’ বলে আখ্যায়িত করছে। বর্তমানে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন শহরের চাবি হুযূর (আই.)-এর হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের যায়োন নগরীর চাবি সেখানকার মেয়র আমাদের প্রাণপ্রিয় খলীফার হাতে তুলে দেন।

অনেকে মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বিশ্বব্যাপী বিজয় দেখতে চায়। প্রশ্ন করে, কোথায় ইমাম মাহদী বিশ্ব বিজয় করলেন? আজ তারা যদি অন্ধ না হন, তাহলে বলছি সামনে তাকান আর দেখেন। আমরা আজ সেই বিজয়ের মাহেন্দ্রক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি। পশ্চিমা জগৎ এখনো না মানলেও দ্ব্যর্থহীনভাবে স্বীকার করেছে— আজ ইসলামের খলীফার মতো নেতা, ইসলামের শিক্ষার মতো আদর্শ তাদের হওয়া উচিত। তাই আমরা বিশ্বাস করি সেই দিন আর বেশি দূরে নয় অতি সন্নিহিতে, যেদিন এই স্বীকৃতিই তাদের বিশ্বাসে রূপান্তরিত হবে। তারাও খলীফাকে মেনে নিবে। ইসলামের অনুসারী হবে। খিলাফতের আশিস ও কল্যাণ তারাও লাভ করবে।

আহমদীয়া খিলাফতের সর্বপ্রথম নিয়ামত হলো— খিলাফত আমাদের মতো অযোগ্য, দুর্বলদেরকে এক বিরল সম্মানে ভূষিত করেছে। আর তা হলো আল্লাহর ওয়াদা ছিল— যারা ঈমান আনয়নকারী এবং সৎকর্মশীল হবে তাদের মাঝে তিনি খিলাফত প্রতিষ্ঠা করবেন। বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে একমাত্র আমাদের মধ্যে খিলাফত রয়েছে। তাই এই খিলাফত প্রমাণ করেছে—

প্রথমত, এ যুগে আল্লাহ তা’লার দৃষ্টিতে আমরাই ঈমান আনয়নকারী ও সৎকর্মশীল।

দ্বিতীয়ত, খিলাফত শুধুমাত্র সাহাবীদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত ছিল আর কারো মাঝে ছিল না। বর্তমানে রয়েছে শুধু আমাদের মাঝে। তাই আমাদের মাঝে খিলাফত থাকাটা প্রমাণ করে, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ঘোষণা—

وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ

অর্থাৎ পরবর্তীতে এমন একটা দল আসবে যারা সাহাবীদের মধ্যে গণ্য হবে। (সূরা আল-জুমু'আ: ৪) নিঃসন্দেহে আমরাই সেই দল। যারা পরে এসেও সাহাবীদের মাঝে গণ্য হবার বিরল সম্মানে ভূষিত। আর এক্ষেত্রে আল্লাহ তাঁলার ব্যবহারিক সাক্ষ্য ও সমর্থন আমাদের স্বপক্ষে বিদ্যমান, কেননা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, “খোদা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, ‘তোমাদের প্রতি আশিসের পর আশিস বর্ষণ করা হবে। এমনকি সম্রাটগণ তোমার বস্ত্র হতে কল্যাণ অন্বেষণ করবে।’”

খিলাফতের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করা উচিত নয়

আল্লাহ তা'লা বলেছেন—

وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ
وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا

(সূরা আন-নূর: ৫৬)

অর্থ: আর অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিবেন যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির অবস্থার পর অবশ্যই তিনি তা নিরাপত্তায় বদলে দিবেন।

অর্থাৎ ভয়ভীতির অবস্থার পর আমরা তাদের পদক্ষেপকে সুদৃঢ় করব। হযরত মূসা (আ.)-এর সময়েও এমনই হয়েছিল। হযরত মূসা (আ.) পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে বনী ইসরাঈলদেরকে গন্তব্য স্থানে পৌঁছানোর পূর্বেই মিশর থেকে কেনানের পথে মারা যান। এতে বনী ইসরাঈলদের মাঝে তাঁর মৃত্যুতে শোক ও আতর্নাদ উপস্থিত হয়েছিল। তওরাতে উল্লেখ আছে, বনী ইসরাঈলরা হযরত মূসা (আ.)-এর এ অকাল মৃত্যুতে শোকাতুর হয়ে চল্লিশ দিন ধরে কান্নাকাটি করেছিল। অনুরূপ ঘটনা হযরত ঈসা (আ.)-এর সময়েও ঘটেছিল।

জুশের ঘটনার সময় তাঁর সব শিষ্য বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল এবং তাদের একজন ধর্মচ্যুত হয়েছিল।” (আল-ওসীয্যত, পৃ. ৬-৭, রুহানী খাযায়েন, ২০তম খণ্ড, পৃ. ৩০৪-৩০৫)

খিলাফত চলাকালীন বিভিন্ন ভীতিকর পরিস্থিতি সামনে আসতে পারে, তাই বলে যে পোশাক আল্লাহ তা’লা পরিয়েছেন তা খুলে ফেলা উচিত নয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগের খিলাফতকাল দীর্ঘস্থায়ী হয় নি কেবল এ কারণে। এ বিষয়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, “অতএব আমাকে খলীফা মান্যকারীদের সবাই যদি অমান্যকারী হয়ে যেত এবং কেউই আমাকে না মানত এবং সমগ্র পৃথিবী যদি আমার শত্রু ও প্রাণের আকাজ্জী হতো, তারা সর্বোচ্চ এটাই করতে পারত যে, আমার প্রাণ বের করে নিত, তাহলেও আমি শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এই বিষয়ের ওপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকতাম এবং কখনো খোদা তা’লার অনুগ্রহকে প্রত্যাখ্যান করার ধারণাও আমার হৃদয়ে আসত না, কেননা এই ভুল অনেক বড়ো বড়ো ও ভয়ানক পরিণতি সৃষ্টি করে।

হযরত ইমাম হাসান (রা.) এ ভুলটিই করেছিলেন। যার কারণে অনেক ভয়াবহ পরিণতি সামনে এসেছে। যদিও তাঁর এই ভুল এক বিশেষ বিশ্বাসের ভিত্তিতে হয়েছিল আর তা হলো, পিতার পর পুত্র খলীফা হতে পারে না। যে-রূপ হযরত উমর (রা.)-এর আকীদা বা বিশ্বাস ছিল আমারও এটাই আকীদা এবং এ কারণেই, হযরত উমর (রা.) তাঁর পর খলীফা নির্বাচন সম্পর্কে বলেছেন, এ বিষয়ে আমার পুত্রের পরামর্শ নেয়া যায় কিন্তু তার খলীফা হওয়ার অধীকার থাকবে না। হযরত আলী (রা.) তাঁর পর ইমাম হাসান (রা.)-কে খলীফা মনোনীত করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য সৎ ছিল কেননা আর খিলাফতের যোগ্য এমন কেউ ছিল না যাকে খলীফা বানানো যেত। মনে হয়, হযরত হাসান (রা.)-ও হযরত উমর (রা.)-এর মতোই আকীদা রাখতেন। অর্থাৎ পিতার পর পুত্রের খলীফা হওয়া উচিত নয়। এজন্য তিনি পরবর্তীতে মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে সন্ধি করে নিয়েছেন। এর পরিণামস্বরূপ তাঁর পর ইমাম হুসাইন (রা.) ও তাঁর সমস্ত বংশধর শাহাদাত বরণ করলেন। তারা একবার খোদার নিয়ামতকে পরিত্যাগ করেছেন। খোদা তা’লা বললেন, আচ্ছা তোমরা যেহেতু এই পুরস্কার বা অনুগ্রহকে গ্রহণ করো নি তাই পুনরায় এটা তোমাদের কাউকেই দেয়া হবে না। সুতরাং পরবর্তীতে কোনো সৈয়দ কখনো সম্রাট হয় নি। ছোটো ছোটো

রাজত্ব ব্যতীত সৈয়দরা প্রকৃত রাজত্ব ও খিলাফত কখনো লাভ করে নি। হযরত ইমাম হাসান (রা.) খোদাপ্রদত্ত পুরস্কার ও অনুগ্রহকে ফিরিয়ে দিয়েছেন যার পরিণতি অনেক তিক্ত সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং খোদাপ্রদত্ত পুরস্কার ও অনুগ্রহকে প্রত্যাখ্যান করা কোনো সাধারণ বিষয় নয়।” [বারাকাতে খিলাফত, আনোয়ারুল উলুম, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭০-১৭১]

খিলাফত- বিশ্বব্যাপী ঐক্য প্রতিষ্ঠার বার্তা

ঐক্যের বিষয়টি আল্লাহ তা'লার পবিত্র সত্তা থেকে শুরু হয়। আল্লাহ তা'লা নিজ সত্তা এবং গুণে এক-অদ্বিতীয়। তাঁর সমকক্ষ কেউ নাই। তিনি সমগ্র মহাবিশ্বের একক স্রষ্টা এবং অধিপতি। আল্লাহ তা'লার ‘রাব্বুল আলামীন’ সিফত দ্বারা তাঁর মহান মর্যাদা সাব্যস্ত হয়। অতঃপর তিনি কুরআন শরীফ নাযিলের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবী এবং সাদাকালো সকল বর্ণের মানুষের জন্য একটি বিশ্বজনীন পথপ্রদর্শক কিতাব দান করেছেন যেমনটি তিনি বলেন, ‘হুদািল্লিন নাস’ অর্থাৎ, (এ কুরআন) মানবজাতির জন্য এক মহান হিদায়াতরূপে (অবতীর্ণ করা হয়েছে)।

আমাদের প্রিয় প্রভু সর্বশ্রেষ্ঠ পথের দিশারী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-কে আল্লাহ তা'লা ‘খাতামান্নাবীঈন’ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর (সা.) মাঝে পূর্ণতা, শ্রেষ্ঠত্ব এবং বিশ্বজনীনতার চরম মাত্রা পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ তা'লা তাঁকে (সা.) এই ঘোষণা দেয়ার আদেশ দিয়েছেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

অর্থাৎ, “তুমি বলো, হে লোকসকল! নিশ্চয় আমি তোমাদের সবার জন্য আল্লাহর রসূল।” (সূরা আল-আ'রাফ: ১৫৯) এটি বিশ্বব্যাপী নবুয়তের এমন মহান দাবি যেখানে কোনো নবী তাঁর (সা.) সমকক্ষ নাই। মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পর ঐশী সমর্থনে যে খিলাফতে রাশেদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেটির পরিধিও পৃথিবীব্যাপী ছিল এবং প্রত্যেক খলীফাকে “খলীফাতুর রসূল” নামে ডাকা হতো। বিশ্বব্যাপী খিলাফতের মাধ্যমে যতটা সম্ভব বিশ্বব্যাপী নবুয়তের বার্তা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছতে থাকল। আর আখেরী জামানায় ইসলাম ধর্মের পরিপূর্ণ প্রচারের খাতিরে আল্লাহ তা'লা যখন হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করলেন তখন মহানবী (সা.)-এর উম্মতী এবং ছায়া

নবী হবার কারণে তাঁর (আ.) পরিধিও জগতজুড়ে পরিবেষ্টিত ছিল। আর তিনি (আ.) প্রকৃত ইসলামের বার্তা পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণে প্রচার করেছেন। স্বীয় কাজের পরিধি সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, “পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত সমস্ত জাতিকে এক করে দেয়াই বর্তমানে খোদা তা’লার মূল উদ্দেশ্য।” (চশমায়ে মা’রেফাত, রুহানী খাযায়েন, ২৩তম খণ্ড, পৃ. ৭৬)

তিনি (আ.) আরো বলেন, “খোদা তা’লা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সকল সাধু প্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তওহীদের প্রতি আকৃষ্ট এবং তাঁর ভক্ত দাসদের এক ধর্মে একত্রিত করাতে চাচ্ছেন। আর তারা ইউরোপ কিংবা এশিয়াতেই বসবাস করুক না কেন। এটাই আল্লাহ তা’লার অভিপ্রায় যার কারণে আমি জগতে প্রেরিত হয়েছি।” (আল-ওসীয়াত, রুহানী খাযায়েন, ২০তম খণ্ড, পৃ. ৩০৬-৩০৭)

তিনি (আ.) এটিও স্পষ্ট করেছেন যে, জামা’তের উন্নতি, বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতি এবং ঐক্যের ধারাবাহিকতা তাঁর (আ.) ওফাতের পরও অব্যাহত থাকবে। তিনি (আ.) লিখেন, খোদা তা’লা আমার সাথে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, “তিনি এই সিলসিলাহকে (জামা’তকে) পূর্ণ উন্নতি দান করবেন। কিছু আমার হাতে এবং কিছু আমার পরে।” (আল-ওসীয়াত, রুহানী খাযায়েন, ২০তম খণ্ড, পৃ. ৩০৪)

তাঁর (আ.) ইন্তেকালের পর খোদা তা’লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যখন আহমদীয়া জামা’তে ‘দ্বিতীয় কুদরতের’ বিকাশ ঘটল এবং খিলাফতে রাশেদা আহমদীয়া প্রতিষ্ঠিত হলো তখন প্রকৃত ইসলামের কল্যাণ বিশ্বব্যাপী ছড়াতে লাগল। বিশ্বজনীনতা প্রত্যেক যুগের উপকরণ এবং প্রচার মাধ্যমের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে আর ক্রমাগত তা বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হতে থাকে। আখেরী জামানার এটিই বিশেষ বৈশিষ্ট্য, এ যুগে সোশ্যাল মিডিয়া এবং পারস্পরিক যোগাযোগ মাধ্যমের অকল্পনীয় প্রসারতার কারণে সমগ্র জগত এক মুঠোয় GLOBAL VILLAGE (বৈশ্বিক গ্রামায়ন)-এর মতো হয়ে গেছে। কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী,

وَإِذَا التُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۝

(সূরা আত-তাকভীর: ৮)-এর পূর্ণ বিকাশ আমরা দেখতে পাচ্ছি। যুগের উন্নতির সাথে সাথে এগুলোতে অস্বাভাবিক প্রসারতা হয়ে চলেছে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, “এ যুগের জন্য এমন উপকরণ সহজলভ্য হয়েছে যার ফলে বিভিন্ন জাতি এক রঙে রঙিন হচ্ছে।” (চশমায়ে মা’রেফাত, রুহানী খাযায়েন, ২৩তম খণ্ড, পৃ. ৭৬)

অতএব আমরা পঞ্চম খিলাফতের অধীনে থাকার সৌভাগ্য লাভ করেছি। বর্তমান সময়ে যে হারে এবং গতিতে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ইসলামের প্রচার হচ্ছে তা সবদিক থেকে অতুলনীয় ও অনন্য। আর বিশ্বব্যাপী খিলাফতের অধীনে ঐক্যের বিষয়টি এতটাই দৃশ্যমান যে, পূর্বের ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত দেখা যায় না।

ইমামের প্রতি আনুগত্যের মাঝেই সকল কল্যাণ নিহিত

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, “স্মরণ রেখো! ঈমান কোনো বিশেষ জিনিসের নাম নয়, বরং ঈমান হলো খোদা তা’লা কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট প্রতিনিধির মুখনিঃসৃত ধ্বনি যার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা হয়। ... কোনো ব্যক্তি যদি সহস্রবারও এই কথা বলে যে আমি মসীহ মাওউদের ওপর ঈমান রাখি, আমি আহমদীয়াতের প্রতি ঈমান রাখি- খোদা তা’লার নিকট এমন দাবির কোনো মূল্য নাই যতক্ষণ না কেউ সে ব্যক্তির হাতের ওপর নিজ হাত সঁপে দেয় যার মাধ্যমে খোদা তা’লা এই যুগে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চান। যতক্ষণ না জামা’তের প্রত্যেক সদস্য উন্মাদের ন্যায় তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে নিজ জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে কোনো প্রকারের কল্যাণ ও মাহাত্ম্যের অধিকারী হতে পারবে না।” (আল-ফযল, ১৫ নভেম্বর, ১৯৪৬)

খোদা তা’লার নৈকট্য লাভে খলীফা সহায়কস্বরূপ

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, নবী-রসূল ও খলীফাগণ আল্লাহ তা’লার নৈকট্য লাভে সহায়কস্বরূপ যেভাবে একজন দুর্বল ব্যক্তি পাহাড়ের চূড়ায় চড়তে পারে না। লাঠির আশ্রয় নিয়ে চড়ে। অনুরূপভাবে নবী-রসূল এবং খলীফাগণও মানুষের জন্য আশ্রয়স্বরূপ। তারা দেয়াল নয় যারা ঐশী নৈকট্য লাভের পথে প্রতিবন্ধকস্বরূপ, বরং লাঠি ও আশ্রয়স্বরূপ যার সাহায্যে দুর্বল ব্যক্তিও আল্লাহ তা’লার নৈকট্য লাভ করতে পারে। (আল-ফযল, ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭)

আহমদীয়া জামা'তের খলীফাগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

হযরত মাওলানা হেকীম নূরুদ্দীন

খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রাযিয়াল্লাহু তা'লা আনহু)



ভেরা শহর পশ্চিম পাঞ্জাবের বা পাকিস্তানের জেলা সারগোদার অন্তর্ভুক্ত একটি অতি প্রাচীন শহর যেখানে হযরত মাওলানা হেকীম নূরুদ্দীন জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হযরত হাফেজ গোলাম রসূল, মাতার নাম নূর বখত সাহেবা। হযরত হাফেজ গোলাম রসূল সাহেব হযরত উমর ইবনে খাত্তাব খলীফাতুর রসূল (রা.)-এর বত্রিশতম বংশধর। মাতা নূরবখত হযরত আলী (রা.)-এর বংশধর বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। সম্ভবত ১৮৪১ সনে হযরত মাওলানা জন্মগ্রহণ করেন।

হযরত মাওলানার পিতা অত্যন্ত ধার্মিক এবং হানারী সুন্নী মাযহাব অবলম্বন করতেন। কুরআন শরীফ তখন খুব কম সংখ্যায় পাওয়া যেত। বলা হয়েছে যে, হযরত মাওলানার পিতা বোম্বাই শহর থেকে কুরআন শরীফ আনাতেন

এবং বিতরণ করতেন। এক ব্যাবসায়ী বলেছেন, আমি ত্রিশ হাজার টাকার বহু কুরআন নিয়ে ভেরা গিয়েছি এবং হযরত হাফেজ গোলাম রসূল সবগুলো কিনে নিয়েছেন এবং একাধিকবার এমন হয়েছে। হযরত মাওলানার বড়ো বোনের বিয়েতে পিতা কন্যাকে যা দিয়েছেন তার মধ্যে কুরআন শরীফই ছিল প্রধান। আর বলেছেন, আমাদের পক্ষ থেকে তোমাকে এটাই আসল তোহফা। তিনি বড়ো বিত্তবান ছিলেন, ঘোড়ায় চড়তেন, অশ্বরোহী ছিলেন। হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন ছোটো ছেলে ছিলেন, বড়ো আদরের দুলাল ছিলেন। যা খুশি তা করতেন, যা চাইতেন তাই পেতেন। এ ছেলের জন্য বাবা প্রচুর টাকা খরচ করতেন, তবে খেয়াল রাখতেন ছেলের মেধার সঠিক ও সুন্দর বিকাশ যেন ঘটে। স্বাস্থ্য যেন ভালো থাকে। সবল হন। ঘটনা লিখলে খুব মজা হতো, কিন্তু এখানে সে সুযোগ তো নাই। আপনারা তারীখে আহমদীয়াত ৪র্থ খণ্ড পড়ে দেখুন। ছেলেকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পিতার খুবই আগ্রহ ছিল। বলেছিলেন যে, উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য এতদূর যাও যেন আমাদের মৃত্যুর খবর পর্যন্ত না পাও। ছেলেকে মূল্যবান কাপড় পরাতেন। ভাইয়েরা সবাই লেখা পড়া এবং বইয়ের ব্যাবসা ইত্যাদি করতেন। ধার্মিক ও সমাজে সম্মানিত ছিলেন। তবে সবাই আহমদীয়াত প্রতিষ্ঠার পূর্বেই মারা যান। কেবল এক বোন জীবিত ছিলেন।

হযরত মাওলানা নূরুদ্দীনের (রা.) মা সারাজীবন আশেপাশের শিশু, ছেলেমেয়েদের কুরআন পড়াতে। কুরআন শরীফের প্রতি গভীর ভালোবাসা ছিল। হযরত মাওলানা বলেছেন, আমার বলা উচিত যে, আমি কুরআন শরীফ মায়ের পেটে থাকা কালেও শুনতাম, কোলেও সবসময় শুনতাম। মা আমাকে কুরআন পড়িয়েছেন।

হযরত মাওলানা প্রখর মেধা ও অসাধারণ স্মরণশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি বলেছেন, আমার মনে আছে আমার মা কিভাবে আমাকে তাঁর দুধ পান করা ছাড়িয়ে ছিলেন। অত্যন্ত ছোটো বয়স থেকে লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করেছেন। ১৮৫৮ সনে মাওলানা আঠারো বছর বয়সে নর্মাল স্কুল পাশ করেন (ম্যাট্রিকের বরাবর)। তারপর কিছুদিন পিউদাদ খাঁন মিডল স্কুলে হেড মাস্টার হিসাবে চাকুরি করেন। (খাকসার ভেরাও দেখেছি এবং ঐ স্কুলও দেখেছি।) তারপর চাকুরি ছেড়ে দেন। কিছু দিন পর উচ্চ শিক্ষার জন্য রামপুরের

(হিন্দুস্তান) উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করেন। রামপুরে হযরত মাওলানা (রা.) বড়ো বড়ো উস্তাদদের কাছে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেন। যেমন, আরবি, ফিকাহ, হাদীস, ইত্যাদি। সকল যুগে অসাধারণ ঘটনা ঘটেছে মাওলানা সাহেবের সাথে। বরং সারাজীবন অসাধারণ ও অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে তাঁর সাথে। মাওলানা যে অভিজ্ঞতা লাভ করলেন তা এই যে, তাঁর প্রশ্নের সদুত্তর উস্তাদ উলামারা সঠিক ও সন্তোষজনকভাবে দিতে পারছেন না। আবার দেখা যাচ্ছে পুরো শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে কোথাও চারিত্রিক উন্নতি বা তরবিরতের দিকে কারো দৃষ্টি নাই। রামপুরে তিন বছর অবস্থানের পর হযরত মাওলানা লাখনৌ চলে গেলেন। কিছুদিন পরে আবার রামপুর ফেরত আসলেন। বলা যায় সকল ক্ষেত্রে অলৌকিক সাহায্য পেয়ে যাচ্ছিলেন। তারপর দিল্লী, মিরাঁঠ, ভূপাল বিভিন্ন স্থানে গিয়ে বিখ্যাত আলেমদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে থাকলেন।

১৮৬৫ সনে বা ১৮৬৬ সনে হযরত মাওলানা জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ যাত্রা করেন। রেওয়াজাতে আছে কা'বা গৃহের প্রতি প্রথম যখন দৃষ্টি পড়ে, তখন যে-কোনো একটি দোয়া কবুল হয়ে যায়। হযরত মাওলানা দোয়া করলেন, “হে আল্লাহ! আমার যখন যা প্রয়োজন এবং যে দোয়া করি তখন আমার সে দোয়া কবুল করো।” হযরত মাওলানার জীবনে আগাগোড়া সব সময় অলৌকিকভাবে তাঁর দোয়া কবুল হয়েছে। হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন মক্কা শরীফে দেড় বছর পর্যন্ত পড়াশোনা করলেন। একজন বুয়ূর্গ হযরত শাহ আব্দুল গনী সাহেবের কাছে তরবিরত লাভের জন্য মদীনা মনওয়ারা, প্রিয় নবীর চির অবস্থান যেখানে, সেখানে যাত্রা করলেন। সেখানে যাবার পর হযরত শাহ আব্দুল গনী নামী এক বুয়ূর্গের হাতে বয়আত করলেন। তবে পড়াশোনা জারি রাখলেন। তারপর হযরত মাওলানা পুনরায় মক্কা শরীফ ফেরত আসলেন— এটা প্রায় ১৮৬৮ সনের কথা। এখানে কিছু কাল অবস্থান করে, দ্বিতীয়বার পবিত্র হজ্জব্রত পালন করে দেশে ফিরে আসলেন। ১৮৭১ সনে ভেরা ফেরত আসলেন।

ভেরা প্রত্যাবর্তনের কিছুদিন পর তিনি প্রথম বিয়ে করেন। বেগম সাহেবার নাম ছিল মোহতরমা ফাতেমা বিবি সাহেবা।

তিনি ১৮৮১ সনে অসুস্থ হয়ে পালকিতে বসে একটা লম্বা সফর করেন। সে সময় কুরআন মজীদ মুখস্থ করে নেন।

হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন তখন কাশ্মিরের রাজধানী জম্মুতে সরকারী কবিরাজ হিসাবে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের সম্পর্কে জানতে পারলেন এবং হযরত মির্যা সাহেবের বই আনালেন। এভাবে কাশ্মিরে হযরত মির্যা সাহেব সম্পর্কে চর্চা আরম্ভ হয়ে গেল।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) যখন জানতে পেরেছিলেন যে আল্লাহ তা'লা তাঁর ওপর অনেক বড়ো ভারি বোঝা চাপাবেন বা চাপিয়েছেন তখন থেকে দোয়ারত ছিলেন যে, ইয়া আল্লাহ! আমি একা, আমাকে কে সাহায্য করবে? আল্লাহ তা'লা হযরত সাহেবের দোয়া কবুল করে হযরত মাওলানার অন্তর হযরত মির্যা সাহেবের প্রতি আকৃষ্ট করে দিলেন— হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন খুব দ্রুত হযরত (আ.)-এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন।

দ্বিতীয় সাক্ষাতে হযরত মাওলানা, হযরত সাহেব (আ.)-এর কাছে জানতে চাইলেন— আপনার পথে চলার জন্য মুজাহিদার (সংগ্রাম) কি করণীয়। হযরত সাহেব বললেন, খ্রিষ্টান পাদ্রীদের বিরুদ্ধে বই লিখে প্রকাশ করুন। এ আদেশের জবাবে হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন ফসলুল খেতাব বই লিখে প্রকাশ করলেন। বরাবর হযরত (আ.)-এর সাথে পত্রালাপ ও যাওয়া আসা চলতে থাকল।

একবার হযরত মাওলানা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। হযরত (আ.) তাঁকে দেখতে কাশ্মির যাত্রা করেছিলেন। সম্ভবত জানুয়ারি ১৮৮৮ সনের ঘটনা। তখন মাওলানা কাশ্মিরে অবস্থান করছিলেন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) মাওলানা সাহেবকে বললেন, “আপনার দ্বিতীয় বিবাহ করা উচিত। হযরত মাওলানা সাহেব হযরত সাহেবের পরামর্শ অনুসারে দ্বিতীয় বিবাহ করলেন। বরং হযরত (আ.) নিজে চেষ্টা করে করে এ বিয়ে করালেন। ১৮৮৮ সনে হযরত সূফী আহমদ জান (রা.)-এর কন্যা মোহতরমা সুগরা বেগম সাহেবার সাথে এ বিয়ে হয়েছিল। হযরত সূফী আহমদ জান এমন বুয়ূর্গ যাঁর বাসভবনে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ২৩ মার্চ ১৮৮৯ সালে প্রথম বয়আত গ্রহণ আরম্ভ করেছিলেন। হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন (রা.) অনেক পূর্ব থেকেই আবেদন করেছিলেন যে, আপনি যখনই

আল্লাহর তরফ থেকে বয়আত গ্রহণের অনুমতি পাবেন আমাকে প্রথম বয়আত করার সুযোগ দিবেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) সর্বপ্রথম হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন সাহেবের বয়আত গ্রহণ করেছিলেন এবং প্রথমদিন ৪০ জনের বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। মহিলাদের মধ্যে মোহতরমা সুগরা বেগম সাহেবা ছিলেন প্রথম বয়আত গ্রহণকারিনী।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) নিজ পুস্তক ফতেহ ইসলাম ছাড়াও অনেক বইয়ে হযরত মাওলানা হেকীম নূরুদ্দীন (রা.)-এর প্রশংসা করেছেন। এত এত বিজ্ঞাপন ও বইয়ে তাঁর প্রশংসা করেছেন যে, বলে শেষ করা যাবে না। সবচেয়ে সংক্ষেপে সর্বোত্তম প্রশংসা একটি ফার্সি পংক্তিতে করেছেন, ‘কতই না ভালো হতো যদি এ উম্মতের সবাই নূরুদ্দীন-এর মতো হতো।’ হযরত মাওলানা মসীহ মাওউদ (আ.)-এর আনুগত্য করতেন এমন যেমন মানুষের হৃদ-স্পন্দনের সাথে নাড়ী স্পন্দনের মধ্যে একটি তাল বা হৃদ থাকে। কাদিয়ানের বাইরে যাত্রা করা তাঁর কাছে মৃত্যুর মতো মনে হতো। তিনি বলতেন, আমাকে যদি কেউ প্রতিদিন এক হাজার টাকা করেও দেয় তবুও আমি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে ছেড়ে যেতে প্রস্তুত নই।

তিনি সারাজীবন যেখানেই ছিলেন কুরআনের দরস দিয়েছেন। শেষ জীবনে ওসীয়াত করে গেছেন। কুরআনের দরস যেন জারি থাকে। তিনি বলতেন, কুরআন আমার খোরাক; অনেক সময় বড়ো দুর্বলতা বোধ করলে কুরআন পড়তে শুরু করি; আন্তে আন্তে শক্তি ফিরে পাই।

শেষ জীবনে বড়ো শারীরিক দুর্বলতার মাঝে অনেক কষ্ট করে, কুরআনের দরস দিতেন। একবার আসরের পর মসজিদ আকসার দরস দিতে দিতে দুর্বলতার ফলে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। খোদামরা তাঁকে খাটে করে শুইয়ে বাড়ির দিকে নিয়ে যেতে থাকেন। মসজিদ মোবারকের কাছে এসে হুযূর (রা.) বলেন, রাখো, আমি মসজিদে মোবারকে মাগরিবের নামায পড়ে তারপর বাড়ি যাব। মাগরিবের পরে হুযূর আবার এক রুকুর দরস দিলেন।

অসাধারণ গভীর জ্ঞানের আলেম, অসাধারণ চিকিৎসক (কবিরাজ), অসাধারণ বক্তা, অসাধারণ বই রচনাও করতেন। তর্কবাগিশও ছিলেন।

বলা যেতে পারে যে, তাঁর সকল দোয়া কবুল হতো। তবে তাঁর সবচেয়ে বড়ো

কাজ এই যে, তিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ইস্তেকালের পর এ জামা'তের প্রথম খলীফার দায়িত্ব উত্তমভাবে পালন করে গেছেন। লেখা আছে যে, বড়ো বড়ো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ হুযূর (রা.)-এর সামনে যেতে ভয় পেতেন। কিন্তু গরীবরা, সাধারণ মানুষেরা মোটেই দ্বিধা করতেন না। যখন খুশি হতেন অকপটে নিজের কথা বলতেন। হযরত আলী (রা.), হযরত আবু বকর (রা.) সম্পর্কে একথাই বলেছেন। মূলত আমরা দেখছি যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) চারিত্রিক দিক থেকে অনেকটা হযরত আবু বকর (রা.)-এর মতো ছিলেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) শারীরিকভাবে খুব স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর চেহারা এমন এক তেজদীপ্ত আভা ছিল যে, তাঁর সামনে কেউ চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারত না। সবাই তাঁর সামনে অবনত নয়নে দাঁড়াতো। আহমদী, অআহমদী, মুসলিম, অমুসলিম, ছোটো-বড়ো, হিন্দুস্তানের সকল মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছ। তার জ্ঞান ও তাকওয়া সম্পর্কে কারো কোনো সন্দেহ ছিল না।

আল্লামা ইকবাল পাকিস্তানের একজন বিখ্যাত কবি। একবার একটি ফতোয়ার জন্য হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন (রা.)-এর খেদমতে লোক পাঠিয়েছিলেন। সবসময় পত্র মাধ্যমেও যোগাযোগ রাখতেন।

হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন, খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) ১৩ মার্চ ১৯১৪ জুমআর দিন দুপুর দুটা বেজে ২০ মিনিটে নামাযরত অবস্থায় ইস্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) সম্পর্কে অনেকে অনেক কথা বলেছেন ও লিখেছেন। এখানে একটি কেবল উল্লেখ করব। স্যার সৈয়দ আহমদ সাহেবকে (আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা) একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'জাহেল পড়াশোনা করে আলেম হয়, আলেম আরো পড়াশোনা করে হাকীম (মহাজ্ঞানী) হয়, হাকীম আরো উন্নতি করলে সূফী হয় (ওলী আল্লাহ), সূফী উন্নতি করে কী হয়? স্যার সৈয়দ জবাবে বলেছিলেন—সূফী উন্নতি করে 'নূরুদ্দীন' হয়।

হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন ইলহামসমূহের মধ্যে উল্লেখ আছে।

যেমন ইলহাম হয়েছে, ‘নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া-এর মাঝে আল্লাহর নিদর্শন রয়েছে’।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বিভিন্ন বইয়ে হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন (রা.) সম্পর্কে অনেক কথা লিখেছেন। যেমন- “তিনি তাঁর নিজের হালাল উপার্জিত ধনসম্পদ যেভাবে আল্লাহর ধর্ম ইসলাম প্রচারের জন্য ব্যয় করেন, আমি দেখে মনে মনে আশ্চর্য করি যে, হায়! ঐ খেদমত যদি আমার দ্বারা সম্পাদিত হতো! তাঁর অন্তরে ধর্মের জন্য কুরবানী করার এত বেশি জোশ, আমি যখনই কল্পনা করি তখনই আমার চোখের সামনে আল্লাহর মহাশক্তি বিকাশের দৃশ্য ভেসে উঠে যে, তিনি কীরূপে নিজ বান্দাদেরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে থাকেন”। (ফতেহ ইসলাম, পৃ. ২৯)

হযরত (আ.) আরো লিখেছেন, “তার অর্থের দ্বারা আমি যেভাবে সাহায্য পেয়েছি, আমি এর কোনো নজির দেখি না যে বর্ণনা করব”। (ইয়ালায়ে আওহাম, পৃ. ৭৭৭-৭৮১)

হযরত (আ.) আরো লিখেছেন- “আমি আল্লাহর দরবারে হাত তুলে দোয়া করি, আল্লাহর কাছে তাঁর সুস্বাস্থ্য ও তার দীর্ঘ জীবনের। তাঁর সম্পদে বরকত কামনা করি।”

“আল্লাহ আমাকে তাঁর জন্য দোয়া করার সুযোগ দিন আমার দোয়া কবুল করুন। ... আল্লাহর কসম! তাঁর লেখনী ও তাঁর বয়ানের (বক্তৃতা) মধ্যে এক নতুন উজ্জ্বলতা দেখছি। কুরআনের গভীর অর্থ যেভাবে তিনি বুঝতে পারেন- যেভাবে তাঁর মধ্যে তা উন্মুক্ত করা হয়- দেখে বোঝা যায় যে তিনি সাবেকীনদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর সাথে জ্ঞান ও নম্রতা দুটোই পাহাড়ের মতো (সুউচ্চ ও দৃঢ়) ...।” (আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, পৃ. ৫৮৪-৫৮৯)

আল্লাহ তা’লা হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন, খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.)-কে জান্নাতে সুউচ্চ স্থান দান করুন। আমাদের শক্তি দান করুন আমরা যেন তাঁর নমুনা অনুকরণ করতে পারি। (তারীখে আহমদীয়াত, ৪র্থ খণ্ড)

হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ

খলীফাতুল মসীহ সানী, আল-মুসলেহ আল-মাওউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'লা আনহু)



১৮৮৫ সনে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) ঘোষণা দিলেন যে, যুক্তিপ্রমাণ যথেষ্ট দেয়া হয়েছে। কিন্তু কেউ উত্তর দিচ্ছেন না। এবার তিনি ঐশী নিদর্শন প্রদর্শন করবেন। বিশ হাজার বিজ্ঞাপন উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করে সারা পৃথিবীর সকল ধর্মীয় নেতাদের উদ্দেশ্যে প্রচার করলেন যে, তিনি ঐশী নিদর্শন প্রদর্শন করবেন।

কাদিয়ানে বসবাসকারী হিন্দু ধর্মের একদল লোক হযরত মির্যা সাহেবের খেদমতে লিখিত আবেদন করলেন, আপনি সারা পৃথিবীর মানুষকে নিদর্শন দেখাতে চাচ্ছেন। আমরা আপনার সাথেই বসবাস করি আমাদেরকে নিদর্শন দেখান।

হযরত মির্যা সাহেব তাদের আবেদন পেয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ তা'লা তাকে বললেন, ‘তুমি হুশিয়ারপুর যাও, সেখানে তোমার উদ্দেশ্য সফল হবে’।

হযরত মির্যা সাহেব ২২ জানুয়ারি ১৮৮৬ সনে হুশিয়ারপুর গেলেন। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) নিজ থেকে কখনও কিছু বলতেন না। আল্লাহর কাছ থেকে ইশারা পেয়ে তারপর বলতেন। হুশিয়ারপুরে একটি নির্জন বাগান বাড়িতে তিনি অবস্থান গ্রহণ করলেন। চল্লিশ দিনের জন্য তিনি ঐ বাড়ির দোতলায় নিজেকে আবদ্ধ রেখে দোয়ায় রত হলেন। চল্লিশ দিন কারো সাথে সাক্ষাৎ করলেন না। কথা বললেন না। শুধু দোয়ায় রত থাকলেন।

চল্লিশ দিন পর চিল্লা শেষ করে বেরিয়ে আসলেন এবং ঘোষণা দিলেন যে, আল্লাহ তা'লা আমার দোয়া শুনেছেন এবং উত্তরে আমাকে বলেছেন যে, আমাকে নিদর্শনস্বরূপ একজন পুত্রসন্তান দেয়া হবে যার দ্বারা পৃথিবীতে ইসলামের সত্যতা প্রচার করা হবে এবং এই প্রতিশ্রুত (মুসলেহ মাওউদ-প্রতিশ্রুত সংস্কারক) পুত্র সম্পর্কে ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬ তারিখে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করলেন। এই বিজ্ঞাপনে তিনি লিখলেন: “আল্লাহ তা'লা আমাকে এক প্রতিশ্রুত পুত্রের সুসংবাদ দিয়েছেন”।

উপরোক্ত বিজ্ঞাপনে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর সম্মানিত স্ত্রী হযরত সৈয়দা নুসরত জাহান বেগম সাহেবা ১২ জানুয়ারি ১৮৮৯ মোতাবেক ৯ জমাদীউল উলা ১৩০৬ হিজরী রোজ শনিবার দিবাগত রাত পৌনে এগারটার সময় একটি পুত্রসন্তান জন্ম দেন। হযরত মির্যা সাহেবের নিজ গৃহ দারুল মসীহ কাদিয়ানে এই ছেলে জন্মগ্রহণ করেন। এ ছেলের নাম রাখা হয় মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ।

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) সাহেব ১৪ মার্চ ১৯১৪ সনে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা (হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী) নির্বাচিত হন।

১৯৪৪ সনে হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.), খলীফাতুল মসীহ সানী নিজেকে ‘আল-মুসলেহ আল-মাওউদ’ বলে ঘোষণা দেন। অর্থাৎ হুশিয়ারপুরের চল্লিশ দিনের দোয়ার জবাবে আল্লাহ তা'লা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-কে যে পুত্রের শুভসংবাদ দিয়েছিলেন, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬ তারিখের বিজ্ঞাপনে যার উল্লেখ আছে; এবং ১ ডিসেম্বর ১৮৮৮ তারিখের সবুজ ইশতেহারে যার উল্লেখ আছে, তিনিই সেই সুযোগ্য সন্তান।

এ সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেন, সবুজ ইশতেহারে (১ ডিসেম্বর ১৮৮৮) যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, এতে কোনো সন্দেহ নাই যে, সেখানে আমারই সম্পর্কে বলা হয়েছিল। (আল-ফযল, ২৩ মার্চ ১৯৪০)

তারপর ৫-৬ জানুয়ারির মধ্য রাতে ১৯৪৪ হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) আল্লাহর তরফ হতে ঐশীবাণী (ইলহাম) প্রাপ্ত হলেন, ‘আনাল মসীহুল মাওউদ, মুসলুহ ওয়া খালীফাতুহ’ অর্থ: ‘আমি মসীহ মাওউদ (অর্থাৎ) তাঁর প্রতিচ্ছবি এবং তাঁর খলীফা’। অর্থাৎ তিনিই সেই প্রতিশ্রুত পুত্র মুসলেহ মাওউদ। এ বিষয়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) ২৮ জানুয়ারি ১৯৪৪ শুক্রবার মসজিদ আকসা কাদিয়ানে জুমুআর খুতবায় বিশদ ব্যাখ্যা দেন’। [তারীখে আহমদীয়াত; ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪৯১]

পরের দিনই কাদিয়ানে জলসা মুসলেহ মাওউদ অনুষ্ঠিত হয় যেখানে কেন্দ্রের প্রথম সারির বুয়ুর্গগণ বজ্রতা পেশ করেন যে, সকল যুক্তিপ্ৰমাণে প্রমাণিত এবং অবশেষে আল্লাহ তা’লা নিজ পবিত্র বাণী দ্বারা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) কে অবগত করেছেন যে, ‘তিনিই সেই প্রতিশ্রুত মুসলেহ মাওউদ’। [তারীখে আহমদীয়াত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৫৯৬]

বিষয়টির গুরুত্ব যেন সবাই বুঝতে পারেন এই উদ্দেশ্যে ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪ হুশিয়ারপুর; ১২ মার্চ লাহোর; ২৩ মার্চ লুথিয়ানা; ১৬ এপ্রিল ১৯৪৪ দিল্লীতে জলসা মুসলেহ মাওউদ অনুষ্ঠিত হয়। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) উপস্থিত বজ্রতা দেন। জামা’তের প্রথম সারির ওলামা ও নেতৃবৃন্দ বজ্রতা দেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) (লাহোরে অনুষ্ঠিত জলসায়) আল্লাহর কসম খেয়ে বলেন, “আমি আজ এই জলসায় ‘ওয়াহিদ’ ও ‘কাহহার’ খোদার কসম খেয়ে বলছি, যাঁর নামে মিথ্যা কসম খাওয়া অভিশপ্তদের কাজ; যাঁর নামে মিথ্যা রচনাকারী তাঁর আযাব থেকে কখনো বাঁচতে পারে না; ঐ খোদার কসম খেয়ে বলছি, এই লাহোর শহরের ১৩ নম্বর টেম্পল রোডের শেখ বশীর আহমদ সাহেব এডভোকেট-এর বাড়িতে, আল্লাহ আমাকে খবর দিয়েছেন যে, আমিই মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ণিত মুসলেহ মাওউদ। আমি সেই মুসলেহ মাওউদ যার হাতে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের এবং তৌহীদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে”। [আল-ফযল, কাদিয়ান, ১৫ মার্চ ১৯৪৪]

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) সম্পর্কে তাঁর পিতা ও মসীহ মাওউদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) লিখেছেন, “১০ জুলাই ১৮৮৮ তারিখের বিজ্ঞাপনে এবং ১ ডিসেম্বরের ১৮৮৮ তারিখের বিজ্ঞাপনে যেমন উল্লেখ ছিল যে, আল্লাহ তা’লা বলেছিলেন, ১ম বশীরের মৃত্যুর পরে দ্বিতীয় বশীর দেয়া হবে যার নাম মাহমুদ হবে...। আজ ১২ জানুয়ারি ১৮৮৯ মোতাবেক ৯ জমাদিউল উলা ১৩০৬ হিজরী রোজ শনিবার আল্লাহর ফযলে আমার গৃহে জন্মগ্রহণ করেছে”। [ইশতেহার তাকমিলে তাবলীগ; মলফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫১]

১৮ জানুয়ারি ১৮৮৯ তারিখে সাহেববাদা মাহমুদ আহমদের আকীকা করা হয়। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ, মসীহ মাওউদ (আ.) ও হযরত আম্মাজান নুসরত জাহান বেগম সাহেবা অত্যন্ত যত্নসহকারে প্রতিশ্রুত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর তরবিয়ত করতে থাকেন। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) বহু বার বলেছেন, “এই ছেলেই প্রতিশ্রুত মুসলেহ মাওউদ হবেন”। [আল-হাকাম, জুবিলী, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৩৯, পৃ. ৮০, কলাম ৩]

হযরত মির্যা মাহমুদ ১৮৯৫ সনে হযরত হাফেজ আহমদ উল্লাহ নাগপুরীর কাছে কুরআন মজীদ নাযেরা পড়তে শুরু করেন এবং জুন ১৮৯৭ সনে কুরআন নাযেরা শেষ করেন। ৭ জুন ১৮৯৭ তারিখে এ উপলক্ষ্যে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন যা ‘আমীন অনুষ্ঠান’ নামে জামা’তে এখনও প্রচলিত।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ‘সিরাজে মুনীর’ কিতাবে লিখেছেন, ‘সবুজ ইশতেহারে (১ ডিসেম্বর ১৮৮৮) যে ছেলে মাহমুদের কথা বলা হয়েছিল সে ছেলের জন্ম হয়ে গেছে। এখন সে ৯ বছরে পড়েছে’। [সিরাজে মুনীর, পৃ. ৩১]

টীকায় হুযূর (আ.) লিখেন, “হ্যাঁ সবুজ ইশতেহারে স্পষ্ট অক্ষরে অতি শীঘ্র পুত্রসন্তান জন্মের প্রতিশ্রুতি ছিল। অতএব মাহমুদের জন্ম হয়েছে। কত বড়ো মহিমাম্বিত এই ভবিষ্যদ্বাণী। যদি অন্তরে খোদাভীতি থেকে থাকে তাহলে পবিত্র মন নিয়ে চিন্তা করে দেখো”। [সিরাজে মুনীর, পৃ. ৩১ টীকা]

হযরত সাহেববাদা মাহমুদ ১৮৯৮ সনে তালীমুল ইসলাম স্কুল কাদিয়ানে ভর্তি হন। পড়াশোনা শুরু করেন। কিন্তু বাল্যকালে তিনি খুব অসুস্থ থাকতেন।

বিশেষ করে চোখে খুব কষ্ট থাকত। পড়াশোনা করতে পারতেন না। হযরত সাহেবের ছেলে বলে পাশ করিয়ে দেয়া হতো। ফলত ম্যাদ্রিক পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারেননি। এবং সেখানেই তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সমাপ্তি ঘটেছে। তবে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলতেন, তাঁকে আল্লাহ তাঁ'লা পড়ান। তিনি হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন (রা.)-এর কাছে কুরআন মজীদে তরজমা ও তফসীর পড়েছিলেন। কিছুটা বুখারী শরীফও পড়েছিলেন। ১৮৯৮ সনে হযরত মাহমুদ (রা.) হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেন। যদিও তিনি জন্মগত আহমদী হবার কারণে এর প্রয়োজন ছিল না।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) নিজ গ্রন্থ তিরইয়াকুল কুলুব লিখেছেন যে, মাহমুদই সেই পুত্র ১০ জুলাই ১৮৮৮ এবং ১ ডিসেম্বরের সবুজ ইশতেহারে (১৮৮৮) যার প্রতিশ্রুতি ছিল। [তিরইয়াকুল কুলুব, পৃ. ১৪, ৩৪ ও ৪০]

‘তোহফায়ে গুলড়বিয়া’, পৃষ্ঠা ৫৬, নুযুলে মসীহ, পৃষ্ঠা ১৯২-এ মসীহ মাওউদ (আ.) ঐ একই কথা উল্লেখ করেছেন।

এজন্য বার বার আমরা হযরত (আ.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে থাকি যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর লেখা হতে সুস্পষ্ট যে, সাহেববাদা মির্যা মাহমুদ-ই প্রতিশ্রুত মুসলেহ মাওউদ কিন্তু তবুও লাহোরী গ্রুপ এ কথা অস্বীকার করে। অক্টোবর ১৯০২ সনে সৈয়দা মাহমুদা বেগম সাহেবা (পিতা হযরত ডা. রশীদ উদ্দীন সাহেব)-এর সাথে হযরত সাহেববাদা মাহমুদ আহমদ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

ডিসেম্বর ১৯০৫ সনে আল-ওসীয়্যত পুস্তকে হযরত (আ.) হযরত মুসলেহ মাওউদ সম্পর্কে লিখেন, “আল্লাহ তাঁ'লা আমাকে খবর দিয়েছেন, আমি তোমার ঔরসজাত সন্তানদের মধ্য হতে একজনকে দাঁড় করব- যাকে আমি আমার নৈকট্য ও ওহীর দ্বারা নিযুক্ত করব...” [আল-ওসীয়্যত, পৃ. ৬ টীকা]

হযরত আকদাস (আ.) ১৯০৭-এ হাকীকাতুল ওহী গ্রন্থেও তাঁর উল্লেখ করেছেন। (পৃ. ২১৬)

হযরত মির্যা মাহমুদ আহমদ বাল্যকাল থেকে তাঁর নিজ যোগ্যতার প্রমাণ দিতে শুরু করেছিলেন। বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেয়া যাচ্ছে না। ১৯০৬ সনে সালানা জলসা কাদিয়ানে তিনি যে বক্তব্য রাখেন তা সবার চোখেই অসাধারণ বলে মনে হয়েছে।

তার পূর্বে মার্চ ১৯০৬ হযরত মির্যা মাহমুদ সাহেবের সম্পাদনায় ‘তাশহিয়ুল আযহান’ নামে পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ হয়েছে।

হযরত মির্যা মাহমুদ সম্পাদিত ‘তাশহিয়ুল আযহান’ যারা পড়েছেন তারা এই বয়সে এ ধরনের জোরালো প্রবন্ধ দেখে আশ্চর্য হয়েছেন।

তিনি ১৮ জুন ১৯১৩ হতে আল-ফযল পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। প্রথমে তিন দিনে এক সংখ্যা তারপর দৈনিক আল-ফযল। তাঁর খিলাফতের প্রথম থেকেই আল-ফযল জামা’তের কেন্দ্রীয় মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হতে থাকে এবং কিয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবে, (ইনশাআল্লাহ)।

১৯১১ সনে তিনি মজলিস আনসারুল্লাহ নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিভিন্ন বয়সের মানুষকে ধর্মের সেবার কাজে নিয়োজিত করা ছিল এর উদ্দেশ্য। এই আনসারুল্লাহর উদ্যোগে ইসলামের প্রথম মুবাল্লেগ হযরত চৌধুরী ফতেহ মোহাম্মদ সাইয়াল সাহেব (রা.), হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.)-এর অনুমতিক্রমে ইংল্যান্ডে প্রেরিত হন।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর কৃতিত্ব, সাফল্য এবং অসাধারণ কার্যক্রমের ইতিহাস অনেকগুলো খণ্ডে লেখা হয়েছে। এগুলো সবার পড়া উচিত।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ২৬ মে ১৯০৮ তারিখে ইস্তেকাল করেন। হযরত মির্যা মাহমুদ (রা.) বলেছেন, এই সময় আমি সর্বপ্রথম কাজ এটা করেছিলাম যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর পবিত্র মৃত দেহের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, “সকলে যদি হযরত (আ.)-কে পরিত্যাগ করে চলে যায় এবং আমি সম্পূর্ণ একা হয়ে যাই, তাহলে আমি একাই সকলের মুখোমুখি হব, প্রতিযোগিতা করব, কোনো বিরোধিতা বা শত্রুতার পরোয়া করব না”। [সাওয়ানেহ ফযলে উমর, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৯, তারীখে আহমদীয়াত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪৮]

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) ১৯০৩ সনে নযম (কবিতা) রচনা আরম্ভ করেছিলেন যখন তার বয়স মাত্র ১৪ বছর ছিল। যেমন লিখেছেন,

اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا
بیارِ عشق ہوں ترا دے تو شفا مجھے

অর্থ: নিজ করুণাবশত আমাকে মাফ করে দাও আমার প্রিয় খোদা!

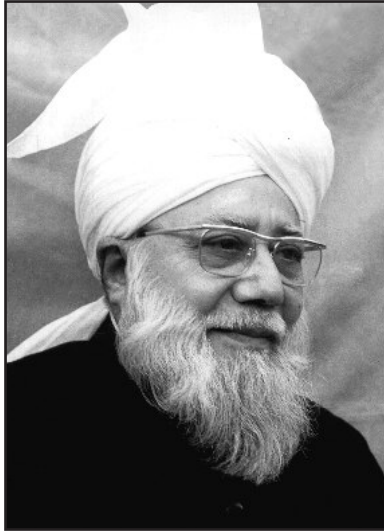
তোমার প্রেমে আক্রান্ত অসুস্থ আমি- আমাকে রোগমুক্তি দাও।

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) খলীফা হবেন একথা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) জানতেন এবং বলেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.)-ও জানতেন, লাহোরী গ্রুপের নেতারাও জানতেন- তাদের পৃথক হবার পূর্ব থেকেই। এজন্যই তারা হযরত খলীফা আউয়াল (রা.)-এর ইন্তেকালের পর খিলাফতের নির্বাচন যেন হতে না পারে সেজন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) প্রায় ৫২ বছর খিলাফতের গুরু দায়িত্ব পালন করে প্রায় ৭৬ বছর বয়সে ৭-৮ নভেম্বরের মধ্যবর্তী রাতে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর যুগে হিন্দুস্তানের বাইরে মোট ৪৬টি দেশে মিশন কায়েম হয়েছে। ৩১৮টি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। ১৬টি ভাষায় কুরআন মজীদের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি দু-শোর বেশি মূল্যবান জ্ঞানগর্ভ বই লিখেছেন। এর মধ্যে দশ খণ্ডে প্রায় দশ হাজার পৃষ্ঠার তফসীরে কবীর এবং তফসীরে সগীর (তরজমা কুরআন) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হযরত সাহেবযাদা মির্যা নাসের আহমদ

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহেমাহুল্লাহ তা'লা)



হযরত সাহেবযাদা মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) ১৫ নভেম্বর ১৯০৯ তারিখে কাদিয়ান দারুল আমানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) এবং হযরত মাহমুদা বেগম (রা.)-এর সুযোগ্য সন্তান ছিলেন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আম্মাজান [হযরত সৈয়দা নুসরত জাহাঁ (রা.)] ভারাক্রান্ত হৃদয় থাকছিলেন। একদিন হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) তাঁর শিশু পুত্র সাহেবযাদা নাসেরকে হযরত আম্মাজানের হাতে তুলে দিলেন— এই বলে যে, ‘আম্মা! এখন থেকে নাসের আপনার ছেলে, আপনি তাকে নিজের ছেলে মনে করে মানুষ করবেন’। তারপর থেকে সাহেবযাদা নাসের আহমদ হযরত আম্মাজানের কোলে বড়ো হতে থাকেন।

অপর দিকে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ইলহামসমূহের মধ্যে এমন একটি পুত্রের উল্লেখ ছিল। সুতরাং হযরত মির্যা নাসের আহমদ হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর পুত্রের মতোই লালিত পালিত হয়েছিলেন।

হযরত আম্মাজান খুব খেয়াল রাখতেন সাহেবযাদা নাসের যেন হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর ইচ্ছামত তা’লীম তরব্বি়ত এবং আচার আচরণ শিখেন। হযরত আম্মাজান খুব যত্ন সহকারে তা’লীম তরব্বি়ত দিয়েছেন।

সাহেবযাদা মির্যা নাসের আহমদ ফেব্রুয়ারি (১৯১৭) মাসে প্রথমবার কুরআন মজীদ নাযেরা পড়ে শেষ করেন। এরপর তেরো বছর বয়সে কুরআন মজীদ হিফয (মুখস্থ) করে হাফেযে কুরআন হবার গৌরব অর্জন করেন।

হযরত মির্যা নাসের আহমদ সাহেবের উচ্চ শিক্ষার জন্য লন্ডনে যাবার সিদ্ধান্ত হয়। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর ইচ্ছামত প্রথমে বিয়ে, পরে লন্ডন যাত্রার পদক্ষেপ গৃহীত হয়। ৬ আগষ্ট ১৯৩৪ তারিখে সাহেবযাদা নাসের আহমদ মোহতরমা মনসুরা বেগম সাহেবার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। মনসুরা বেগম হযরত নবাব মোহাম্মদ আলী (রা.) (নবাব মালির কোটলা) ও সৈয়দা নওয়াব মোবারকা বেগম (রা.)-এর কন্যা। হযরত নওয়াব মোবারকা বেগম (রা.) হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর কন্যা ছিলেন। বিয়ের প্রায় এক

মাস পরে ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ সনে লন্ডন যাত্রা করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম. এ. পাশ করে তিনি ১৯৩৮ সনে দেশে ফেরত আসেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) ছেলেদের লন্ডন পড়তে পাঠাতেন এজন্য যে, তাঁরা যেন বড়ো হয়ে ইসলামের পক্ষে যোগ্যতার সাথে কাজ করতে পারেন। বড়ো বড়ো কাজের জন্য যোগ্যতা, জ্ঞানের ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন।

হযরত মির্যা নাসের আহমদ সাহেব ওয়াকফে জিন্দেগী ছিলেন। সাহেবযাদা মির্যা নাসের আহমদ দেশে ফেরত আসলে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) তাঁকে তালীমুল ইসলাম হাই স্কুল কাদিয়ানের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করেন। কিছুদিন পরই সদ্য জন্ম লাভ করা মজলিস খোদামুল আহমদীয়া মরকযীয়ার ‘সদর’ হিসাবে হযরত সাহেবযাদার নাম প্রস্তাব করা হয় এবং তাঁকে ‘সদর’ হিসাবে নিয়োগ দান করা হয়। সাহেবযাদা মির্যা নাসের আহমদ লিখেছেন যে, তিনি এর জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু আদেশ মান্য করতে হয় বলে তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তবে ইতিহাস বলে তিনি সদর হিসাবে অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছিলেন। বিশেষকরে ১৯৪৭ সনে যখন দেশ স্বাধীন হয় বা পাকিস্তানের জন্ম হয় তখন ভারত থেকে অধিকাংশ মুসলমানরা হিজরত করে পাকিস্তান চলে আসেন আমাদের মরকয তথা হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-ও কাদিয়ান ছেড়ে পাকিস্তান চলে আসেন। ঐ সময় প্রায় এক লক্ষ মুসলমান কাদিয়ানে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। এদের ভারত থেকে পাকিস্তান স্থানান্তরিত করা একটি অনেক বড়ো কাজ ছিল। সে সময় হযরত মির্যা নাসের আহমদ সাহেব অসাধারণ বীরত্ব, দক্ষতা ও যোগ্যতার প্রমাণ দেন।

হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে প্রায় ছয় মাস কর্তব্য পালনের পর, ২৭ নভেম্বর ১৯৩৮ সনে হযরত সাহেবযাদা সাহেবকে জামেয়া আহমদীয়া কাদিয়ানের ওস্তাদ হিসাবে নিয়োগ দান করা হয়। কিছু দিন পরে তিনি প্রিন্সিপাল হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। ১ মে ১৯৩৮ হতে এপ্রিল ১৯৪৪ পর্যন্ত তিনি জামেয়া আহমদীয়ার প্রিন্সিপাল হিসাবে কর্তব্য পালন করেন।

১ মে ১৯৪৪ হতে তালীমুল ইসলাম কলেজ কাদিয়ানের প্রিন্সিপাল হিসাবে

হযরত সাহেবযাদা নাসের আহমদ নিয়োগ প্রাপ্ত হন। ১৯৪৫ সনে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির (লাহোর) একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর সময় কালে তালীমুল ইসলাম কলেজ বড়ো বড়ো সম্মান জনক সাফল্য লাভ করে। এ কলেজ পাকিস্তান হবার পর কয়েক বছর লাহোর তারপর রাবওয়ায় স্থানান্তরিত হয়। খলীফা নির্বাচিত হওয়া পর্যন্ত তিনি এ পদে কর্মরত ছিলেন। ১৯৬৫ সনের ৭-৮ নভেম্বর রাতে হযরত মুসলেহ মাওউদ খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) ইন্তেকাল করেন। ৮ নভেম্বর হযরত সাহেবযাদা মির্যা নাসের আহমদ মজলিস ইনতেখাবের নির্বাচনে খলীফাতুল মসীহ সালেস বা তৃতীয় খলীফা নির্বাচিত হন।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর যুগ খুবই আর্থিক সংকটের মধ্যেও কুরবানীর যুগ ছিল। হুযূর (রা.) একের পর এক মালী কুরবানীর তাহরীক করছিলেন। হুযূর (রা.) স্বয়ং নিজে এবং নিজের পরিবার বর্গের সকলকে খুব কম খরচে জীবনযাপন করতে শিখিয়েছিলেন। জামা'তকে বার বার বলতেন হালাল উপার্জন করো। কিন্তু নিজের জন্য কম খরচ করো। জামা'তের জন্য বেশি কুরবানী করো। হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) খিলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হবার কিছুকাল পর আল্লাহ তা'লা হুযূরকে জানানেন, “ম্যায় তেনু ইননা দেয়াংগা ইননা দেয়াংগা কে তুঁ রাজ জাঁয়ে গাঁ”, “আমি তোমাকে এত দিব এত দিব যে, তুমি সম্ভ্রষ্ট হয়ে যাবে”। এরপর খুব দ্রুত জামা'তের আর্থিক উন্নতি হতে শুরু করেছিল।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেহ (রাহে.) তালীমুল কুরআনের প্রতি খুব বেশি দৃষ্টি দিয়েছিলেন। পৃথক নাযারাত (বিভাগ) খুলেছিলেন, ‘তালীমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরযী’ একজন নাযের সাহেবকে নিযুক্ত করেছিলেন। কেন্দ্রে ও বড়ো বড়ো জামা'তগুলোতে তালীমুল কুরআন ক্লাস চালু করা হয়েছিল। হুযূর খুব জোর দিয়ে বার বার বলতেন কুরআন পড়তে পারে না, পড়ে না, এমন যেন কেউ না থাকে।

কুরআন অনুবাদ প্রকাশ ও প্রসারের প্রতিও খুব জোর দিয়েছিলেন। তাঁর যুগে পূর্বের তুলনায় সবচেয়ে বেশি ভাষায় কুরআনের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। তবে সর্বপ্রথম হযরত খলীফা সালেস (রাহে.) যে তাহরীক করেছিলেন তা ছিল যে, কেউ যেন অভুক্ত না থাকে। অভুক্তদের খাবার খাওয়াতে হবে।

হযরত খলীফা সালেস (রাহে.)-এর যুগেও মুনাফিকদের দল বার বার ফিতনা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিল। হযূর জামা'তের উন্নতির জন্য বহু কিছু করেছিলেন, সকল বিষয় বর্ণনা করা সম্ভব হবে না।

একবার ১৯৭২-৭৩ সনে ঘোষণা দিলেন পাঞ্জাবের গ্রামে গ্রামে যেতে হবে। পরিসংখ্যান ও পরিকল্পনা নিতে হবে। কোন গ্রামে স্কুল নাই, কোন গ্রামে মসজিদ নাই, কোন গ্রামে ডাক্তার বা ডিসপেনসারি নাই ইত্যাদি। যে-সব গ্রামে এগুলো নাই সেসব গ্রামে সেগুলোর ব্যবস্থা নিতে হবে। কাজ আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৪ সনের ভয়াবহ আহমদী বিরোধী আন্দোলন সব লণ্ডভণ্ড করে দিল।

হাজার হাজার আহমদীর ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হলো, দোকানপাট জ্বালিয়ে দেয়া হলো। অবশেষে আহমদীদের অমুসলিম ঘোষণা করা হলো। ২৯ এপ্রিল ১৯৭৪ জ্বালাও, পোড়াও, হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়েছিল এবং ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ আহমদীয়া জামা'তকে অমুসলিম ঘোষণা করা হলো। বলা হলো যে, আহমদীদের জীবন রক্ষার্থে এটা করা হয়েছে অথচ কয়েক বছর পর তারা ই বিভিন্ন আলাপচারিতার মধ্যে বলতে লাগল 'আমরা করছিলাম'। ঐ যুগের ঐ দৃশ্য বড়োই হৃদয়বিদারক।

১৯৭৪ এর পূর্বে মৌলভী সাহেবরা জনসভায় বলতেন, 'তোমরা রাবওয়া যেও না- তারা জাদু করবে।' ১৯৭৪-এর পর তারা বলতে শুরু করলেন 'রাবওয়া চলো, রাবওয়া চলো'। রাবওয়া- যা মিরযায়ীরা (আহমদীরা) পৃথক রাষ্ট্র কায়ম করেছে- সেটা ভেঙে দিতে হবে। লোকজন রাবওয়া যেতে শুরু করল। আস্তে আস্তে বেশি হতে থাকল। আহমদীরাও তবলীগের সুযোগ পেলেন। শেষের দিকে তো প্রতি সপ্তাহে ৭/৮-শো বা হাজারের বেশি মানুষ রাবওয়া যেতে শুরু করেছিল। অধিকাংশই বয়আত হয়ে ফিরে যেত। যারা যেত তারা রাবওয়া দেখত। হযরত খলীফাতুল মসীহ-এর সাথে দেখা করত, আলেমদের সাথে আলোচনায় বসত, তারপর বয়আত করত।

১৯৭৪ এর পর থেকে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেহ (রাহে.) খুব কষ্ট করতেন। অক্লান্ত পরিশ্রম, রাতদিন পরিশ্রম করতেন।

১৯৭৩ সনে হযূর শতবার্ষিকী জুবিলীর জন্য প্রোগ্রাম ঘোষণা করেছিলেন।

একশ দেশে জামা'ত কায়েম করার চেষ্টা এবং সে সকল দেশের ভাষায় প্রচারপত্র তৈরি করে প্রকাশ ও প্রচার ইত্যাদি। ১৯৮৯ সনে জামা'তের একশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এই জুবিলী উদ্‌যাপিত হয়েছিল। ১৯৭৪ সনে জামা'তকে অমুসলিম ঘোষণার পর হাজার হাজার বয়আত হতে গুরু করে, কারণ দেশবাসী জানত যে আহমদীরা নামায পড়ে, কুরআন পড়ে, মসজিদ নির্মাণ করে, বিদেশে প্রচার করে, সুতরাং অমুসলিম হতে পারে না।

শত্রুরা ভেবেছিল আহমদীদের অমুসলিম ঘোষণা করলে মানুষ আর আহমদী হবে না। বরং আহমদীরাও আহমদী থাকবে না। পাকিস্তানের ভুট্টো সরকার ভেবেছিল যে, আহমদীরা যদি আইন ভঙ্গ করে বিদ্রোহ করে তাহলে তাদের ক্রাশ বা চুরমার করে দেয়া হবে। কিন্তু ফল হয়েছিল বিপরীত।

৮-৯ জুন ১৯৮২ তারিখে মধ্যরাতে হযরত মির্যা নাসের আহমদ খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ১০ জুন তারিখে হযরত মির্যা তাহের আহমদ, চতুর্থ খলীফা নির্বাচিত হন।

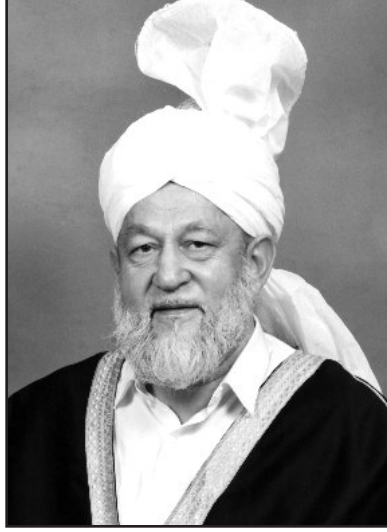
হযরত মির্যা নাসের আহমদ খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) সম্পর্কে ঐশী ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর একটি ইলহাম ছিল আর তা হলো: 'আমরা তোমাকে এক পুত্রসন্তানের শুভ সংবাদ দিচ্ছি সে তোমার পৌত্র হবে, আমার পক্ষ থেকে হবে'। [বদর, কাদিয়ান, ৫ এপ্রিল ১৯০৬]

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) ও তাঁর এ ছেলের জন্য শুভ সংবাদ লাভ করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, আল্লাহ তা'লা আমাকে এ খবর দিয়েছেন যে, 'আমি তোমাকে এমন এক পুত্রসন্তান দিব যে ধর্মের (নাসের) সাহায্যকারী হবে এবং ইসলামের সেবায় সদা প্রস্তুত থাকবে'। [আল-ফযল, রাবওয়া, ৮ এপ্রিল ১৯১৫]

আল্লাহ তা'লা হযুর (রাহে.)-কে জান্নাতে সম্মানিত স্থান দান করুন।

হযরত সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ

খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহেমাহুল্লাহ তা'লা)



১৮ ডিসেম্বর ১৯২৮ রোজ মঙ্গলবার সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ জন্মগ্রহণ করেন। হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব, পিতা হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)। মাতা হযরত সৈয়্যদা মরিয়ম বেগম সাহেবা, যিনি উম্মে তাহের নামে পরিচিত ছিলেন।

হযরত সৈয়্যদা মরিয়ম বেগম-এর এক পুত্র সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ। এছাড়া তিনি আরও চার কন্যার জননী ছিলেন। তিনি অল্প বয়সে ৫ মার্চ ১৯৪৪ তারিখে মৃত্যুবরণ করেছিলেন- যখন সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদের বয়স ছিল মাত্র ১৫ বছর। তবে হযরত উম্মে তাহের (রা.)-কে একবার হযরত মুসলেহ মাওউদ একান্ত আলাপে বলেছিলেন যে, তোমার ছেলে তাহের খলীফা হবে।

১৮ ডিসেম্বর ১৯২৮ তারিখে সাহেবযাদা তাহের আহমদের জন্ম হয় এবং ১৯ ডিসেম্বর ১৯২৮ থেকে কাদিয়ানে রেলগাড়ি যাতায়াত আরম্ভ করে। তিনি

১৯৪৪ সনে তালীমুল ইসলাম হাই স্কুল কাদিয়ান হতে ম্যাট্রিক পাশ করেন। তারপর বি.এ. পাশ করেন। তারপর দেশ বিভাগ অর্থাৎ পাকিস্তানের জন্মের ১৯৪৯ সনে তিনি জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হন এবং ১৯৫৩ সনে জামেয়া পাশ করে শাহেদ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫৫ সনে উচ্চ শিক্ষার জন্য লন্ডন যাত্রা করেন।

১৯৫৭ সনে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) ওয়াকফে জাদীদের ঘোষণা দেন। তখন ওয়াকফে জাদীদের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য সাহেবযাদা মির্যা তাহেরকে দেশে ফেরত চলে আসতে বলেন। ৪ অক্টোবর ১৯৫৭ তিনি দেশে ফেরত আসেন।

৫ ডিসেম্বর ১৯৫৭ তারিখে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) সৈয়দা আসফা বেগম (বাবা সাহেবযাদা মির্যা রশিদ আহমদ ও মা সাহেবযাদী আমাতুস সালাম)-এর সাথে সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদের বিবাহের ঘোষণা দেন। ৯ ডিসেম্বর ১৯৫৭ তারিখে বিয়ে এবং ১১ ডিসেম্বর দাওয়াতে ওলীমা (বৌভাত) অনুষ্ঠিত হয়।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) ১৯৫৭ ওয়াকফে জাদীদ প্রতিষ্ঠা করেন। পরিচালনা বোর্ডের কর্মকর্তাদের নামের তালিকায় হুযূর (রা.) প্রথম নাম হিসাবে সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদের নাম লিখেন এবং ১২ ডিসেম্বর ১৯৫৭ তারিখে ‘নায়েম ওয়াকফে জাদীদ’ (সর্বোচ্চ নির্বাহি কর্মকর্তা) হিসাবে কাজ শুরু করেন।

১৯৬০ সনে জলসা সালানা রাবওয়া হতে সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ বক্তব্য রাখেন। ১৯৬২ সনে তাঁর বই ‘ধর্মের নামে রক্তপাত’ প্রকাশিত হয়।

১৯৬৬ সনের নভেম্বর হতে ১৯৭০-এর অক্টোবর পর্যন্ত সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ মজলিস খোদামুল আহমদীয়া মরকযীয়ার নির্বাচিত সদর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭৪ সনে হযরত খলীফাতুল সালেস (রাহে.)-এর সাথে সহকারী টিমের সদস্য হিসাবে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করেন।

১ জানুয়ারি ১৯৭৯ সনে মজলিসে আনসারুল্লাহ মরকযীয়ার সদর নির্বাচিত হন। ১৯৮০ জানুয়ারি মাসে কিছুদিনের জন্য আমীর মকামী নিযুক্ত

হয়েছিলেন। সাহেববাদা মির্খা তাহের আহমদ চার কন্যার পিতা ছিলেন। নায়েম ওয়াকফে জাদীদ হিসাবে সমগ্র পাকিস্তানের জামা'তগুলো সফর করেন। তিনি সবসময় জেরে তবলীগদের নিয়ে প্রশ্নোত্তর সভা করতেন। এভাবে সমস্ত জামা'তগুলোর মধ্যে বিশেষ জাগরণ সৃষ্টি করেন। শত শত জেরে তবলীগ মানুষের জনসভায় অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে প্রশ্নোত্তরে তাঁর অসাধারণ যোগ্যতা ছিল। খিলাফতের পরেও তিনি আজীবন এটা করে গেছেন। যে-কোনো প্রশ্নের উত্তর অতি চমৎকারভাবে দেয়ার অসাধারণ যোগ্যতা তাঁর ছিল। MTA-এর রেকর্ডে অগণিত ক্যাসেট রয়েছে।

১০ জুন ১৯৮২ রোজ বৃহস্পতিবার তিনি খলীফা নির্বাচিত হন এবং শুক্রবার ১১ জুন হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে প্রথম খুতবা জুমুআ প্রদান করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.)-এর অনেকগুলো বড়ো বড়ো সাফল্যের মধ্যে একটি বড়ো সাফল্য ছিল স্পেনে আহমদীয়া মসজিদ নির্মাণ। পেড্রোয়াবাদ নামক স্থানে মসজিদ বাশারাতের উদ্বোধন এবং ইউরোপ সফরের প্রোগ্রামটি ছিল হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.)-এর প্রস্তুত করা প্রোগ্রাম। আল্লাহর ইচ্ছায় হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) সেই প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করেন এবং ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ স্পেনের মসজিদ উদ্বোধন করেন।

তারপর ২৯ অক্টোবর ১৯৮২ হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) গৃহহীনদের জন্য 'বুয়ুতুল হামদ' পরিকল্পনার ঘোষণা দেন। এর অধীনে গৃহহীনদের জন্য সস্তা দামে বসবাস যোগ্য বাসস্থান নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ধনবান ব্যক্তির এ ফাণ্ডে টাকা দিয়ে থাকেন। বর্তমানেও গরীবদের জন্য ঘর প্রদান কাজ চালু আছে।

১৫ ডিসেম্বর আমেরিকায় পাঁচটি নতুন মিশন হাউজ ও মসজিদ নির্মাণের ঘোষণা দেন। তারপর খুব দ্রুত জামা'তের অগ্রযাত্রা চলতে থাকে। শত্রুরা পরিকল্পনা করল হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-কে ফাঁসি দেয়া হবে। এ উদ্দেশ্যে মিথ্যা খুনের মামলাও প্রস্তুত করা হলো। তারপর পাকিস্তানের সেনা প্রধান জেনারেল জিয়াউল হক সাহেব এন্টি আহমদীয়া অর্ডিন্যান্স জারি করলেন। পরে এটা আইন বানিয়ে দেয়া হলো।

আল্লাহ তা'লা নিজ ক্ষমতার বিরাট বিকাশ দেখালেন। হযরত মির্খা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) হিজরত করে লন্ডন চলে গেলেন।

প্রকাশ্যেই গেলেন। অথচ পাকিস্তানের প্রধান সামরিক শাসক জেনারেল জিয়াউল হক শত চেষ্টা করেও তাঁকে আটক করতে পারলেন না। ২৬ এপ্রিল ১৯৮৪ তারিখে এন্টি আহমদীয়া অর্ডিন্যান্স জারি করা হলো। হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.), ২৯ এপ্রিল ভোররাতে রাবওয়াহ হতে হিজরত করে ইউরোপ যাত্রা করলেন। ২৮ এপ্রিল মসজিদ মোবারকে শেষ বার এশার নামায তিনি পড়ালেন। এশার পর আকস্মিক ২/৩ মিনিটের একটি ছোটো কিন্তু যুগান্তকারী ভাষণ প্রদান করলেন। আকস্মিক হবার কারণে এটি রেকর্ড করা হয় নি। হযরত সাহেব ৩০ এপ্রিল নিরাপদে লন্ডন পৌঁছে গেলেন। আল্লাহ্ আকবর।

তারপর আহমদীয়াতের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা হলো যা এখনও জারি আছে। এত দ্রুত জামা'তের অগ্রগতি আরম্ভ হয়েছে যে এখন সারা বিশ্ব চিত্তিত। কী করে কী হয়ে গেল? সবাই হতবাক। ১৯৯১ সনে জলসা সালানা উপলক্ষ্যে হযরত সাহেবের কাদিয়ান সফর, ইংল্যান্ড জলসা সালানা ১৯৯২ সরাসরি টেলিভিশনে দেখা গেছে। ২১ আগস্ট ১৯৯২ তারিখের খুতবা জুমুআ পৃথিবীর ৪টি মহাদেশে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছে।

১৯৯৩ সনে লন্ডন জলসায় আন্তর্জাতিক বয়আত অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়েছে এবং প্রথম বছর (১৯৯৩ সনে) দুলাক্ষ বয়আত, তারপর প্রতি বছর দ্বিগুণ হারে ২০০২ পর্যন্ত তা বজায় ছিল। ৭ জানুয়ারি ১৯৯৪ এম.টি.এ. নিয়মিত সম্প্রচার শুরু এবং সাপ্তাহিক আল ফযল লন্ডন প্রকাশ আরম্ভ হয়।

২০০২ সনের লন্ডন জলসা সালানা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর শেষ জলসা ছিল।

পাকিস্তান ছেড়ে হিজরত করে লন্ডন যাত্রার পর তথা ১৯৮৪ হতে ২০০২ পর্যন্ত ১৩০৬৫টি নতুন মসজিদ এবং ৯৪৫টি নতুন মিশন হাউজ কয়েম হয়েছে। ৫৬টি ভাষায় পরিপূর্ণ কুরআন শরীফের অনুবাদ ছেপেছে (এ যুগে মোট ৮৪টি নতুন দেশে আহমদীয়াত কয়েম হয়েছে) এবং মোট ১৭৫টি দেশে আহমদীয়াত কয়েম হয়েছে। শত্রুরা এখনো বুঝতে পারছে না যে তাদের চেষ্টার ফলাফল কী?

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, ১০ জুন ১৯৮৮ তারিখে হযর বিশ্বের সকল বিরোধীদেরকে মুবাহালার চ্যালেঞ্জ দিলেন। ১৯৮৮ হতে ১৯৯৮ পর্যন্ত

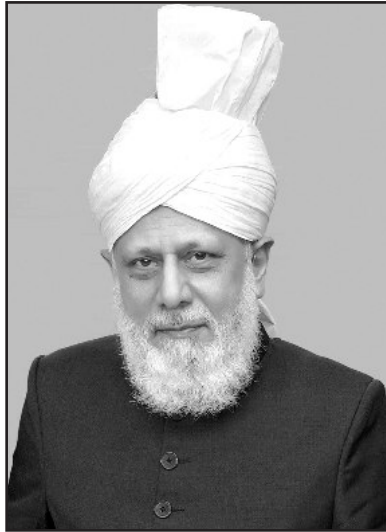
মুবাহালার ফলাফল দ্বারা সারা পৃথিবীতে সকলের চোখের সামনে বড়ো বড়ো বিরোধীরা মৃত্যুবরণ করায় প্রমাণ হয়েছে যে, হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) আল্লাহর খাস বান্দা ছিলেন। জামা'তে আহমদীয়ার চতুর্থ খলীফা আল্লাহর হেফাযতে ছিলেন। এতে প্রমাণ হয়ে গেছে যে, আহমদীয়া খিলাফত ইসলামী খিলাফত আল্লাহর নিজ হাতে গড়া খিলাফত এবং এর হেফাযত আল্লাহ নিজ হাতে করছেন।

আল্লাহর ইচ্ছায় ১৮ এপ্রিল ২০০৩ হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) মসজিদ ফযল লন্ডনে জুমুআর খুতবা দিলেন এবং সন্ধ্যায় মজলিসে এরফান অনুষ্ঠান করলেন। কথাবার্তা বললেন, প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

১৯ এপ্রিল ২০০৩ সনে সকাল ৯.৩০ মিনিটে (লন্ডন সময়) ৭৫ বছর বয়সে ইহুদাম ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

হযরত সাহেবযাদা মির্যা মাসরুর আহমদ

খলীফাতুল মসীহ আল-খামেস (আইয়্যাদাহু ল্লাহু তা'লা বিনাসরিহিল আযীয)



হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৫০ সনে দারুল হিজরত রাবওয়ায় জনগ্রহণ করেন। পিতার নাম হযরত মির্যা মনসুর আহমদ

ইবনে হযরত মির্যা শরীফ আহমদ (রা.) ইবনে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)। হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর দাদা হযরত মির্যা শরীফ আহমদ (রা.), হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সর্বকনিষ্ঠ পুত্র। হযরত সাহেবযাদা মির্যা শরীফ আহমদ (রা.)-এর জৈষ্ঠপুত্র হযরত মির্যা মনসুর আহমদ (রাহে.) দীর্ঘকাল নাযেরে আলা ও আমীর মোকামী রাবওয়াহ ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর লন্ডন হিজরতের পর থেকে তিনি আমীর মোকামী ছিলেন। নিয়মমতে, হযরত আমীরুল মু'মিনীন কেন্দ্রের বাইরে অবস্থানকালে কেন্দ্রে যিনি তার স্থলে কর্তব্যরত থাকেন তাঁকে আমীর মোকামী বলা হয়।

হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.)-এর আন্না মোহতরমা সাহেবযাদী নাসেরা বেগম হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর প্রথম কন্যা, হযরত মির্যা নাসের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ সালেস (রা.)-এর আদরের বোন। আল্লাহ তাকে দীর্ঘজীবী করুন। হযরত খলীফাতুল মসীহ খামেস (আই.)-এর পিতা হযরত মির্যা মনসুর আহমদের ইন্তেকালের পরে তাঁরই স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) ঐশী ইশারা পেয়েই তাঁকে তাঁর পিতার স্থানে বসিয়েছিলেন বা নাযেরে আলা পদে নিয়োগ দান করেছিলেন।

হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ ১৯৭৬ সনে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ফয়সালাবাদ থেকে এম. এস. সি. পাশ করেন। ৩১ জানুয়ারি ১৯৭৭ তারিখে সৈয়দা আমাতুস সুবুহ বেগম সাহেবা (বিনতে সৈয়দ দাউদ মুজাফফর শাহ সাহেব)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি এক ছেলে ও এক মেয়ের পিতা। ছেলে ও মেয়ে উভয়ে বিবাহিত।

তারপর জীবন উৎসর্গ করে কেন্দ্রের নির্দেশে মজলিস নুসরত জাহাঁ স্কীমের অধীনে আগস্ট ১৯৭৭ সনে ঘানা, পশ্চিম আফ্রিকা যাত্রা করেন। ১৯৮৫ সনে ঘানা হতে ফেরত আসেন এবং নাযের উকিলুল মাল সানী হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন।

১৮ জুন ১৯৯৪ সনে নাযের তালীম হিসাবে সদর আঞ্জুমানে নিযুক্ত হন।

তাঁর পিতা হযরত মির্যা মনসুর আহমদ নাযেরে আলায় ইন্তেকালের পর হযরত

খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) তাঁকে ১০ ডিসেম্বর ১৯৯৭ তারিখ থেকে নায়েরে আলা পদে নিয়োগ প্রদান করেন।

নায়েরে আলা হিসাবে থাকাকালেই তিনি নায়ের যিয়াফত ও নায়ের যিরাআত-এর দায়িত্বও পালন করে যাচ্ছিলেন।

১৯৮৮ হতে ১৯৯৫ পর্যন্ত কাযা বোর্ডের সদস্য ছিলেন।

বরাবর মজলিস খোদামুল আহমদীয়া মরকযীয়ার মজলিসে আমেলার বিভিন্ন পদে কর্তব্য পালন করছিলেন। ১৮৮৯-১৮৯০ সনে নায়েব সদর মজলিস খোদামুল আহমদীয়া হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তারপর ১৯৯৫-১৯৯৭ পর্যন্ত মজলিস আনসারুল্লাহ মরকযীয়া আমেলার সদস্য ছিলেন।

১৯৯৯ সনে একটি মিথ্যা মামলায় পুলিশ তাকে কারারুদ্ধ রাখে এবং এভাবে তিনি আসীরানে রাহে মাওলা হবার সৌভাগ্য লাভ করেন। ৩০ এপ্রিল হতে ১০ মে ১৯৯৯ পর্যন্ত তিনি কারাগারে ছিলেন।

২২ এপ্রিল ২০০৩ তারিখ লন্ডন সময় অনুযায়ী রাত ১১.৪০ মি. খলীফাতুল মসীহ আল-খামেস হিসাবে ৫৩ বছর বয়সে নির্বাচিত হন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ইলহামগুলো পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি ইলহাম নাযিল হয়েছিল, “ইন্নি মাআকা ইয়া মাসরুর” অর্থ: “হে মাসরুর! নিশ্চয় আমি তোমার সাথে আছি”। [তায়কেরা]

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) একবার বুখারী শরীফের হাদীস, (সূরা জুমআর আয়াত, কিতাবুত তাফসীর বুখারী) ‘রাজুলুন আউ রিজালুন’ অর্থাৎ হযরত ইমাম মাহদী এবং তার সাথে আরো কতিপয় মহাপুরুষ-এর ব্যাখ্যায় বলেছিলেন যে, ‘আরো কতিপয় মহাপুরুষ যারা হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সাথে আবির্ভূত হবেন, এর মাঝে তৃতীয় খিলাফত, চতুর্থ খিলাফত, পঞ্চম খিলাফত, ষষ্ঠ খিলাফত এভাবে আল্লাহ তা’লা তাঁর অলৌকিক ও মহাশক্তির বিকাশ ঘটাতে থাকবেন। (দেখুন, আল ফযল, লন্ডন, ২ মে, ২০০৩)

আরো কয়েকটা ইলহাম:

(১) “উওহ বাদশাহ আয়া হ্যা” অর্থ: “ঐ যে বাদশাহ এসেছেন”।

(২) “আব তু হামারী জাগাহ ব্যাঠ অওর হাম চালতে হ্যায়” অর্থ: “এখন তুমি আমার স্থলে বসো এবং আমরা যাচ্ছি”।

এখানে মনে করা হয়েছে, হযরত মির্যা শরীফ আহমদ (রা.) সম্পর্কে বলা হয়েছে। হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) লিখেছেন যে, “এসব ইলহাম মির্যা শরীফ আহমদ সম্পর্কে। তবে পরবর্তীতে বংশধরদের কোনো কোনো ব্যক্তির মধ্যে দেখা যেতে পারে।”

হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) কোনো কোনো ইলহাম যা হযরত মির্যা শরীফ আহমদ (রা.) সম্পর্কে মনে করা হতো, সেগুলোকে তাঁর বড়ো ছেলে হযরত মির্যা মনসুর আহমদ সম্পর্কে পূর্ণতা পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ তা’লার কাছে এই দোয়া করি যেন আমাদেরকে যুগ-খলীফার পদমর্যাদা ও তাঁর গুরুত্ব বুঝার তৌফিক দান করেন। আর প্রকৃত আনুগত্যের রূহ আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করুন। (আমীন)



কিছু ঐতিহাসিক ছবি



লুখিয়ানায় সূফী আহমদ জান সাহেবের বাড়ি।
এই বাড়ির এ কক্ষটিতে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) প্রথম বয়আত গ্রহণ করেন।



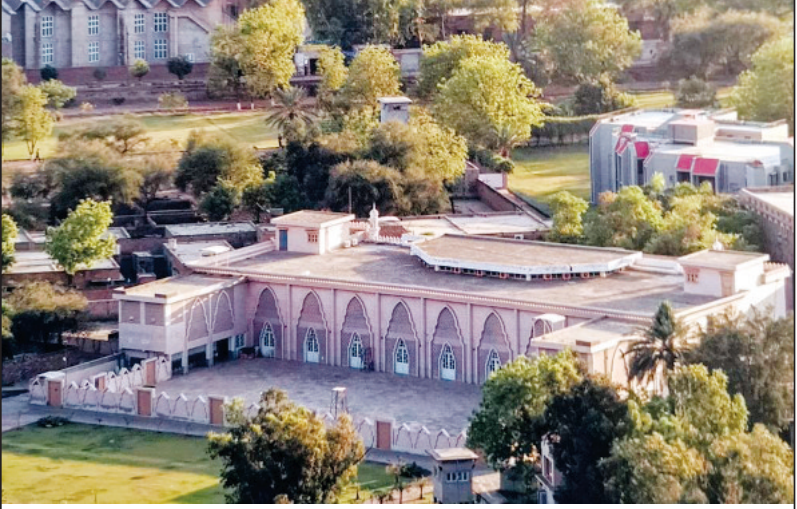
হুশিয়ারপুরে অবস্থিত এই দোতলা বাড়িতেই
হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) চল্লিশ দিন চিল্লাকাশি করেন।
এখানেই মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ঐশী ইলহাম লাভ হয়।



হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ইন্তেকালের পর
এই স্থানেই প্রথম খলীফা নির্বাচনের মাধ্যমে খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী
‘কুদরতে সানীয়া’ তথা দ্বিতীয় কুদরতের বিকাশ ঘটে।



‘মসজিদে নূর’। এখানেই মুসলেহ মাওউদ হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)
দ্বিতীয় খলীফা হিসাবে নির্বাচিত হন।



‘মসজিদে মোবারক’, রাবওয়া। এখানে আহমদীয়া মুসলিম জামা‘তের তৃতীয় এবং চতুর্থ খলীফা নির্বাচিত হন।



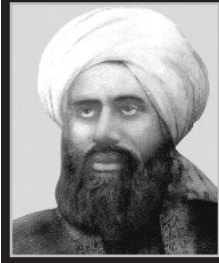
‘মসজিদ ফয়ল’। এখানেই আমাদের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) পঞ্চম খলীফা হিসাবে নির্বাচিত হন।

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

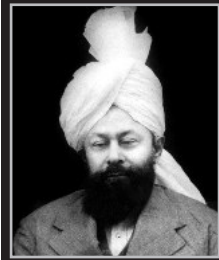
খাতামান্নাবীঈন (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী
শেষ যুগে প্রতিষ্ঠিত ঐশী খিলাফত



হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)



হযরত আলহাজ্জ হাফেয
হেকীম নূরুদ্দীন (রা.)



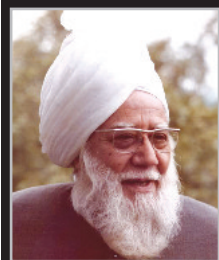
হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন
মাহমুদ আহমদ (রা.)



হযরত মির্যা মাসরুর
আহমদ (আই.)



হযরত মির্যা তাহের
আহমদ (রাহে.)



হযরত মির্যা নাসের
আহমদ (রাহে.)

Memorable Days in Ahmadiyya History

Masih Maud^(as) Day: Saturday 23rd March 1889 was the momentous day when Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, the Promised Messiah^(as), accepted the hands of forty faithful servants in allegiance to the Ten Conditions of Bai'at (initiation) and founded the community which he named 'The Ahmadiyya Muslim Community' later. The Promised Messiah^(as) took this oath of allegiance at the house of a spiritual preceptor Hazrat Sufi Ahmad Jan Sb. in the city of Ludhiana (Punjab, India). Hazrat Hakim Maulvi Nuruddin^(ra) was the first person to have the honor of pledging the first "Bai'at". This was a revolutionary yet a very modest beginning to a new chapter in the history of Islam.

Musleh-e-Maud^(ra) Day: 20th February is specially commemorated in the Ahmadiyya Muslim Community with regard to the Prophecy of Musleh-e-Maud [the Promised Reformer]. This prophecy was fulfilled in the person of Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, Khalifatul Masih II^(ra).

Ahmadi Muslims living around the world hold Jalsas [gatherings] in commemoration of this day. Jamaat-e-Ahmadiyya does not celebrate the birth of Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad^(ra), on Musleh-e-Maud Day, rather it is commemorated in regard to the fulfilment of a prophecy.

This prophecy was made by Hazrat Mirza Ghulam Ahmad^(as), the Promised Messiah, as per divine revelation to prove the superiority and truthfulness of Islam. The prophecy was made on 20th February 1886, three years prior to the birth of Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad^(ra). It contained the glad-tidings regarding the Promised Son, who was to be a great servant of Islam. This prophecy was also to serve as a sign for the opponents of Islam.

Khilafat Day: Hazrat Mirza Ghulam Ahmad^(as) passed away on the 26th May 1908, and after that Allah, the Almighty sent the second manifestation in the form of Khilafat-e-Ahmadiyya. On 27th May 1908, Hazrat Hakim Maulvi Nuruddin^(ra) was elected as the Khalifatul Masih I. The very first time that Khilafat Day was celebrated by the worldwide Ahmadiyya Muslim Jamaat was on 27th May 1957. This was in accordance with the instruction of Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad^(ra), Khalifatul Masih II, that he had given on the Ijtema of Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya in Rabwah in October 1956.

The purpose to celebrate this day is to make the Jama'at realize the blessings, status and importance of Khilafat-e-Ahmadiyya, and also to show gratitude to Allah, the Almighty for this great blessing.

ISBN 978-984-991-118-0



978 984 991 118 0